৩৫টি ভয়ের গল্প

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

৩৫ টি ভয়ের গল্পের বৃহত্তম সংকলন

ভয় সমগ্র

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

বুক ফার্ম

সূচীপত্রে যান

Bhoy Samagra
by
Harinarayan Chattopadhyay

No part of this work can be reproduced in any form without the written permission of the copyright holder and the publisher

© তপতী দেবী

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০১৯

প্রচ্ছদ : সপ্তদীপ দে সরকার
ভেতরের ছবি : নারায়ণ দেবনাথ
গ্রন্থ পরিকল্পনা : অরিন্দম দীঘাল
প্রচার সচিব : সোনাল দাস

বুক ফার্ম-এর পক্ষে শান্তনু ঘোষ ও কৌশিক দত্ত কর্তৃক
৭ এল, কালীচরণ শেঠ লেন, কলকাতা ৭০০০৩০ থেকে প্রকাশিত
চলভাষ : ৯০৫১০১১৬৪৩/৯৮৩১০৫৮০৪০
মুদ্রক : এস পি কমিউনিকেশন প্রা লি, কলকাতা ৭০০০০৯

সূচীপত্রে যান

আমার পিতা হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

১৯১৬ সালের ২৩ মার্চ কলকাতায় ভবানীপুর অঞ্চলে পৈতৃক ভদ্রাসনে হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম হয়। পিতা কালীদাস চট্টোপাধ্যায়। মা নগেনবালা দেবী। জন্মের কিছু পর থেকেই বর্মায় তাঁর কাটে দীর্ঘ পঁচিশ বছর।

১৯৪৮-এ 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম উপন্যাস 'ইরাবতী'। যদিও ধারাবাহিকটি বেরিয়েছিল 'মোহনা' নামে। এরপর প্রকাশিত হয় 'আরাকান', 'উপকূল', 'অভিষেক' উপন্যাস। প্রথম চারটি উপন্যাসের মূল উপজীব্য হল বর্মার অধিবাসীদের জীবন, জীবিকা, দৈনন্দিন যাপনের ইতিহাস। সেদেশেই তাঁর শিক্ষা ও কর্মজীবনের সূচনা। রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ পাশ করে রেঙ্গুন কোর্টে আইনজীবীর কর্মজীবন (১৯৩৮-১৯৪০) শুরু করেছিলেন হরিনারায়ণ। ১৯৪০ সালের পর অন্যান্য অনেক ভারতীয়র মতোই তিনি ও তাঁর পরিবার চিরকালের মতো বর্মা ত্যাগ করে কলকাতায় ভবানীপুরের পৈতৃক বাড়িতে ফিরে আসেন। ততদিনে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, বর্মাদেশে গণ আন্দোলন ছাড়াও রাজনৈতিক নানা অস্থিরতা ঘটে গিয়েছে। সেইসব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে হরিনারায়ণ ছেড়ে আসা বাল্য কৈশোর যৌবনের ব্রহ্মদেশকে নিয়েই একাধিক উপন্যাস লিখলেন। বর্মার কলেজে পড়বার সময় লেখক ও স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম বিপ্লবীযুবা আউসাং-এর সহকারী ছিলেন। 'আরাকান' উপন্যাসের লুন নায়ক চরিত্রকে তিনি আউসাং-এর আদলে তৈরি করেছেন। 'আরাকান' শুধু বর্মার স্বাধীনতা যজ্ঞের সমিধ আহরণের ইতিকথা। চরিত্র ও ঘটনার পরিণতি লাভের সম্ভাবনা পরবর্তী 'অভিষেক' খণ্ডে।

'বাতাসে বারুদ', 'শহরে বন্দরে', 'অভিসারের লগ্ন', 'বনকপোতী', 'আলোকে তিমিরে', 'মেঘলোকে', 'মধ্যাহ্নের মেঘ', 'ময়ূর ময়ূরী' ইত্যাদি আরও অনেক উপন্যাস তিনি লিখে গেছেন।

'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় তাঁর প্রথম গল্প প্রকাশিত হয়। ১৯৫২ সালের ৬ জুলাই। লেখাটির নাম ছিল 'নজর'। 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত রচনাসমূহ হল 'অন্তরাল', 'অলৌকিক', 'ওরে ভীরু', 'কনে চন্দন', 'গ্রহণ', 'চোর কাঁটা', 'নিখোঁজ', 'প্রতিরূপ', 'সই', 'সর্বনাশ', 'সিংহরাশি', 'স্বাক্ষর', 'ইতিহাস', 'কুয়াশা', 'জরিপ', 'দাদন', 'বাঘচাঁদ', 'বিকর্ষণ', 'বিনিময়', 'বোরখা', 'সত্যমেব' ইত্যাদি।

তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ হল *সপ্তকন্যার কাহিনী, স্বপ্ন মঞ্জরী, মৃগশিরা, প্রজাপতি মন, জোনাকীর দীপ, সুরবাহার, শঙ্খলিপি*।

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ব্যতিক্রমী চরিত্রের লেখক ছিলেন। জীবনযাপনকে পরিচ্ছন্ন ও নিয়মানুগ রাখতে চেষ্টা করতেন। রাত্রি জেগে লেখার অভ্যেস ছিল না। নির্দিষ্ট সময়ে শয্যাগ্রহণ এবং শয্যা ত্যাগ, আহার গ্রহণেও ছিল নিয়মনিষ্ঠা। তবে সন্দেশ রাবড়ির সঙ্গে গুড় খেতে ভালোবাসতেন। নিয়মিত প্রাতর্ভ্রমণে যেতেন রবীন্দ্র সরোবরে। গল্প লেখার পাশাপাশি ছবিও আঁকতেন।

হাসতেন আর হাসাতে ভালোবাসতেন। প্রখ্যাত কমিক শিল্পী ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের অসংখ্য জনপ্রিয় রম্যনাটক হরিনারায়ণবাবুর লেখা।

তাঁর লেখা নিয়ে চলচ্চিত্র খুব একটা কম হয়নি। বাংলায় 'অভিসারিকা', 'অশান্ত ঘূর্ণি', 'জি টি রোড' আর হিন্দিতে 'মুঠঠি ভর চাউল' সিনেমাগুলি তৈরি হয়। নাটকে অভিনয় করতে ভালোবাসতেন, তাঁর চারু অ্যাভিনিউয়ের বাড়িতে নাটকের নিয়মিত মহড়া হত। বহু বেতার নাটকেও অংশগ্রহণ করেছিলেন। ১৯৪৯ সালের ছবি 'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন'-এ তিনি দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তর ভূমিকায় অভিনয়

সূচীপত্রে যান

করেছিলেন। বহুমুখী প্রতিভাধর মানুষটি লিখেছেন শ্যামাসংগীত, আবৃত্তিতে পেয়েছেন অনেক মেডেল। কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৭২ সালে 'মতিলাল পুরস্কার' এবং ১৯৭৬ সালে 'তারাশঙ্কর পুরস্কার' লাভ করেন।

শেষ সময় আসে। কলকাতায় বর্মার অধিবাসীদের বার্ষিক অনুষ্ঠান হত 'বর্মা ফাংশন' নামে। সেখানে হরিনারায়ণবাবুকে ছাড়া চলত না। ১৯৮১ সালে সেই উৎসবে তিনি রবীন্দ্রনাথের 'দুঃসময়' কবিতাটি আবৃত্তি করেন। অনুষ্ঠান চলাকালীন তিনি হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে যান। নিয়ে যাওয়া হয় রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানে। কিন্তু জ্ঞান আর ফেরেনি। ১৯৮১ সালে ২০ জানুয়ারি তিনি স্ত্রী পুত্র কন্যাদের ফেলে চিরকালের মতো চলে যান।

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের যাবতীয় ভয়ের গল্পকে দুই মলাটে প্রকাশ করার প্রয়োজন ছিল। যেখানে তাঁর ভৌতিক গল্পের পাশাপাশি স্থান পাবে সবকটি অলৌকিক, অতীন্দ্রিয়, অতিপ্রাকৃত তথা পারলৌকিক ব্যাখ্যাতীত গল্প।

সেই উদ্দেশ্য নিয়ে আমার অনুমতিক্রমে 'বুক ফার্ম' থেকে প্রকাশিত হল হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের **৩৫ টি ভয়ের গল্পের বৃহত্তম সংকলন** 'ভয় সমগ্র'। এই প্রচেষ্টার জন্য 'বুক ফার্ম'-কে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। আশা করি বইটি পাঠকের ভালো লাগবে।

* হরিনারায়ণের একই প্লটের ভৌতিক কাহিনি ভিন্ন নামেও প্রকাশিত হয়েছে। যেমন, 'টান' গল্পটি 'ভৌতিক' নামে এবং 'আমরা আছি' গল্পটি 'আমরা ভূতেরা' নামে প্রকাশিত হয়েছে। এই বইতে 'টান' ও 'আমরা আছি' নামে গল্প সংকলিত হল।

ভারতী দেবী

২০.০৬.২০১৯

সূচীপত্রে যান

সূচিপত্র

১ অলৌকিক

২ পাঁচ মুণ্ডীর আসর

৩ অমর-ধাম

৪ পিছনের জানলা

৫ অবিশ্বাস্য

৬ আমরা আছি

৭ গোয়েন্দা ও প্রেতাত্মা

৮ কুপার সাহেবের বাংলো

৯ জনাব মঞ্জিল

১০ মূর্তির কবলে

১১ অমানুষিক

১২ বানরের পাঞ্জা

১৩ গভীর রাতের কান্না

১৪ রাত্রি নিশীথে

১৫ টান

১৬ ভূতুড়ে রাত

১৭ ভূত নেই?

১৮ সুরের মায়া

১৯ প্রতিহিংসা

সূচীপত্রে যান

২০ মৃত্যুর পরে

২১ ফাঁসির আসামি

২২ আগন্তুক

২৩ ভূতচরিত

২৪ ভূতুড়ে কাণ্ড

২৫ আরণ্যক

২৬ রাতের প্রহরী

২৭ অবাস্তব

২৮ আবার ভূত

২৯ বনকুঠির রহস্য

৩০ বেনেটির জঙ্গলে

৩১ বিনোদ ডাক্তার

৩২ রাত গভীর

৩৩ সামন্ত বাড়ি

৩৪ লাল নিশানা

৩৫ রূপে সে কুরূপা

সূচীপত্রে যান

অলৌকিক

বি কম পাশ করেছি আজ বছর দুয়েক। তারপর থেকে অফিসে অফিসে ঘুরে তিন জোড়া চটি ছিঁড়ল, কিন্তু চাকরি জুটল না। বড়ো, মেজো, ছোটো সব অফিস ঘোরা শেষ। সব জায়গায় এক কথা। দুঃখিত, এখানে কোনো কাজ নেই। বেশ কয়েকটা অফিসে সদর দরজায় মস্ত বড়ো নোটিস লটকানো। নো ভ্যাকেন্সি।

নিতান্ত বাপের পেনসনটুকু ছিল বলে অনাহারে দিন কাটাতে হয়নি। কোনোরকমে দু-বেলা একটা তরকারি ভাত জুটে যেত।

টিউশনির অনেক চেষ্টা করেছি। পাইনি। আজকাল স্কুলের শিক্ষক ছাড়া কেউ টিউটর রাখতে চায় না। শুধু পড়ানো নয়, প্রশ্নপত্রও যাতে জানা যায়।

এইরকম যখন অবস্থা, তখন অদ্ভুত এক কাণ্ড ঘটল। এমন অদ্ভুত যে এত বছর পরে ঘটনাটা মনে হলে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। মাঝে মাঝে ভাবি, সত্যিই কি এটা ঘটেছিল!

পার্কে একটু বিশ্রাম করে আবার চাকরির সন্ধানে বের হলাম। বড়ো রাস্তা ছেড়ে স্যাঁৎসেঁতে গলিতে অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে ছোটো ছোটো অফিসে ঘোরা শুরু করলাম।

একটা খুব পুরোনো বাড়ি। ফাটা নল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। শ্যাওলায় ইটগুলো সবুজ হয়ে গেছে। সিঁড়ির অনেকগুলো ধাপ ভাঙা। সামনে মাঝারি একটা সাইনবোর্ড। জেনারাল ট্রেডিং কোম্পানি।

জানি কিছু হবার নয়, তবু বরাত ঠুকে সাবধানে সিঁড়ি দিয়ে উঠে পড়লাম।

প্রথমে চোখে কিছু দেখতে পেলাম না, এত অন্ধকার। তারপর চোখ দুটো অন্ধকারে অভ্যস্ত হতে দেখতে পেলাম দু-চার জন লোক ঘোরাঘুরি করছে। সকলের মাথায় টুপি।

খুব কম পাওয়ারের আলো এদিক ওদিক জ্বলছে।

আমাকে দেখে একটা লোক এগিয়ে এল। কাছে আসতে বুঝতে পারলাম, লোকটা গুজরাটি।

অন্য সব লোকগুলোও গুজরাটি। এটা বোধ হয় গুজরাটিদের অফিস।

লোকটা জিজ্ঞাসা করল, কী চাই?

করুণ কণ্ঠে বললাম, একটা চাকরি।

আমাকে অবাক করে দিয়ে লোকটা বলল, আসুন আমার সঙ্গে।

লোকটার পিছন পিছন একটা পার্টিশন ঘেরা কামরায় ঢুকলাম।

ছোটো একটা টেবিল। তার ওপাশে শীর্ণকায় একটি লোক। তার মাথাতেও টুপি। ঝুঁকে পড়ে একটা চিঠি পড়ছিল।

মুখ তুলে বলল, কী?

আমার সঙ্গের লোকটি বলল, ভদ্রলোক চাকরির জন্য এসেছেন।

লোকটি হাত বাড়াল, দরখাস্ত।

দরখাস্ত দিলাম।

পড়ে নিয়ে বলল, আপনি গ্র্যাজুয়েট। ঠিক আছে, আমরা আপাতত দেড়-শো টাকা দেব। যদি টিকে থাকতে পারেন তো দেখা যাবে।

নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলাম না। মনে হল ভুল শুনেছি। তখন আমার এমন অবস্থা, পঞ্চাশ টাকার চাকরি পেলে নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করতাম।

কি রাজি?

সূচীপত্রে যান

সঙ্গেসঙ্গে আমি মাথা নাড়লাম।

লোকটা বেল বাজাতে একটা বেয়ারা এসে ঢুকল।

বেয়ারাকে দেখে মনে হল, গুজরাটি নয়, উড়িয়া।

মেটাভাইকে ডেকে দাও।

মেটা কামরায় ঢুকতে বলল, এঁকে একটা নিয়োগপত্র দিয়ে দাও। দেড়-শো টাকা মাইনে। প্যারেকের জায়গায় চাকরি করবে।

মেটা অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার দিকে কিছুক্ষণ দেখল, তারপর বলল, আসুন।

বাইরে এলাম।

আপনি ওই চেয়ারাটায় ততক্ষণ বসুন। আমি আপনার নিয়োগপত্র দেবার ব্যবস্থা করছি।

একেবারে কোণের দিকে একটা টেবিল। পিছনে চেয়ার। টেবিলের ওপর দোয়াত, পেনসিল, কলম, কাচের টেবিলচাপা।

ওই চেয়ারে বসে পড়ুন।

আমি চেয়ারে বসতে গিয়েই লাফিয়ে উঠে পড়লাম। কে যেন চেয়ারে বসে রয়েছে। আমি তার কোলের ওপর বসে পড়েছি।

উঠে দাঁড়িয়েই আশ্চর্য হলাম। চেয়ার খালি। কেউ তো নেই। তবে!

বুঝতে পারলাম আমারই ভুল। চাকরি পাবার আনন্দে মাথার গোলমাল হল নাকি!

আবার চেয়ারে বসলাম। এক ব্যাপার। কিন্তু এবার আর আমি উঠলাম না। চেপে বসে রইলাম।

স্পষ্ট দেখলাম, আশপাশে দাঁড়ানো গুজরাটি বাবুদের চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল। আস্তে আস্তে তারা যে-যার জায়গায় ফিরে গেল।

যথাসময়ে নিয়োগপত্র হাতে এল।

বাড়ি ফিরে প্রথমেই বাবার কাছে গেলাম। বারান্দায় পাশাপাশি দুটো চেয়ারে বাবা আর মা। রোজই আমার অপেক্ষায় এভাবে বসে থাকেন।

চাকরি পাবার খবরটা দিতেই দু-জনে কিন্তু বলে উঠলেন, তোমার মাথায় ওটা কী?

মাথায়? মাথায় আবার কী হল?

বারান্দার একদিকের দেয়ালে একটা আয়না টাঙানো ছিল। তার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে গেলাম।

আমার মাথায় পুরোনো একটা গুজরাটি টুপি।

আশ্চর্য কাণ্ড, এ টুপি আমার মাথায় এল কী করে?

সহকর্মীদের কেউ রসিকতা করে মাথায় পরিয়ে দিয়েছে? কিন্তু আমার মাথায় পরিয়ে দিল আর আমি টের পেলাম না।

টুপিটা খুলে ঘরের কোণে ফেলে দিলাম।

দিন পাঁচ ছয় অফিসে যাবার পর অনেক কিছু জানতে পারলাম। জানতে পারলাম আমি যে চেয়ারে বসি, সে চেয়ারে আগে প্যারেক বসত। কাজ করতে করতে প্যারেক ওই চেয়ারে বসেই মারা গেছে।

অফিসের সকলের ধারণা প্যারেক এখনও ওখানে বসে।

প্রথম দিন চেয়ারে বসতে গিয়েই মনে হয়েছিল আর কেউ যেন বসে রয়েছে। কিন্তু ওই এক দিনই। তারপর আর কিছু টের পাইনি।

পরে আমার একথাও মনে হয়েছিল যে অফিসে আমি একমাত্র বাঙালি বলে অন্য সবাই আমাকে ভয় দেখিয়ে তাড়াতে চায়।

কিন্তু আমার ভুল ভাঙল।

মাথা নীচু করে কাজ করছিলাম, হঠাৎ টুং করে শব্দ।

সূচীপত্রে যান

মুখ তুলে দেখি, টেবিলের ওপর যে জল ভরতি কাচের গ্লাস ছিল সেটা শূন্যে উঠে একটু কাত হল। অর্ধেকের বেশি জল শেষ হয়ে গেল। ঠিক মনে হল পাশে দাঁড়িয়ে কে যেন জল খেল।

আমি ভীতু এমন অপবাদ কেউ কখনো দেয়নি। বরং সবাই আমাকে ডানপিটে বেপরোয়া বলেই জানে। কিন্তু চোখের সামনে ব্যাপারটা দেখে আমার মেরুদণ্ড বেয়ে যেন একটা ঠান্ডা স্রোত বয়ে গেল। বুকের স্পন্দন দ্রুততর হল।

শুধু কি এই! লেজারে দাগ দেব বলে লাল পেনসিলটা যেমনি তুলতে গেছি, অমনি চমকে উঠে হাত সরিয়ে নিতে হয়েছে। কে যেন আগেই পেনসিলটা আঁকড়ে ধরেছিল।

আমার পাশে মানুভাই বসত। বয়সে প্রায় আমারই সমান।

ছুটির পর তাকে সব কিছু বললাম।

সে মন দিয়ে সব শুনে বলল, প্যারেক এখনও অফিসের মায়া কাটাতে পারেনি। কী করেই বা পারবে, লোকটার অফিস অন্ত প্রাণ ছিল। রোজ আটটা ন-টা পর্যন্ত অফিসে বসে থাকত।

কী বলব, সব শুনে গেলাম। এতদিন আমার ধারণা ছিল মানুষ মৃত্যুর পরেই ছাই হয়ে যায়। তার আর অস্তিত্ব থাকে না। কিন্তু চোখের সামনে অলৌকিক কাণ্ড দেখে আমার ধারণা বদলে যাচ্ছে।

নিজের মনকে বোঝালাম। আত্মা থাক বা না থাক আমার জানবার কোনো দরকার নেই, আত্মা থাকলেও সে তো আমার কোনো অনিষ্ট করছে না। কাজেই আমার চাকরি ছাড়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। বিশেষ করে এত কষ্টে সংগ্রহ করা চাকরি।

এরপর ব্যাপার চরমে উঠল।

ম্যানেজার ডেকে বলল, আজ অফিসের পর থেকে আপনি লেজারটা সব লিখে ফেলবেন। কাল সকালে অডিটর আসবে। বেয়ারাও থাকবে আপনার সঙ্গে।

পুরো লেজার লেখা মানে প্রায় ঘণ্টা তিনেকের ব্যাপার। অফিস ছুটির পর নেমে গিয়ে সামনের দোকানে কিছু খেয়ে যখন ফিরে এলাম, তখন অফিস খালি। শুধু একটা টুলে বেয়ারা বসে আছে।

আমাকে দেখে বেয়ারা বলল, বাবু, আপনি তাহলে কাজ শুরু করুন, আমি বাড়ি থেকে খেয়ে আসি। আমার বাড়ি খুব কাছেই। আপনি আটটা অবধি তো আছেন। তারমধ্যেই আমি ফিরে আসব।

বেয়ারা চলে গেল।

আমি লেজার খুলে বসলাম। কতক্ষণ কাজ করেছিলাম খেয়াল নেই, হঠাৎ খট খট শব্দ হতে মুখ তুলে দেখেই আর চোখ নামাতে পারলাম না।

ঠিক অফিসের মাঝখানে একটা কঙ্কাল মূর্তি হেঁটে বেড়াচ্ছে। মাথায় কালো টুপি। দুটো হাত পিছন দিকে। এদিক থেকে ওদিক আবার ওদিক থেকে এদিক। ঠিক যেমন ভাবে পরীক্ষার সময় গার্ডরা পায়চারি করে, ঠিক তেমনি।

পকেট থেকে রুমাল বের করে চোখ দুটো মুছে নিয়ে ভালো করে দেখলাম। সেই এক দৃশ্য। কঙ্কাল মূর্তি পায়চারি করছে। এক ভাবে।

কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠল। হাত অসাড়। লেজারের পাতায় একটি আঁচড়ও পড়ল না।

ভাবলাম, চাকরি মাথায় থাক। কোনোরকমে বের হতে পারলে আর কোনোদিন এ মুখো হব না।

কিন্তু যাবার উপায় নেই। ঠিক বের হবার মুখে কঙ্কাল মূর্তি বেড়াচ্ছে। তার কাছাকাছি যাবার সাহস আমার নেই।

ভয়ে ভয়ে জলের গ্লাসটায় চুমুক দিলাম। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আসছিল।

একটু পরেই কঙ্কাল মূর্তি আর দেখতে পেলাম না। যেমন হঠাৎ এসেছিল, তেমন হঠাৎই হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

সূচীপত্রে যান

হাতঘড়ি দেখলাম, প্রায় এক ঘণ্টা চুপচাপ বসে আছি। কাজ অনেক পিছিয়ে গেল। তার মানে আরও এক ঘণ্টা দেড় ঘণ্টা বেশি থাকতে হবে।

কী আশ্চর্য, যতক্ষণ কঙ্কাল মূর্তিটা চোখের সামনে ছিল, বেশ ভয় ভয় করছিল। এখন মূর্তিটা সরে যেতেই সাহস ফিরে এল।

কাজে হাত দিলাম।

লেজারে কলম ঠেকাতে গিয়েই চমকে উঠলাম। যেটুকু লেখা বাকি ছিল, অচেনা হাতের লেখায় সব ভরতি হয়ে গেছে। তার মানে আমার বাকি কাজটুকু কে করে দিয়েছে। এ হাতের লেখা আমার নয়, সে বিষয়ে আমি স্থির নিশ্চয়। শুধু লেখাই নয়, প্রত্যেক পাতার শেষে যোগফল পর্যন্ত লাল কালিতে লেখা।

আটটার একটু আগে বেয়ারা এসে হাজির।

আমি তাকে বললাম, আমার কাজ শেষ। তুমি অফিস বন্ধ করে দাও।

রাস্তায় এসে বেয়ারা জিজ্ঞাসা করল, বাবু, কিছু দেখলেন নাকি?

আমি চেপে গিয়ে উত্তর দিলাম, না, কি দেখব?

বেয়ারা আর কিছু বলল না।

পরের দিন অফিসে আসতেই বেয়ারা এসে দাঁড়াল। লেজার বইটা নিয়ে ম্যানেজারবাবু আপনাকে যেতে বলছেন।

বুঝতে পারলাম অডিটর বোধ হয় এসে গেছে। হিসাব দেখার কাজ শুরু হবে।

লেজার বই নিয়ে ম্যানেজারের ঘরে ঢুকলাম। অডিটর নেই। ম্যানেজার একলাই বসে আছে।

আমাকে দেখে জিজ্ঞাসা করল, কি, সব লেখা হয়ে গেছে?

হ্যাঁ। বলে লেজারটা এগিয়ে দিলাম।

ম্যানেজার লেজারের পাতা ওলটাতে লাগল। কয়েকটা পাতা উলটেই বিস্মিত দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে বলল, একী, এ কার হাতের লেখা?

কার হাতের লেখা আমার জানা নেই, তাই কোনো উত্তর দিতে পারলাম না।

ম্যানেজার আস্তে আস্তে বলল, কী আশ্চর্য, এ তো অবিকল প্যারেকের হাতের লেখা। এ লেখা আপনি পেলেন কী করে?

কীভাবে ও লেখা লেজারের পাতায় এল বললাম।

ম্যানেজার সব মন দিয়ে শুনল। কোনো কথা অবিশ্বাস করল না।

বলল, আপনি নিশ্চয় এতদিনে বুঝতে পেরেছেন এ অফিসে প্রেতাত্মার উপদ্রব আছে। প্রেতাত্মা মানে প্যারেকের আত্মা এখনও এ অফিসের মায়া কাটাতে পারেনি। আপনি যে চেয়ারে বসেন সেই চেয়ারে বসে কাজ করতে করতেই প্যারেক হার্টফেল করেছিল। প্যারেকের জায়গায় দু-তিন জন লোককে নেওয়া হয়েছিল, কেউ তিন দিনের বেশি টিকতে পারেনি। আপনি তবু দিন কুড়ি রয়ে গেছেন। উপদ্রবের জন্য রাতে কোনো দারোয়ান থাকতে চাইছে না। অন্য বাড়িতে অফিস সরিয়ে নেবার অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু অফিস এলাকায় জায়গা পাওয়া প্রায় অসম্ভব। পাওয়া গেলেও সেলামি আর ভাড়া এত বেশি যে আমাদের পক্ষে সে টাকা খরচ করা সম্ভব নয়।

আমি একটু ভেবে কথাটা বলেই ফেললাম।

একটা কাজ করলে হয়।

কী বলুন?

শুনেছি গয়ায় পিণ্ডি দিলে প্রেতাত্মা মুক্তি পায়। সে কি করা সম্ভব?

ম্যানেজার দু-এক মুহূর্ত চিন্তা করল, তারপর বলল, চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে। যাবেন আপনি?

আমি!

সূচীপত্রে যান

হ্যাঁ, আমি আপনার যাতায়াত আর অন্য খরচ দেব। আপনি ব্রাহ্মণ। আপনিই বরং চলে যান।

কিন্তু প্যারেকের বাপের নাম দরকার হবে।

সে ব্যাপারে কোনো অসুবিধে হবে না। তার নিয়োগের ফাইলেই সব বিবরণ পাওয়া যাবে। আপনি চলেই যান। সামনের শনিবার গিয়ে সোমবার ফিরে আসতে পারবেন।

অগত্যা রাজি হয়ে গেলাম। দুর্ভোগ আমারই বেশি। প্যারেকের জায়গায় আমি এসেছি, কাজেই তার আক্রোশ আমার ওপর বেশি হওয়াই স্বাভাবিক। গয়ায় পিণ্ডি দিলে যদি আপদের শান্তি হয় তাহলে ম্যানেজার আমার ওপর খুশিই হবে।

সেদিন বুধবার। মাঝখানে দুটো দিন বৃহস্পতি আর শুক্র। এই তিন দিনে হিসাব পরীক্ষার কাজও শেষ হয়ে যাবে।

বুধ বৃহস্পতি দুটো দিন নির্বিবাদে কাটল।

শুক্রবার টেলিফোন এল। যিনি হিসাব দেখতে আসেন, ঠান্ডা লেগে তাঁর একটু জ্বরভাব হয়েছে। তিনি আসতে পারবেন না। আমি যেন খাতপত্র নিয়ে তাঁর অফিসে যাই।

ম্যানেজারের নির্দেশে তাই যেতে হল।

অফিসে ফিরতে সাড়ে ছ-টা বেজে গেল।

ফিরে দেখি, অফিসের দরজায় তালা দিয়ে বেয়ারা বাইরে অপেক্ষা করছে।

আমাকে দেখে বলল, আপনার এত দেরি হল?

সে প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়ে বললাম, তুমি দরজাটা খোল, আমি খাতাপত্রগুলো রেখে এখনই আসছি।

বেয়ারা দরজা খুলতে ভিতরে ঢুকে খাতাপত্রগুলো আমার টেবিলে রেখে বেরিয়ে এলাম। অস্বাভাবিক কিছু নজরে পড়ল না।

আমি বাইরে আসতেই বেয়ারা দ্রুতহাতে দরজায় চাবি লাগিয়ে তিরবেগে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল।

সারাদিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত ছিলাম। আমি আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলাম।

বাঁকের মুখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল।

কার একটা হাত আমার কাঁধের ওপর এসে পড়ল। আঙুলগুলোয় যেন এক তিল মাংস নেই, ছুরির ফলা বসানো। আমার কাঁধের মাংস ছিঁড়ে যেতে লাগল।

যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠতে গিয়েই থেমে গেলাম। দেয়ালের কোণে দীর্ঘ এক কঙ্কাল মূর্তি। দুটি চোখে আগুনের শিখা। মাথায় কালো টুপি।

এগোবার চেষ্টা করতেই কঙ্কালের দাঁতগুলো কড়মড় করে উঠল। বজ্রগম্ভীর কণ্ঠস্বর। ইংরেজিতে হুংকার।

গয়ায় পিণ্ডি দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে? এ অফিস থেকে আমাকে সরাবার চেষ্টা? এ অফিসের গোড়াপত্তন থেকে আমি আছি। শেষ অবধি থাকবও। কেউ আমাকে উৎখাত করতে পারবে না।

কথার সঙ্গে সঙ্গে কাঁধের ওপর হাতের চাপ আরও জোর। মনে হল যেন মাংস ভেদ করে আঙুলগুলো হাড়ে গিয়ে ঠেকছে। দুঃসহ ব্যথা।

বল, এ দুর্বুদ্ধি ছাড়বি কি না? বল? তোকে খতম করব।

না, না, আমি এসব কিছু করব না। আমি আর ঢুকবই না এ অফিসে। প্যারেক, আপনি আমায় বাঁচান।

কথাটা মনে থাকে যেন।

ঘাড়ে একটা প্রচণ্ড ধাক্কা। ছিটকে সিঁড়ির নীচে গিয়ে পড়লাম। বোধ হয় অজ্ঞানই হয়ে গিয়েছিলাম।

যখন চেতনা ফিরেছিল তখন অনেক রাত। কপাল কেটে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। কাঁধে কালসিটের দাগ।

হাঁটতে হাঁটতে মাঝরাতে বাড়ি ফিরেছিলাম।

বাড়ি থেকেই চাকরি ছাড়ার দরখাস্ত পাঠিয়ে দিয়েছিলাম।

সূচীপত্রে যান

ও অফিসে আর যাইনি।

সূচীপত্রে যান

পাঁচ মুণ্ডীর আসর

স্টেশনের নাম লোচনপুর। সেখান থেকে আরও দু-ক্রোশ। যানবাহন বলতে কিছু নেই। গরমে আর শীতে গোরুর গাড়ি চলে, কিন্তু বর্ষায় তা সম্ভব নয়। মাঝপথে দু-দুটো খাল। অন্য সময়ে বালির স্তূপ, বর্ষাকালে পার হওয়া দায়! খেয়া-নৌকা ছাড়া।

উপায় নেই। কোর্টের কাজ। এই চার মাইল পথ পায়ে হেঁটে গিয়ে পূবাই গাঁয়ের সর্বেশ্বর জানাকে ধরতে হবে। ধরা মানে, কোর্টের ভাষায়, সমন ধরিয়ে দেওয়া। এই কাজ না করতে পারলে চাকরি থাকবে না।

হয়তো গিয়ে দেখব, আগে থাকতে খবর পেয়ে সর্বেশ্বর ডুব মেরেছে। কোথাও পাওয়া যাবে না তাকে। তা যদি হয়, তাহলে তার বাড়ির দরজায় নোটিস সেঁটে দিয়ে আসতে হবে। মোট কথা যেতে আমাকে হবেই।

যাত্রা শুরু করলাম। কাঁচা মাটির পথ কিছুটা গিয়েই শেষ হয়ে গেল। তারপর আল। হাত খানেক চওড়া। সার্কাসের খেলায় সরু তারের ওপর দিয়ে যেভাবে লোকটা হাঁটে, সেইরকম কায়দায় সাবধানে এগিয়ে চলেছি। একটু এদিক-ওদিক হলেই একেবারে কাদাগোলা জলে নাকানি-চোবানি খেতে হবে।

একমাত্র ভরসার কথা, এখনও যথেষ্ট আলো রয়েছে। চারদিক পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। হাতের লাঠিটা ঠুকতে ঠুকতে চলতে লাগলাম।

যা শুনেছিলাম, তা ভুল। খাল দুটো নয়, একটা। খেয়া-নৌকার ব্যবস্থা নেই। সরু খালের ওপর বাঁশের একটা সেতু রয়েছে। দু-হাতে বাঁশ আঁকড়ে খাল পার হলাম।

তারপর আল নয়, সরু পথ। পায়ে চলা দু-পাশে ঘোড়া নিম আর আশশ্যাওড়ার গাছ। জায়গাটা বেশ অন্ধকার।

মাইল খানেক পথ পার হয়ে পূবাই গাঁয়ে হাজির হলাম।

ছোট্ট গ্রাম। একটা দোকান আর গোটা দশেক চালাঘর এই গ্রামের সীমানা।

বরাত ভালোই বলতে হবে। সর্বেশ্বরকে একেবারে বাড়ির দাওয়াতেই পেয়ে গেলাম। বসে বসে গাবের আটা দিয়ে জাল মাজছিল।

তার কাছে খোঁজ করতেই বাজখাঁই আওয়াজে বলল, 'আমি সর্বেশ্বর জানা। পিতা ঈশ্বর পতিতপাবন জানা। মশাইয়ের প্রয়োজন?'

প্রয়োজনটা দেখেই সর্বেশ্বর চমকে উঠল। এমন জানলে হয়তো জাঁক করে পরিচয়ই দিত না।

কাজ শেষ করে কোঁচার খুঁটে গাল, কপাল মুছে নিয়ে বললাম, 'একটু জল খাওয়াতে পারেন?'

সর্বেশ্বর একদৃষ্টে কিছুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে রইল। সে দৃষ্টিতে যেন আগুন ঝরছে।

তারপর বলল, 'লোচনপুর থেকে আসবার সময় একটা খাল পার হয়ে এসেছেন না?'

ঘাড় নেড়ে বললাম, 'হ্যাঁ।'

'অনেক জল পাবেন সেই খালে। পেট ভরে চুমুক দিতে পারেন।'

অবস্থা দেখে আমি আর দাঁড়ালাম না। দাঁড়াতে সাহস হল না। কিছু বলা যায় না, দলবল ডেকে যদি লাঠির ঘায়ে এখানে খতম করে দেয়, তাহলেও কিছু করতে পারব না। তারপর মাটি খুঁড়ে লাশটা যদি পুঁতে ফেলে, তাহলেও কাক চিলে জানতে পারবে না।

কোর্টের পেয়াদার ভাগ্যে মারধোর হামেশাই হয়। লোকজন খেপে উঠে আধমরা করে দেয়। একবার ভাবে না, আমরা নিমিত্র মাত্র। শুধু নির্দেশ জারি করেই খালাস।

সূচীপত্রে যান

বুঝতে পারলাম, এ গাঁয়ে ঠাঁই হবে না। ভেবেছিলাম রাতটা কোথাও বিশ্রাম করে ভোর ভোর রওনা হব, কিন্তু তা হবার নয়।

একেবারে গাঁয়ের মুখে যে দোকানটা দেখেছিলাম, সেখানে এসে দাঁড়ালাম।

'খাওয়ার জিনিস কিছু পাওয়া যাবে?'

দোকানী নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসল।

'কী চাই বলুন-না কর্ত্তা?'

চেয়ে দেখলাম, দুটো ধামা পাশাপাশি সাজানো। গোটা কয়েক জার আছে, তবে সব কটাই খালি।

দোকানীই আবার বলল, 'মুড়ি আছে, পাটালি আছে।'

'আর কিছু? দুধ কিংবা কলা?'

'আজ্ঞে না, ওসব এখানে পাবেন না।'

নিরুপায়। মুড়ি আর পাটালি নিয়েই কাঠের বেঞ্চের ওপর বসে পড়লাম। দু-এক গাল মুখে দিয়েই বুঝতে পারলাম, মুড়িগুলো অন্তত এক সপ্তাহের বাসি আর পাটালি যে এত তেতো হয় কী করে, অনেক ভেবেও কূলকিনারা পেলাম না।

খাওয়া শেষ করে, জল খেয়ে পয়সা দেবার মুখে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এখানে রাতটা কাটাবার জায়গা হবে? এ দোকানঘরের একপাশে হাত-পা মুড়ে পড়ে থাকব।'

কোনো উত্তর নেই দেখে মুখটা তুলেই শঙ্কিত হলাম।

দোকানী একদৃষ্টে আমার বুকের ওপর আটকানো পেতলের চাকতির দিকে দেখছে। যেটার ওপর কোর্টের নাম খোদাই করা।

তাড়াতাড়ি পয়সা ক-টা দোকানী হাত থেকে কেড়ে নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'না মশাই, থাকার জায়গা-টায়গা হবে না। ছেলেপুলে পরিবার নিয়ে থাকি, এখানে আপনি শোবেন কোথায়?'

'সন্ধ্যা হয়ে এল, তাহলে এখন যাই কোথায়?'

'এইবেলা স্টেশনের দিকে রওনা হয়ে পড়ুন। কতটা আর পথ। কলকাতা যাবার শেষ গাড়ি দশটা বত্রিশে। সেটা অনায়াসেই পেয়ে যাবেন।'

আমাকে আর কিছু বলবার অবসর না-দিয়ে দোকানী ঝাঁপ বন্ধ করতে শুরু করল। যাতে দোকানের সামনে থেকে অন্তত সরে যেতে বাধ্য হই।

বুঝতে পারলাম, এ গাঁয়ে আশ্রয়ের কোনো আশা নেই। বুকের চাকতিটাই আমার কাল। কোর্টের পেয়াদাকে এরা সমনের শামিল বলে মনে করে।

ঠিক করলাম, স্টেশনেই চলে যাব। সত্যিই তো কতটা আর পথ। যেতে দু-ঘণ্টা কিংবা তিন ঘণ্টা লাগলেও হাতে অনেক সময় থাকবে।

লাঠিটা বাগিয়ে নিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করলাম। চাকতিটা খুলে নিয়ে পকেটের মধ্যে রেখে দিলাম।

চারদিকে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমেছে। গাছপালার জন্য আরও ঝুপসি ঠেকছে। যাবার সময় যে পথ মসৃণ, সরল মনে হয়েছিল, আধো অন্ধকারে সে পথেই বার বার হোঁচট খেতে লাগলাম।

একটু পরে অন্ধকার ঘন হল। আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ। চাঁদের দেখা নেই। তারাও নেই। ঝোপের ফাঁক থেকে শিয়াল ডেকে উঠল। হুক্কা হুয়া। হুয়া, হুয়া হুয়া।

শক্ত হাতে লাঠিটা ধরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। শিয়ালকে ভয় নেই। শিয়াল জ্যান্ত মানুষের কাছে ঘেঁষে না। কিন্তু জঙ্গলে আর কোনো জন্তু নেই তো? হিংস্র কোনো জানোয়ার?

প্রায় ঘণ্টা খানেক চলার পর খেয়াল হল এতক্ষণে খালের পারে পৌঁছানো উচিত ছিল। বাঁশের সেতুর কাছ বরাবর। দুটো হাত আড়াআড়িভাবে চোখের ওপর রেখে চারদিক নিরীক্ষণ করে দেখলাম। এখনও অন্ধকার

সূচিভেদ্য হয়ে ওঠেনি। অনেকক্ষণ চেয়ে থাকলে আবছা দেখা যায়। চারদিকে গাছের জটলা। অল্প অল্প বাতাস শুরু হয়েছে। সেই বাতাসে গাছের পাতাগুলো শিরশির করে কাঁপছে।

আর কোনো সন্দেহ নেই নিশ্চয় পথ হারিয়েছি; সম্ভবত জঙ্গলের মধ্যে একাধিক পায়ে-চলা পথ আছে। একটা পথের বদলে আর একটা পথ ধরে হাঁটতে আরম্ভ করেছি।

এখন উপায়।

লাঠিটা ঠুকে চিৎকার করলাম, 'কে আছ, আমি পথ হারিয়ে ফেলেছি। আমাকে সাহায্য করো!'

একবার, দু-বার, তিনবার। চিৎকারে কোনো ফল হল না। শুধু গাছের ডালে বিশ্রামরত কাকের দল কা-কা শব্দ করে ঝটপট করতে করতে উড়ে গেল।

কিন্তু এভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে সমস্যার সমাধান হবে না। যেকোনো রকমেই হোক, এ জঙ্গল থেকে বেরিয়ে পড়তেই হবে। নইলে রাত বাড়বে, জায়গাটা মোটেই নিরাপদ নয়।

সোজা রাস্তা ধরে এগোতে লাগলাম। গাছপালার যেন আর শেষ নেই। যত এগোই, জঙ্গল যেন তত দুর্ভেদ্য বলে মনে হয়।

পায়ের পাশ দিয়ে সরসর করে সরীসৃপগতিতে যেসব প্রাণী চলাফেরা করছে, তাদের কথা ভেবে গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল।

বেশ কিছুক্ষণ চলার পর মনে হল জঙ্গল যেন একটু ফিকে হয়ে এল। চারদিকে বিস্তীর্ণ জলাভূমি। অন্ধকারে জোড়া জোড়া জ্বলন্ত চোখ ঘোরাফেরা করছে। বুঝলাম সে চোখের মালিক শিয়ালের দল।

জঙ্গল পার হয়ে এসে মনে একটু সাহস হল। ভালো করে চেয়ে চেয়ে দেখলাম কোথাও যদি আলোর বিন্দু চোখে পড়ে। গ্রামের নিশানা।

হঠাৎ পিছন থেকে বিকট শব্দ এল।

'বলো হরি, হরিবোল!'

সে শব্দে বুকের রক্ত যেন হিম হয়ে গেল। তবু এই ভেবে মনে আশ্বাস পেলাম, নির্জন প্রান্তরে আমি একলা নই। আরও লোক আছে। এদের জিজ্ঞাসা করলেই পথের নির্দেশ পাওয়া যাবে।

হরিধ্বনি আরও কাছে আসতেই আমি পথ ছেড়ে সরে দাঁড়ালাম। সেটাই নিয়ম। অনন্তপথের যাত্রীকে পথ দেওয়া উচিত।

লাঠিতে ভর দিয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে রইলাম।

অন্ধকারে জ্বলন্ত একটা মশাল এগিয়ে আসছে। একটু পরেই শববাহীরা সামনে এল। শুধু চারজন খাটিয়া বয়ে নিয়ে চলেছে। সামনের ডানদিকের লোকটার হাতে মশাল। আর কোনো লোক নেই।

'শুনুন!' কাতর কণ্ঠে অনুরোধ করলাম।

বাহকরা থামল না, শুধু চলার গতি একটু মৃদু করল আর চারজনেই আমার দিকে দৃষ্টি ফেরাল।

সঙ্গে সঙ্গে আমার মেরুদণ্ড বেয়ে একটা হিমেল স্রোত বয়ে গেল। আমি ভীরু এমন অপবাদ কেউ দিতে পারবে না, কিন্তু আমার মনে হল শ্লথ মুষ্টি থেকে লাঠিটা খসে মাটিতে পড়ে যাবে, সমস্ত শরীর অজানা একটা আতঙ্কে শিউরে উঠল।

চারজন লোকেরই ঠিক একরকম চেহারা! এক ধরনের অবিন্যস্ত চুল, রক্তিম চোখ, এমনকী মুখের বসন্তের দাগ পর্যন্ত!

আমার প্রশ্নের কোনো উত্তর না-দিয়েই বাহকরা পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল।

শুধু যদি দুজনের চেহারার মধ্যে এ ধরনের সাদৃশ্য থাকত, তাহলে ভাবতাম তারা হয়তো যমজ ভাই, কিন্তু এরকম চারজনের অভিন্ন চেহারা হল কী করে!

মনের মধ্যে অলৌকিক যে প্রসঙ্গ উঁকি দিচ্ছিল, নিজেকে ধমক দিয়ে তার পথ বন্ধ করার চেষ্টা করলাম। আমার চোখের ভুল। মনের মধ্যে ভয়টা বাসা বেঁধেই ছিল, মশালের আলোয় ক্ষণেকের দেখায় নিশ্চয়

সূচীপত্রে যান

বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে।

নিজেকে সাহস দেবার জন্য চিৎকার করে গান গাইতে শুরু করলাম। বেসুরো, বেতালা। কিন্তু পরমুহূর্তেই 'বলো হরিবোল'-এর বিকট ধ্বনিতে চমকে থেমে গেলাম।

মনে হল শব্দটা যেন আমার পাশ থেকে উঠছে। অথচ শববাহকের দল ততক্ষণে অনেক এগিয়ে গেছে। তাদের চিৎকার এত কাছে শ্রুতিগোচর হবার কথা নয়।

মনের মধ্যে একটু অস্বস্তি শুরু হল। কিন্তু এভাবে চুপচাপ পথের পাশে দাঁড়িয়ে থাকলে বিপদ বাড়বে। তাই জোরে জোরে পা ফেলে এগিয়ে চললাম।

লক্ষ করিনি, আকাশ কখন কালো মেঘে ছেয়ে গেছে। ছুরির ফলার মতন বিদ্যুতের শানিত স্ফুরণ। দমকা হাওয়া উঠল। হাওয়ার এমন বেগ যে এগোনো দুষ্কর হয়ে পড়ল।

আবার সেই চিৎকার। এবারে যেন একেবারে কানের পাশে। 'বলো হরি, হরিবোল!'

চিন্তা করে লাভ নেই। চিন্তা করে এ ব্যাপারে জট ছাড়ানো যাবে না। রহস্য যাই হোক, যেভাবেই হোক, আমাকে প্রাণে বাঁচতে হবে। কোনোরকমে একটা লোকালয়ে গিয়ে পৌঁছোতে হবে।

বড়ো বড়ো বৃষ্টির ফলা। সারা গায়ে হুল ফোটাতে শুরু করল। ছুটতে আরম্ভ করলাম, লাঠিটা বগলে চেপে।

জানি না, বোধ হয় আধ মাইলেরও বেশি একটানা দৌড়েছি। হিসাব রাখিনি। হঠাৎ আর একবার বিদ্যুৎ চমকাতেই দেখলাম, পথের পাশে একটা চালাঘর।

মনে মনে ভগবানকে ধন্যবাদ জানালাম। বিপদতারণ তুমি আছ, দুর্বলের ত্রাণকর্তা। ছুটে গিয়ে চালাঘরে আশ্রয় নিলাম। মনে মনে ভাবলাম, অন্তত প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে শরীরটা বাঁচবে। এমনও হতে পারে চালাঘরে কোনো লোকের সাক্ষাৎ মিলবে। রাতের নির্ভর।

অন্ধকারটা চোখে একটু সহ্য হতে বুঝলাম চালাঘর নয়, শুধু চালা। তিনদিক আচ্ছাদিত, একদিক খোলা। বোধ হয় রোদের তাপ কিংবা বৃষ্টির প্রকোপ থেকে পথচারীকে বাঁচাবার জন্যই এটি তৈরি হয়েছিল।

আস্তে আস্তে এগোতে গিয়েই থেমে গেলাম।

কড়কড় কড়াৎ। প্রচণ্ড শব্দে বজ্রপাত হল। তার আগে বিদ্যুতের অলোয় চারদিক উদ্ভাসিত হয়ে গেল।

সেই আলোতেই দেখলাম। এবার আরও স্পষ্ট, আরও নিকটে।

শবটি সামনে রেখে চারজন পাশে দাঁড়িয়ে আছে। সারি দিয়ে। হুবহু এক চেহারা! এমনকী অসংস্কৃত দাড়ি গোঁফের মাত্রা পর্যন্ত!

চোখাচোখি হতেই চারজন একসঙ্গে হো হো করে হেসে উঠল। শিকারকে যেন কুক্ষিগত করার উল্লাসে। লাঠিটা বজ্রমুষ্টিতে ধরে পাষাণমূর্তির মতন দাঁড়িয়ে রইলাম। নিঃসন্দেহ হলাম, এ হাসি স্বাভাবিক নয়। রক্তমাংসের কোনো লোক এভাবে হাসতে পারে না। অশরীরী আত্মার বীভৎস হাসি!

আমাকে আবার আতঙ্কিত করে একজন খনখনে গলায় বলল, 'আপনি একটু মৃতদেহের কাছে থাকুন, আমরা কাঠের ব্যবস্থা করে আসি।'

কোনোরকমে নিঃশ্বাস রোধ করে বললাম, 'আপনারা সবাই যাবেন?'

আবার সেই রক্তজল-করা হাসি।

'আমরা যেখানে যাই, একসঙ্গেই যাই!'

যাবার আগে লোকগুলো মশালটা জ্বালিয়ে দিয়ে গেল।

বৃষ্টি থেমে গেছে। মাঝে মাঝে শুধু মেঘের গর্জন আর বিদ্যুতের চমক।

আড়চোখে চেয়ে দেখলাম। সাদা কাপড়ে শবের আগাগোড়া ঢাকা। মশালের আলোয় সবকিছু পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

আচমকা দমকা হাওয়ায় শবের আবরণ সরে গেল। আমি একবার সেদিকে দেখেই চিৎকার করে উঠলাম।

সূচীপত্রে যান

একেবারে এক মুখ! গোঁফ, দাড়ি, চুল, গড়ন কোথাও কোনো প্রভেদ নেই। এমনকী বসন্তের দাগ পর্যন্ত!

দু-হাতে চোখ দুটো রগড়ে নিলাম। এও কি সম্ভব! শব আর চারজন বাহকের আকৃতিতে কোনো তফাত নেই!

বুকের মধ্যে স্পন্দন দ্রুততর হল। লাঠিটা আঁকড়ে ধরার শক্তিও যেন ক্রমে লোপ পেয়ে যাচ্ছে। তারপর যা ঘটল, তা অবর্ণনীয়।

শব চোখ খুলল। রক্তিম দুটি চোখ। প্রথমে দুটো ঠোঁট কেঁপে কেঁপে উঠল, তারপর খনখনে গলার স্বর ভেসে উঠল। একটু উঠে বসার মতো করে বলল, 'ঠিকই ভেবেছ! আমরা পাঁচজন একই লোক। কোনো তফাত নেই। বসন্ত রোগে মারা গিয়েছিলাম বলে প্রতিবেশীরা কেউ ভয়ে পোড়াতে এল না। দেহের সৎগতি হবে না? তাই নিজের দেহ থেকে চারজন বাহক সৃষ্টি করলাম। তারাই বয়ে নিয়ে এল শ্মশানে। কেমন বুদ্ধি বার করলাম বলো তো? হো, হো, হো!'

তারপর আমার কিছু মনে নেই।

যখন জ্ঞান হল দেখলাম পথের একপাশে কর্দমাক্ত দেহে পড়ে আছি। পরনের পোশাক ছিন্নভিন্ন। জেলেরা আমার মুখে-চোখে জল দিচ্ছে। বাতাস করছে।

একটু সুস্থ বোধ করে উঠে বসলাম। চারদিকে চেয়ে চেয়ে দেখলাম। চালাঘর আছে, কিন্তু শূন্য। রাতের বিভীষিকা কোথাও নেই।

আস্তে আস্তে বললাম, 'লোচনপুর স্টেশন এখান থেকে কত দূর?'

'লোচনপুর? এখান থেকে পাক্কা দশ মাইল। একেবারে উলটো দিকে।'

'এ জায়গার নাম কী?'

'এটাকে বলে পাঁচমুণ্ডীর আসর।'

'পাঁচমুণ্ডীর আসর?' চমকে উঠলাম।

'হ্যাঁ গো কত্তা। একরকমের পাঁচজন তেনাদের দেখা যায়। পথ ভুলিয়ে লোককে এখানে নিয়ে আসে। তারপর সাবাড় করে দেয়। তুমি বামুন বলে বোধ হয় বেঁচে গেছ।'

ছেঁড়া পরিচ্ছদের ফাঁক দিয়ে পৈতেটা দেখা যাচ্ছিল।

এ কাহিনি অনেককে বলেছি, কেউ বিশ্বাস করেছে, কেউ করেনি। কিন্তু যারা বিশ্বাস করেনি তারা রাতের বেলা পূবাই গাঁ থেকে পশ্চিমমুখো রাস্তা ধরে পাঁচমুণ্ডীর আসরের দিকে কেউ আসতে রাজি হয়নি। আমাকে যদি কেউ এক থলি আকবরী মোহর দেয়, তবু আমি ওপথে আর জীবনে যাব না।

সূচীপত্রে যান

অমর-ধাম

মাস খানেক ধরে শরীরটা খারাপ হয়েছে। যা খাই, অম্বল হয়। বিকালে মাথার যন্ত্রণা। রাতে ঘুম নেই। কাজে একেবারে উৎসাহ পাচ্ছি না। পাড়ার ডাক্তার বলল, 'ওষুধে সাময়িক উপকার হতে পারে, স্থায়ী কিছু হবে না। তার চেয়ে বরং ভালো জায়গায় চেঞ্জে চলে যান। মাস দুয়েক থাকলেই সেরে যাবেন।'

কোথায় যাব তাই নিয়েই এক সমস্যা। এক এক বন্ধু এক একরকম উপদেশ দিতে লাগল। কেউ বলল, ভুবনেশ্বর, কেউ হাজারিবাগ, আবার কেউ-বা দেওঘর।

কী করব, কোথায় যাব যখন ভাবছি তখন হঠাৎ অমলের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

অফিস থেকে বেরিয়ে ফাঁকা ট্রামের জন্য অপেক্ষা করছি, আচমকা পিঠে তার স্পর্শ।

ফিরে দেখি অমল। কলেজ ছাড়ার পর অমলের সঙ্গে আর দেখা হয়নি।

আমাকে দেখে অমল বলল, 'চেহারা যে বড্ড খারাপ হয়ে গেছে। কী ব্যাপার?'

কী ব্যাপার বললাম।

শুনে অমল বলল, 'ওসব ভুবনেশ্বর দেওঘরের চিন্তা ছেড়ে দাও। ওখানে কিছু হবে না। তুমি মিলনপুরে চলে যাও। তিনদিনে তোমার অম্বল সেরে যাবে।'

'মিলনপুর কোথায়? কখনো তো নাম শুনিনি।'

অমল হাসল, 'বেশি লোক নাম শোনেনি না বলেই তো জায়গাটা এখনও ভালো আছে। ভিড় হলেই জলবায়ু বদলে যায়।'

'যাব কী করে? থাকব কোথায়?'

'কোনো অসুবিধা নেই, আমার বাবা একটা বাংলো কিনেছিল মিলনপুরে। এখন কেউ যাই না। আমিও তো এখন অন্য জায়গায় থাকি, তবে লোক আছে। তার কাছে আমার নাম কোরো। কোনো অসুবিধা হবে না।'

অমল আরও বলল, 'গিরিডি স্টেশনে নেমে তেরো মাইল। মিলনপুরে নেমে অমর-ধাম বললেই যেকোনো লোক দেখিয়ে দেবে। তুমি চলে যাও। শরীরটা সারিয়ে এসো।'

তাই গেলাম।

মিলনপুরে যখন নামলাম, তখন রাত প্রায় আটটা। চারদিক অন্ধকার। একদিকে উঁচু-নীচু পাহাড়। তার কোলে ঘন অরণ্য। আর একদিকে সরু নদী, প্রায় নালার মতন, কিন্তু কী জলের গর্জন! স্রোত পাথর থেকে পাথরে লাফিয়ে চলেছে।

টর্চ জ্বেলে কোনোরকমে এগোতে লাগলাম। সরু পায়ে চলা পথ। লাল মাটি। মাঝে মাঝে কালো পাথর। অন্যমনস্ক হলে হোঁচট খাবার আশঙ্কা।

পথের একপাশে একটা মুদির দোকান। মুদি ঝাঁপ বন্ধ করছিল, আমি গিয়ে দাঁড়ালাম।

'এখানে অমর-ধাম কোথায় বলতে পার?'

মুদি লণ্ঠন তুলে কিছুক্ষণ আমার দিকে দেখে বলল, 'সেখানে তো কেউ থাকে না। বাড়ি একেবারে জঙ্গল হয়ে আছে।'

বুঝলাম, মুদি বাড়িটার সম্বন্ধে বিশেষ খোঁজ রাখে না। জঙ্গল হলে কি অমল আমাকে আসতে বলত। এমন হতে পারে মালী হয়তো বাড়ির চারপাশ পরিষ্কার করে না। তাতেই আগাছা জন্মেছে।

আমি বললাম, 'ঠিক আছে, বাড়িটা কোন দিকে বলো?'

সূচীপত্রে যান

মুদি বলল, 'সোজা চলে যান। সামনে একটা নীচু টিলা দেখবেন, সেটা বাঁ-দিকে রেখে ঘুরে যাবেন। এক জায়গায় গোটা চারেক শাল গাছের মেলা। পাশে সাহেবদের গোরস্থান। সেটা ছাড়িয়ে একটু এগোলেই সাদা পাঁচিল ঘেরা অমর-ধাম।

এক হাতে সুটকেস, আর এক হাতে টর্চ। সাবধানে এগোতে লাগলাম। রাত ন-টার বেশি হয়নি, কিন্তু এই জনমানবহীন ঘন জঙ্গলে ঘোর অন্ধকার জায়গায় মনে হচ্ছে যেন নিশুতি রাত। ঝিঁ ঝি ডাকছে, ঝোপে ঝোপে জোনাকির ঝাঁক, মাঝে মাঝে পায়ের কাছে খর খর শব্দ করে কী যেন সরে যাচ্ছে। সাপ হওয়াও বিচিত্র নয়।

একসময়ে নীচু টিলা পেলাম। গোরস্থানও। অন্ধকারে অনেকগুলো আলোর ফুটকি। সম্ভবত শেয়ালের চোখ। বড়ো শেয়াল অর্থাৎ বাঘ হওয়াও আশ্চর্য নয়।

যাক, অবশেষে অমর-ধাম পাওয়া গেল। বেশ ভালো বাংলো। অন্তত একসময়ে বেশ ভালোই ছিল, এখন অযত্নে জায়গায় জায়গায় পলেস্তারা খসে ইট বেরিয়ে পড়েছে। জলের পাইপে আগাছা হয়েছে, সামনের চাতাল শ্যাওলায় সবুজ হয়ে আছে।

গেট ঠেলতে ক্যাচ করে বিশ্রী একটা শব্দ করে গেট খুলে গেল। ভিতরে গিয়ে জোরে জোরে কড়া নাড়তে লাগলাম। বার দশেক কড়া নাড়ার পর দরজা খোলার শব্দ হল।

বারান্দায় গলা শোনা গেল, 'কে?'

আমি ওপর দিকে মুখ তুলে বললাম, 'আমি অমরের বন্ধু। আমার আসার কথা ছিল।'

'আরে পার্থ না? তোমার জন্যই তো অপেক্ষা করে রয়েছি। দাঁড়াও, দরজা খুলে দিচ্ছি।'

আমার নিজের খুব অবাক লাগল। কে লোকটা? আমার নাম জানল কী করে? তবে কি আমাদের কোনো বন্ধু আমার মতন শরীর সারাতে এখানে এসে উঠেছে।

নীচের দরজা খুলতেই খোলা দরজা দিয়ে এক ঝাঁক চামচিকে উড়ে গেল। আর একটু হলেই তাদের ডানা আমার মাথায় লেগে যেত।

লম্বা চেহারার একটি লোক আমার দু-কাঁধে দু-হাত রেখে বলল, 'ও পার্থ, কত যুগ পরে দেখা বলো তো?' টর্চের আলোটা তার দিকে ফেরালাম।

লম্বা পুলক। আমাদের কলেজে দুজন পুলক ছিল, তাই একজন লম্বা পুলক আর একজন বেঁটে পুলক।

তারপরের কথাটা মনে হতেই মেরুদণ্ড বেয়ে ঠান্ডা প্রবাহ নামল। বুকের শব্দ দ্রুততর।

তাই তো শুনেছিলাম, বছর পাঁচেক আগে টালা ব্রিজের কাছে লম্বা পুলক দুর্ঘটনায় মারা গেছে। পুলক মোটর সাইকেলে ছিল, সামনাসামনি এক লরির সঙ্গে ধাক্কা, পুলক আর তার মোটর সাইকেল, দুইই একেবারে ছাতু হয়ে গিয়েছিল।

'কি, সারারাত বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবে নাকি?'

পুলক তাড়া দিল।

ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে বললাম, 'না চলো। একটা কথা ভাবছিলাম।'

'কী কথা?'

'শুনেছিলাম দুর্ঘটনায় তুমি মারা গেছ। বছর পাঁচেক আগে।'

পুলক খুব জোরে হেসে উঠল।

'আরে একরকম মরাই তো। দেখ না বাঁ-পায়ে একদম জোর পাই না। হাসপাতাল থেকে সোজা এখানে চলে এসেছি। বলতে নেই, এখন বেশ ভালো আছি ভাই। এখানকার জলহাওয়ায় খুব উপকার পেয়েছি। এসো, ভিতরে এসো।'

শরীর খুব পরিশ্রান্ত। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আলোচনা করতে আমারও ভালো লাগছিল না। কোনোরকমে কিছু মুখে দিয়ে শুয়ে পড়তে পারলে বাঁচি।

সূচীপত্রে যান

'স্নান করবে তো?' পুলক জিজ্ঞাসা করল।

'এত রাতে? নতুন জায়গায়? সাহস হচ্ছে না।'

'আরে গরম জলে স্নান করে নাও শরীর ঝরঝরে লাগবে। গরম জল এখনই পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

স্নান সেরে বাইরে আসতে দেখি টেবিল সাজিয়ে পুলক বসে আছে। প্লেট ভরতি গরম ভাত আর মুরগির মাংস।

'এখানে রান্না করে কে?'

পুলক বলল, 'রান্না, বাসনমাজা, ঘরদোর পরিষ্কার সবই মুংলা করে। এদেশি লোক। ভারি কাজের।'

'তুমি খাবে না?'

'আমি সন্ধ্যা ছ-টার মধ্যে খেয়ে নিই। নাও, তুমি আর বসে থেকো না। নিশ্চয় খুব ক্লান্ত। শুয়ে পড়ো। ওটা তোমার ঘর।'

এ ঘরে ঢুকেই আশ্চর্য হয়ে গেলাম। সিঙ্গল খাটের ওপর পরিপাটি বিছানা। মাথার কাছে টিপয়ের ওপর জলের গ্লাস। ভোরে উঠে আমার যে জল খাওয়ার অভ্যাস, এটা পুলক জানল কী করে?

শুয়ে পড়লাম। বিছানায় গা ঠেকানো মাত্র গভীর নিদ্রা।

মাঝরাতে পেঁচার বিদঘুটে ডাকে ঘুম ভেঙে গেল। মাথার কাছে খোলা জানলা দিয়ে চাঁদের আলো বিছানার ওপর এসে পড়েছে। ঘরের সব কিছু পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

পাশ ফিরে শুতে গিয়েই চমকে উঠলাম। বরফের মতন ঠান্ডা স্পর্শ। চোখ খুলেই রক্ত হিম হয়ে গেল।

আমারই বালিশে মাথা দিয়ে একটা কঙ্কাল শুয়ে! একটা হাত প্রসারিত। সেই হাতটাই আমার শরীরে ঠেকেছিল।

আর্তনাদ করে উঠে বসলাম।

'কী, কী হল পার্থ?'

পুলক খাটের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

কঙ্কালের দিকে আঙুল দেখাতে গিয়েই দেখলাম, 'বিছানা খালি! কোথাও কিছু নেই!'

'না, তুমি নিতান্ত ছেলেমানুষ। সরো, আমি না-হয় তোমার পাশে শুই।'

লজ্জা পেয়ে মাথা নাড়লাম, 'না, না, তোমার শুতে হবে না। তুমি যাও।'

পুলক সরে গেল।

ঘুমোবার চেষ্টা করতে করতে নতুন এক চিন্তা মনে এল। শোবার আগে আমি তো দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলাম, তাহলে পুলক ঘরের মধ্যে ঢুকল কী করে? উঠে আর পরীক্ষা করতে ইচ্ছা হল না। ঘুমে চোখ বন্ধ হয়ে এল।

পরের দিন সকালে উঠেই দেখলাম ঘরের দরজা ভিতর থেকে খিল দেওয়া। এদিক-ওদিক চোখ ফিরিয়ে দেখলাম ভিতরে ঢোকার আর কোনো পথ নেই।

তাহলে পুলক কাল রাতে ঘরের মধ্যে ঢুকল কী করে?

দরজা খুলতেই পুলককে দেখলাম। বাগানে দাঁড়িয়ে আছে।

কাল রাতে তার ঘরে ঢোকার কথা বলতেই সে হেসে উঠল খুব জোরে।

'তুমি নিশ্চয় স্বপ্ন দেখেছ। আমি আবার কখন তোমার ঘরে ঢুকলাম?'

'স্বপ্ন? তা হবে! কিন্তু এত পরিষ্কার স্বপ্ন জীবনে কখনো দেখিনি? এখনও চোখের সামনে যেন ঘুমন্ত নরকঙ্কালটা দেখতে পাচ্ছি।'

'মুখ-হাত ধুয়ে নাও। মুংলা এখনই চা দিয়ে যাবে।'

বারান্দায় দুটো বেতের চেয়ার পাতা। মাঝখানে গোল বেতের টেবিল।

সূচীপত্রে যান

হাত-মুখ ধুয়ে একটা চেয়ারে বসলাম। উলটোদিকের চেয়ারে পুলক বসে বলল, 'মুংলা, পার্থবাবুর চা নিয়ে এসো।'

চা আর টোস্ট নিয়ে যে এল, তাকে দেখে আমার সারা শরীর কেঁপে উঠল। এমন বীভৎস চেহারা আমি জীবনে দেখিনি!

গায়ে চিমটি কাটলেও এক তিল মাংস উঠবে না, এমনই শীর্ণ চেহারা। চোখ দুটো এত ভিতরে ঢোকা যে আছে কিনা বোঝাই যায় না। সরু কাঠির মতন হাত পা। ঝকঝকে দাঁতের পাটি সর্বদাই বাইরে।

চা টোস্ট দিয়ে চলে যেতে আমি বললাম, 'লোকটার চেহারা দেখলে ভয় করে।'

পুলক বলল, 'মানুষের চেহারা আর কতটুক? ছাল ছাড়ালে সবাই সমান। মুংলার চেহারা যেমনই হোক, লোকটা কিন্তু খুব কাজের। তা ছাড়া নিজের লোক ছাড়া আমরা তো আর যাকে তাকে রাখতে পারি না।'

'নিজের লোক মানে?'

'মানে খুব জানাশোনা। একেও এখানকার গাঁ থেকে অমলই জোগাড় করে এনেছে। খেতে খেতে বললাম, তোমার চা টোস্ট কই?'

পুলক উত্তর দিল, 'আমি এসব খাই না ভাই। সহ্য হয় না। ভোরে উঠে ছোলা ভিজানো খাই আদা দিয়ে।'

একটু থেমে পুলক বলল, 'তুমি বসো। আমি একটু ঘুরে আসি।'

'এখন আবার কোথায় যাবে?'

'একবার পোস্ট অফিসে যাব, তা ছাড়া আরও দু-এক জায়গায় ঘুরে আসব। তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করো না। আমি বাইরে কোথাও খেয়ে নেব।'

সারাটা দিন পুলক ফিরল না। সন্ধ্যার সময়েও না।

মুংলাকে জিজ্ঞাসা করতে সে বলল, 'বাবুর ফেরার কোনো ঠিকঠিকানা নেই। কোথায় কোথায় যে যান—'

খাবার সময়ে এক কাণ্ড। বসে খাচ্ছি, পাশে মুংলা দাঁড়িয়ে। তাকে বললাম, 'একটু তরকারি নিয়ে এসো তো, আর দু-খানা রুটি।'

মুংলা চৌকাঠের কাছ পর্যন্ত গিয়ে বাইরে হাত বাড়িয়ে তরকারি আর রুটি এনে দিল। ঠিক মনে হল এগুলো নিয়ে কে যেন বাইরে অপেক্ষা করছিল।

কিছু আর জিজ্ঞাসা করলাম না, কিন্তু এ বাড়ির বাতাসে কেমন যেন ভয়ের গন্ধ! মনে হয় অশরীরী আত্মারা আনাচেকানাচে লুকিয়ে আছে।

সেই রাত্রেই দারুণ দৃশ্য চোখে পড়ল। পুলক তখনও ফেরেনি।

ঘুম আসেনি, বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ করছি। হঠাৎ বাইরে খরখর আওয়াজ। পাশা দু-হাতে রগড়ালে যেমন শব্দ হয়, ঠিক তেমনই।

আস্তে আস্তে উঠে জানলার খড়খড়ি খুলে বাইরে চোখ রাখলাম। ম্লান চাঁদের আলো। খুব স্পষ্ট নয়, আবার একেবারে অস্পষ্টও নয়।

উঠানে একটা গুঁড়ির ওপর দুটো কঙ্কাল ঘেঁষাঘেঁষি বসে। একজনের হাত আরেক জনের গলায়। আর একটু দূরে একটা গাছের ডাল ধরে মুংলা দোল খাচ্ছে। কী লম্বা চেহারা! সারা দেহে কোথাও এক তিল মাংস নেই! চোখের দুটো গর্ত থেকে গাঢ় লাল রং বের হচ্ছে।

অজান্তেই মুখ থেকে একটা আর্তনাদ বের হয়ে গিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে কঙ্কাল দুটো ফিরে দেখল। চোখ নেই, তবুও কী মর্মভেদী দৃষ্টি! বুকের রক্ত শুকিয়ে জমাট হয়ে গেল।

আশ্চর্য কাণ্ড! একটু একটু করে কঙ্কাল দুটোয় মাংস লাগল। সেকেন্ড কয়েকের মধ্যে দুটি পূর্ণ মানুষের মূর্তি ফুটে উঠল।

তখন আর চিনতে অসুবিধা হল না। একজন পুলক, আর একজন অমল। কাঁপতে কাঁপতে বিছানায় ফিরে গোলম।

সূচীপত্রে যান

সারা রাত ঘুমাতে পারলাম না। যা দেখেছি তারপর ঘুমানো সম্ভবও নয়। বাইরে খটখট শব্দ। মনে হল একাধিক কঙ্কাল মূর্তি উঠানে পায়চারি করছে। সেই শব্দের সঙ্গে পেঁচার ডাক, বাদুড়ের ডানার ঝটপটানি মিশে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করল।

ভোর হতে আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা করিনি। সুটকেসটা হাতে নিয়ে ছুটতে লাগলাম। বের হবার সময় রান্নাঘর থেকে বাসনপত্রের আওয়াজ আসছিল। একটু পরেই হয়তো মুংলা চা নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াবে। দিনের আলোতেই মুংলার মুখোমুখি দাঁড়াবার সাহস আমার নেই।

ছুটতে ছুটতে যখন মুদির দোকানের সামনে গিয়ে পৌঁছোলাম, তখন মুদি সবে দোকানের ঝাঁপ খুলছে।

হাঁপাতে হাঁপাতে বললাম, 'এক গ্লাস জল!'

মুদি আমাকে দেখে অবাক। বোধ হয় জীবন্ত দেখবে আশাও করেনি। জল দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি অমর-ধাম থেকে আসছেন?'

'হ্যাঁ।'

'খাওয়াদাওয়ার কী করতেন?'

মুদির কাছে কিছু বলতে ইচ্ছা হল না। শুধু বললাম, 'কেন, মুংলা রাঁধত।'

মুদির মুখটা হাঁ হয়ে গেল। দুটো চোখ বিস্ফারিত।

কাঁপা গলায় বলল, 'মুংলা মানে মুংলা মুণ্ডা? মুংলাকে তো বছর পাঁচেক আগে অমর ধাম-এর এক গাছের ডালে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল।'

'আত্মহত্যা?'

'কী জানি, অনেকে বলেছিল, বিষয়সম্পত্তি নিয়ে গোলমাল হওয়ায় ভাইপোরাই নাকি মেরে ঝুলিয়ে রেখেছিল।'

আর দাঁড়াইনি। গিরিডি না পৌঁছানো পর্যন্ত শান্তি নেই। অমর-ধামের বাসিন্দারা গন্ধ শুঁকে শুঁকে হাজির হলেই সর্বনাশ!

বাকিটা শুনলাম গিরিডির স্টেশন মাস্টারের কাছে। ওই বাড়ির অমলবাবু মাঝে মাঝে আসা-যাওয়া করতেন। বছর দুয়েক আগে তাঁকে ঘাড় মটকানো অবস্থায় বাড়ির উঠানে পাওয়া গিয়েছিল। গিরিডি থেকে পুলিশের কর্তা গিয়েছিল, কিন্তু খুনের কোনো হদিস হয়নি।

মাথাটা ঘুরে উঠল। তাহলে কলকাতার রাস্তায় অমলের সঙ্গে দেখা, আমাকে মিলনপুরে আসার আমন্ত্রণ করা— এ সবের কী ব্যাখ্যা হতে পারে?

আর পুলকের দুর্ঘটনায় মৃত্যু, এ তো আমার জানাই ছিল। নিজেদের দল বাড়াবার জন্যই কি আমাকে ডেকে আনা হয়েছিল? তাহলে হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়ে ছেড়ে দিল যে!

গলায় পৈতা আছে বলেই কি?

কী জানি, যত ভাবি এ প্রশ্নের কোনো উত্তর পাই না।

সূচীপত্রে যান

পিছনের জানলা

আচমকা বদলির হুকুম এল কলকাতা থেকে গয়া। মোটঘাট বেঁধে গয়া পৌঁছে দেখি প্ল্যাটফর্মে সুখলাল দাঁড়িয়ে।

সুখলাল অফিসের কাজে অনেক বার কলকাতা এসেছে। এক অফিসেরই লোক। সেই সূত্রেই আলাপ।

সুখলাল বলল, 'আপনার জন্য একটা বাসার জোগাড় করে রেখেছি। শহরের একটু বাইরে। বেশ নিরিবিলি জায়গা, আপনার ভালোই লাগবে।'

শহর থেকে মাইল দুয়েক দূর। বাড়িটা একনজরে ভালোই লাগল।

একতলা। চারদিকে বাগান, মানে একসময় বাগান ছিল, এখন আগাছার জন্য কিছুটা জঙ্গলের চেহারা নিয়েছে। দু-খানা ঘর, একটা বসবার আর একটা শোবার, এ ছাড়া ছোটো একটা রান্নাঘর।

সুখলাল বাড়ির মধ্যে ঢুকে দু-দিকের জানলাগুলো খুলে দিল। শীতের অল্প ঠান্ডা বাতাস ভালোই লাগল। চারপাশে বাড়ি না থাকায় অনেক দূর পর্যন্ত দেখা গেল। উঁচু-নীচু মাঠ গাছপালা ঝোপঝাড়।

রান্নার ঘরে ঢুকে সুখলাল বলল, 'পিছনের এ জানলা খুলবেন না।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন?'

'এদিক দিয়ে তো আর বাতাস আসবে না। কী দরকার খুলে।'

আর কিছু বললাম না। জিনিসপত্র গোছাতে আরম্ভ করলাম।

সুখলালই দুলালির মাকে জোগাড় করে দিল। রান্নাবান্না থেকে ঝাঁট দেওয়া, কাপড় কাচা, সব কিছুই করবে।

দিন তিনেক পর দুলারির মাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'সুখলালবাবু রান্নাঘরের জানলাটা খুলতে বারণ করেছে কেন বলো তো?'

দুলারির মা অনেকক্ষণ ধরে আমার দিকে চেয়ে রইল। দৃষ্টিতে কৌতূহল আর বিস্ময়। তারপর বলল, 'ও জানলাটা নাই খুললেন বাবু!'

'কিন্তু কেন?'

'রান্নাঘরের জানলা তো, খাবার জিনিস থাকে। যদি ধুলোবাড়ি পড়ে, কিংবা কুকুর বেড়াল ঢুকে পড়ে।'

অবশ্য জানলার কোনো গরাদ নেই। ছোটোখাটো জন্তু-জানোয়ার ঢুকে পড়া মোটেই বিচিত্র নয়। তবু আমার মনে হল, আসল কথাটা যেন দুলারির মা চেপে যাচ্ছে।

কী হতে পারে রান্নাঘরের জানলাটা খুললে।

ছুটির দিন। অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমোলাম। ঘুম থেকে উঠে দেখলাম, দুলালির মা টেবিলের ওপর চায়ের কাপ রেখে গেছে। রোজকার মতন।

চা খাওয়া হতেই দুলারির মা এসে দাঁড়াল। 'বাবু দরজাটা বন্ধ করে দিন। বাজারে যাব।'

দরজাটা বন্ধ করে মুখ-হাত ধুয়ে রান্নাঘরের চৌকাঠে গিয়ে দাঁড়ালাম। আর দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গেই চোখ গিয়ে পড়ল পিছনের জানলার ওপর।

বাইরে এলোমেলো শীতের হাওয়া বইছে। বন্ধ জানলাটা সেই হাওয়ায় থরথর করে কাঁপছে। ঠিক মনে হল যেন বলছে, আমাকে খুলে দাও— আমাকে খুলে দাও!

খুলতে গিয়েও দাঁড়িয়ে পড়লাম। সব্বাই যখন বারণ করছে, তখন কী দরকার জানলাটা খুলে।

সূচীপত্রে যান

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ছেলেমানুষি ভয়টা দূর করে সজোরে জানলায় ধাক্কা দিলাম। জানলা খুলল না। অনেক দিন না খোলার জন্য এঁটে গিয়েছে।

আমারও জেদ চেপে গেল। প্রাণপণ শক্তিতে জানলাটা খোলবার চেষ্টা করতে লাগলাম। বার চারেক ধাক্কা দেবার পরে জানলাটা খুব শব্দ করে খুলে গেল। খোলার সঙ্গে সঙ্গেই আশ্চর্য এক কাণ্ড। বাইরে থেকে গরম একটা হাওয়ায় ঝলক ঘরের মধ্যে এসে ঢুকল!

কেন এমন হল? অন্য জানলা দিয়ে বেশ ঠান্ডা হাওয়া আসছে। শীতের স্বাভাবিক হাওয়া।

তবে কি অনেক দিন বন্ধ থাকার জন্য হাওয়াটা এরকম গরম? ঠিক বুঝতে পারলাম না।

এগিয়ে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। কী আছে বাইরে, যার জন্যে এ জানলাটা খোলা নিষেধ ছিল।

এদিক-ওদিক দেখতে দেখতেই নজরে পড়ল।

কাছেই একটা ঝাঁকড়া গাছের নীচে একটা কবর। কবরের সাইজ দেখে মনে হল ছোটো বয়সের কেউ শুয়ে আছে। কবরের মাথার কাছে একটা সাদা রঙের ক্রস।

এই ব্যাপার! এরই জন্য এত কাণ্ড! সুখলাল আর দুলারির মা কি মনে করেছিল, কবর দেখে আমি ভয় পাব, তাই জানলাটা খুলতে মানা করেছিল?

তা ছাড়া আর কী হতে পারে! আর তো কিছু চোখে পড়ছে না।

সদর দরজায় খুট খুট শব্দ হতে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে দরজা খুলে দিলাম। দুলারির মা বাজার নিয়ে ফিরেছে।

আমাকে দেখে বলল, 'বাবু বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন? অনেকক্ষণ দরজা ঠেলছি।'

আমি কোনো উত্তর না-দিয়ে শোবার ঘরে চলে এলাম।

একটু পরেই রান্নাঘর থেকে দুলারির মায়ের চিৎকার কানে এল। 'এ কী, এ জানলা কে খুলল? সর্বনাশ, কে এমন কাজ করলে?'

রান্নাঘরে গিয়েই অবাক হয়ে গেলাম। বাজারের জিনিস চারিদিকে ছড়ানো। দুলারির মায়ের এলোমেলো বেশ। খোলা চুল। লাল দুটি চোখ। চিৎকার করে চলেছে।

'কী হল? সরো আমি জানলা বন্ধ করে দিচ্ছি!'

এগিয়ে গিয়ে জানলাটা বন্ধ করার চেষ্টা করলাম। প্রথমে এক হাত দিয়ে, তারপর দু-হাতে, কিন্তু কিছুতেই বন্ধ করতে পারলাম না।

মনে হল জানলার পাল্লাটা যেন কাঠের নয়, নিরেট পাথরের তৈরি। একচুল সরানো গেল না।

'ও আর বন্ধ হবে না। আমি ঠিক জানি বাবু, সর্বনাশ একটা হবে!' দুলারির মা হাঁউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠল।

সজোরে তাকে একটা ধমক দিলাম, 'আঃ, কী হচ্ছে কী? চুপ করো! জানলার কবজাটা শক্ত হয়ে গিয়েছে। কাল মিস্ত্রি ডেকে ঠিক করে নিলেই হবে।'

সেই রাত্রেই।

আমার খাবার ঢাকা দিয়ে দুলারির মা রোজকার মতন চলে গিয়েছে। আমি বাইরের ঘরে বসে অফিসের কাজ করছিলাম, ঘড়ির দিকে নজর পড়তেই উঠে পড়লাম। খাবার সময় হয়েছে।

রান্নাঘরের কাছে গিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

খাবারের ঢাকা খোলা। থালার কাছে বছর ছয়েকের এক শিশু। ধবধবে গায়ের রং। এক মাথা কোঁকড়ানো সোনালি চুল। নীল দুটি চোখ। শিশুটি দাঁড়িয়ে নেই। অনবরত থালাটার চারপাশে ঘুরছে।

হাত দিয়ে চোখ দুটো রগড়ে নিলাম। ভুল দেখছি না তো? ঘরের মধ্যে শিশু আসবে কী করে?

না, সেই একই দৃশ্য। শিশুটি ঘুরপাক খাচ্ছে। খুব ধীর পায়ে।

সূচীপত্রে যান

একটু পরেই শিশুটি থেমে গেল। মুখ তুলে দেখল আমার দিকে। নীল দুটি চোখের অদ্ভুত দৃষ্টি। আমার সারা দেহ যেন হিমের স্পর্শে অসাড় হয়ে গেল!

শিশুটি পিছন ফিরে রান্নাঘরের দিকে চলতে শুরু করল।

আমি সাহস করে তার দিকে এগিয়ে গেলাম। কিছুটা গিয়ে আর যেতে পারলাম না। ঠিক জানলার কাছে যেতেই অসহ্য গরম হাওয়া। বাড়িতে আগুন লাগলে যেমন গরম তাপ লাগে, অবিকল সেইরকম।

একটা ধোঁয়ার কুণ্ডলী। তারপর শিশুটিকে দেখতে পেলাম না।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সন্দেহ হল। সবই হয়তো আমার মনের ভ্রম। ছোটো একটা কবর দেখে শিশুটিকে কল্পনা করেছি। সেই কল্পনার রূপই দেখেছি চোখের সামনে।

খেতে বসতে গিয়েই থেমে গেলাম।

থালার চারপাশ ঘিরে ছোটো ছোটো পায়ের চিহ্ন। দুপুরের দিকে বৃষ্টি হয়েছিল। বাইরে মাঠে জল জমেছে। শিশুটি বুঝি সেই জল পার হয়ে এসেছে।

খাবারে হাত দিতে পারলাম না। উঠে এলাম। তাহলে এ তো আমার মনের ভুল নয়। শিশুটি সত্যিই এসেছিল।

এই প্রথম মনে হল, পিছনের জানলাটা না খুললেই ভালো করতাম। কাল মিস্ত্রি ডেকে জানলাটা আগে বন্ধ করতে হবে।

অনেকক্ষণ শোবার ঘরে পায়চারি করলাম। মাথাটা গরম হয়ে আসছে। এখন শুলেও ঘুম আসবে না।

বেশ কিছুক্ষণ পরে আবার রান্নাঘরে গেলাম। ভালো করে দেখলাম কোথাও কোনো পদচিহ্ন নেই। অবশ্য জলের দাগ এতক্ষণ থাকার কথা নয়।

তবু খাবার কোনো ইচ্ছা করল না। একসময়ে বাতি নিবিয়ে শুয়ে পড়লাম। সহজে ঘুম এল না। এপাশ-ওপাশ করতে লাগলাম।

রাত তখন ক-টা জানি না। গলায় খুব ঠান্ডা একটা স্পর্শ পেয়ে চমকে জেগে উঠলাম।

জানলার কাচের মধ্য দিয়ে চাঁদের আলো এসে বিছানার ওপর পড়েছে। কোথাও কোনো অস্পষ্টতা নেই।

সেই শিশুটি এক হাত দিয়ে আমার গলা আঁকড়ে ধরে শুয়ে রয়েছে।

সবলে শিশুকে সরিয়ে দিতে চাইলাম, পারলাম না। এইটুকু শিশুর কী অসীম শক্তি! হঠাৎ দেখতে দেখতে আশ্চর্য রূপান্তর ঘটল।

শিশুর দেহের মাংস আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল। পরিবর্তে একটা কঙ্কাল বিছানায় শুয়ে! একভাবে হাত দিয়ে আমার গলা বেষ্টন করে রয়েছে। হাড়ের দৃঢ় বাঁধন।

চিৎকার করে উঠলাম। প্রাণপণ শক্তিতে হাতটা সরাবার চেষ্টা করলাম। পারলাম না।

আবার সেই আগুনের হলকা। মনে হল, সেই তাতে আমার মাংসও বুঝি গলে গলে পড়বে। আমিও কঙ্কালে পরিণত হব!

তারপর কী হল আমার জানা নেই। অনেকগুলো লোকের ক্ষীণকণ্ঠ, তাদের পায়ের আওয়াজ।

জ্ঞান হতে দেখলাম, বিছানায় শুয়ে আছি।

পাশে সুখলাল, আর একজন ডাক্তার। একটু দূরে দুলারির মা দাঁড়িয়ে।

শুনলাম পরের দিন সকালে বাড়ির মধ্যে না-পেয়ে খুঁজতে খুঁজতে দুলারির মা আমায় পিছনের মাঠে পেয়েছে। সেই ছোটো কবরটার পাশে শুয়ে ছিলাম।

কখন, কীভাবে সেখানে গিয়েছি, জানি না।

সূচীপত্রে যান

অবিশ্বাস্য

বিশ্বাসই হচ্ছে আসল বস্তু। এই বিশ্বাসে ভগবান আর ভূত দুই-ই পাওয়া যায়।

আশ্চর্যের কথা, পৃথিবীতে ভূতে বিশ্বাস করে যত লোক, অবিশ্বাসীদের সংখ্যা তার চেয়ে কম নয়।

যাঁরা অবিশ্বাসী তাঁরা বলেন, ভূত বলে কিছু নেই। ও শুধু চোখের ভুল, মনের ভুল।

বিশ্বাসীরা ঘোরতরভাবে আপত্তি করে, এতগুলো লোকের চোখের ভুল, মনের ভুল কখনো হতে পারে!

এ তর্কের শেষ নেই। মীমাংসাও নয়।

আমি নিজে একটা ঘটনা জানি। এই শহরেরই কোনো এক বাড়ির ব্যাপার। ছেলে খেতে বসেছে, পাতের কাছে ঠক করে একটা শব্দ। রক্তমাখা একটা হাড় এসে পড়ল। বাড়ির প্রৌঢ় কর্তা পূজায় বসেছেন, তাঁর পূজার থালায়, ফুল-চন্দনের ওপর ছর-ছর করে রক্তের ছিটে পড়তে লাগল।

তারপর বাতাস নেই, বৃষ্টি নেই, অথচ হঠাৎ জানালা দরজা খুলে গেল। ছাদের ওপর বৃষ্টিপাতের আওয়াজ। এ তো হামেশাই লেগেছিল।

সে বাড়ি এখন আর নেই। করপোরেশন থেকে ভেঙে ফেলা হয়েছে বড়ো রাস্তা করার জন্য। বাড়ি ভাঙতে দেখা গেল, ভিতের নীচে একটা কবর। কার কবর, কবেকার কেউ জানে না, কিন্তু সকলের ধারণা এটাই বিপদের কারণ।

অবশ্য এ ঘটনা আমার চোখে দেখা নয়। আমার এক শিক্ষকের কাছে শোনা। বিজ্ঞ বয়স্ক লোক, ভূতের মায়াজাল সৃষ্টির জন্য তিনি অযথা কল্পনা করে কিছু বলবেন, এ আমি ভাবতেই পারি না।

আজ তোমাদের যে ঘটনা শোনাব, সেটা আমার নিজের চোখে দেখা। সমবয়সিদের কথাটা বলেছি, তারা মুচকি হেসেছে। বলেছে, ডাক্তার দেখাও হে, তোমার হজমের গোলমাল হচ্ছে।

আমি জানি তোমরা মানুষকে নিরর্থক সন্দেহ করো না। সব কিছু সহানুভূতি দিয়ে বিচার করো। সেই সাহসেই এ কাহিনি তোমাদের বলছি—

আজ থেকে প্রায় ত্রিশ বছর আগেকার কথা। সবে কলেজ থেকে বেরিয়েছি, ইতস্তত চাকরির সন্ধান করছি।

এমন সময় পাড়ার ছেলেরা আমার কাছে এসে হাজির।

'কী ব্যাপার, এখন তো পূজার মরশুম নয়, তবে কীসের চাঁদা?'

ছেলেরা হাসল।

'না, চাঁদা নয়। স্কুল বন্ধ হয়ে গেছে, আমরা অভিনয় করব, একটা বই ঠিক করে দিন।'

বললাম, 'অভিনয় কেন, নতুন কিছু করো।'

'কী করব বলুন?'

হঠাৎ মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, 'জলসা করো। বিচিত্রানুষ্ঠান।'

তখন এ যুগের মতন গলিতে গলিতে সপ্তাহে দুটো করে জলসার রেওয়াজ হয়নি। তাই ছেলেদের বললাম, 'গান থাকবে, বাজনা থাকবে, আবৃত্তি আর তোমরা যদি চাও দু-একটি নাটকের খণ্ড দৃশ্য অভিনয়ও করতে পারো।'

ছেলেরা খুব খুশি, তবে একটু আপত্তির সুর তুলল।

'দু-একজন ভালো শিল্পী না থাকলে শুধু আমাদের গান-বাজনা শুনতে কি কেউ টিকিট কিনবে? আমরা লাইব্রেরির জন্য কিছু টাকা তুলতে চাই।'

সূচীপত্রে যান

কলেজে আমাদের বছরে দুটো করে বিচিত্রানুষ্ঠান হত। সেইসব পরিকল্পনা আর আয়োজনের ভার ছিল আমার উপর। বাইরে থেকে গায়ক-গায়িকারা কলকাতায় এলেই আমি যোগাযোগ করতাম। তাঁদের নিয়ে আসতাম কলেজে।

কিন্তু কলেজের অর্থসামর্থ্য ছিল। পাড়ার ছেলেরা কি মোটা টাকা দক্ষিণা দিয়ে এঁদের আনতে পারবে?

ছেলেদের এ কথা কিছু বললাম না। বেচারিরা কষ্ট পাবে। তাই মুখে বললাম, 'ঠিক আছে, খোঁজ করে দেখি কলকাতায় কে আছে! অন্তত একজনকে আনতে চেষ্টা করব। তোমাদের কবে হবে?'

ছেলেরা তারিখ বলল।

আমি যথাসময়ে বেড়িয়ে পড়লাম।

আগেই খোঁজ নিয়েছিলাম, দু-জন এ সময় শহরে আছেন। লখনউয়ের বেগম আনোয়ার আর ওস্তাদ জামির খাঁ।

এঁদের দুজনের সঙ্গেই যথেষ্ট হৃদ্যতা আছে। অনেকবার কলেজে এসেছেন।

প্রথমে গেলাম বেগম আনোয়ারের কাছে। সব শুনে বেগম বললেন, 'নিজে এসেছেন বাবুজি, কী আর বলব, কিন্তু আমি আজ রাতেই পাটনা রওনা হচ্ছি।'

'পাটনা?'

'হ্যাঁ, গর্দানিবাগে গানের আসর আছে। কথা দিয়েছি, জবান রাখতেই হবে। কসুর মাপ করবেন বাবুজি।'

এরপর আর কী বলব! জিজ্ঞাসা করলাম, 'আচ্ছা, ওস্তাদ জামির খাঁ কোথায় আছেন বলতে পারেন? শুনেছিলাম তিনি ভূপাল থেকে এখানে এসেছেন।'

বেগম আনোয়ার বিষণ্ণকণ্ঠে বললেন, 'জামির খাঁ সাহেব এখানেই আছেন। তবে শুনলাম, তাঁর শরীর খুব খারাপ। আসরে কি আর গান গাইবেন?'

'দেখি চেষ্টা করে। আপনি ঠিকানাটা বলুন।'

'সাতের তিন বেনেটোলা লেন।'

বেগম আনোয়ারকে সেলাম জানিয়ে বেরিয়ে এলাম।

ঠিক জায়গায় ট্রাম থেকে নামলাম।

অপ্রশস্ত গলি। দু-পাশে বস্তির সার। ইতস্তত মুরগির পাল চরে বেড়াচ্ছে।

জরাজীর্ণ বাড়ি। একপাশের দেয়াল ভেঙে পড়েছে। আগাছার ঝোপ। সাদা রং দিয়ে বাড়ির নম্বর লেখা।

শিল্পীর খেয়াল ছাড়া আর কী! নইলে এমন জায়গায় ওস্তাদ জামির খাঁ থাকবেন এটা কল্পনারও অতীত।

উঠানে দাঁড়িয়ে ডাকলাম, 'ওস্তাদজি, ওস্তাদজি!'

বার তিনেক ডাকার পর ভিতর থেকে ক্ষীণকণ্ঠ ভেসে এল।

'কে? কে ওখানে?'

ভিতরে ঢুকলাম। ঢুকেই চমকে উঠলাম।

পাতলা একটা ফতুয়া পরনে। গালে দাড়ির ঝোপ। কোটর গত চোখ। ময়লা একটা তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসে আছেন।

'একী, আপনার চেহারা খুব খারাপ হয়ে গেছে ওস্তাদজি!'

ওস্তাদজি ম্লান হাসলেন।

'শরীরটা ক-দিন খুব খারাপ যাচ্ছে। হাঁপানিতে বড়ো কষ্ট পাচ্ছি।'

একটু ইতস্তত করে আমার কথাটা নিবেদন করলাম।

ওস্তাদজি থেমে থেমে বললেন, 'আপনি এসেছেন, আপনাকে না বলি কী করে! আপনার হাত দিয়ে অনেক দিন অনেক টাকা পেয়েছি। কলেজের উৎসবে প্রত্যেক বছরেই আপনি নিয়ে গেছেন। কবে আপনাদের অনুষ্ঠান?'

সূচীপত্রে যান

'সামনের শনিবার।'

'শনিবার। তার মানে এখনও চারদিন সময় আছে। আপনি তো জানেন আমি মাঝরাতের আগে গান গাই না আসরে। আমি ঠিক রাত বারোটায় যাব। আমার এক দোস্তের মোটরে। আপনাকে কষ্ট করতে হবে না।'

দক্ষিণার টাকা ক-টা ওস্তাদজির সামনে রাখতেই তিনি মাথা নাড়লেন।

'টাকা আপনি উঠিয়ে নিয়ে যান বাবুজি। আপনি আমার বহুদিনের চেনা লোক। সে রাতেই টাকাটা আপনার কাছ থেকে নেব।'

খুশি মনে উঠে এলাম।

খবরটা দিতেই ছেলেদের মধ্যেও খুশির বন্যা বয়ে গেল।

ওস্তাদ জামির খাঁ বিখ্যাত খেয়াল গায়ক। তাঁর মতো গুণী শিল্পী এই ছোটো অনুষ্ঠানে গাইতে সম্মত হবেন, তা তারা ভাবতেই পারেনি। লাল শালুর ওপর জামির খাঁর নাম লিখে ছেলেরা পাড়ার পথেঘাটে টাঙিয়ে দিল।

অনুষ্ঠানের দিন আমি গেটের কাছে অপেক্ষা করতে লাগলাম। জলসা শুরু হয়েছে সাড়ে ন-টায়, এখন রাত এগারোটা আসরে লোক ভরতি।

জামির খাঁ অসুস্থ মানুষ, আশা করেছিলাম তিনি ঘণ্টা খানেক আগেই আসবেন। একটু বিশ্রাম নেওয়া প্রয়োজন।

সাড়ে এগারোটা বাজল। পৌনে বারোটা সর্বনাশ, ওস্তাদজির দেখা নেই!

সম্ভবত অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। আসতে পারবেন না। কিন্তু এই কথাটা ঘোষণা করলেই চেঁচামেচি শুরু হবে। লোকে ভাববে মিথ্যা স্তোকবাক্য দিয়ে তাদের টিকিট কিনিয়েছি।

শামিয়ানা জ্বালিয়ে দেওয়া বিচিত্র নয়। আমরাও যে অক্ষত থাকব, এমন সম্ভাবনা কম।

বারোটা বাজতে যখন মিনিট দুয়েক, তখন ভিতর থেকে একটি ছেলে এসে বলল, ওস্তাদজি এসে গেছেন।

সেকী, আমি ঘাঁটি আগলে রয়েছি, ওস্তাদজি এলেন কোথা দিয়ে!

ভিতরে গিয়ে দেখলাম, মঞ্চের এক কোণে ওস্তাদজি বসে। সারা শরীরে কালো পোশাক।

আমি প্রশ্ন করার আগেই বললেন, 'দোস্ত পিছনের রাস্তায় ছেড়ে দিয়ে গেল। একটু ঘুরপথ। তা আসতে অসুবিধা হয়নি।'

ঠিক বারোটায় ওস্তাদজির গান শুরু হল।

ভালো করে গান শোনবার জন্য আমি আসরে গিয়ে বসলাম।

দুটি খেয়াল গাইলেন। রাগ যোগিয়া আর বৃন্দাবনী সারং।

কী অপূর্ব কণ্ঠলালিত্য, বোঝানো সম্ভব নয়। গান শুনে মনেও হল না ওস্তাদজি অসুস্থ।

আসর থেকে আরও গাইবার অনুরোধ আসতে ওস্তাদজি সেলাম জানিয়ে উঠে পড়লেন।

তন্ময় হয়ে শুনেছিলাম। যখন খেয়াল হল দেখলাম, মঞ্চে একটি তরুণ আধুনিক গান গাইছে। পাড়ারই কোনো ছেলে।

ওস্তাদজির সম্মান দক্ষিণা আমার মুঠোর মধ্যেই ছিল। তাঁকে দেবার জন্য মঞ্চের ভিতর গেলাম।

ওস্তাদজি নেই। কে একজন বলল, শরীর খারাপ বলে গান শেষ করেই চলে গিয়েছেন।

পরের দিন ভোরে সেক্রেটারির মোটরগাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

ওস্তাদজির হাতে টাকাটা দিয়ে আসব আর সেইসঙ্গে তাঁকে ধন্যবাদও দিয়ে আসব, অমন চমৎকার গান করার জন্য।

জামির খাঁর গান আমি আগেও অনেকবার শুনেছি। আমাদের কলেজে, কলেজের বাইরে, কিন্তু কাল রাতের মতন তাঁর গাইবার ঢং, গলার অমন অপূর্ব কাজ কোনোদিন বোধ হয় শুনিনি।

কী লজ্জার কথা, তাঁর মতন একজন উঁচুদরের শিল্পী শহরের নিভৃত কোণে অসুস্থ অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন!

সূচীপত্রে যান

মোটরগাড়ি থামল।

উঠানের ওপর একটা বেঞ্চ পাতা। তাতে গুটি তিনেক ভদ্রলোক বসে আছেন।

শিল্পীদের পরিত্রাণ নেই। কাল অত রাতে ফিরেও আবার কোথাও যেতে হবে, কিংবা লোকেরা আগাম বায়না দিতে এসেছেন।

উঠানে দাঁড়িয়ে ডাকলাম—

'ওস্তাদজি, ওস্তাদজি!'

কোনো সাড়া নেই। খুব সম্ভবত ওস্তাদজি ক্লান্ত হয়ে ঘুমুচ্ছেন। আর একটু বেলা করে এলেই হত।

ভিতরে যাব কিনা ভাবছি, এমন সময় বেঞ্চে বসা একটি লোক এগিয়ে আমার কাছে এসে দাঁড়াল।

'আপনি কাকে খুঁজছেন?'

'ওস্তাদজিকে।'

'কোন ওস্তাদজি?'

'ওস্তাদ জামির খাঁ। বিখ্যাত খেয়াল গায়ক।'

লোকটি বার কয়েক আমার আপাদমস্তক দেখে প্রশ্ন করল, 'আপনি কোথা থেকে আসছেন?'

'আমি চাঁপাতলা বয়েজ ক্লাব থেকে আসছি। কাল রাতে ওস্তাদজি আমাদের ওখানে গান গাইতে গিয়েছিলেন। শরীর খারাপ বলে তাড়াতাড়ি চলে আসেন। তাই তাঁকে টাকাটা দিতে এসেছি।'

লোকটি আমার মুখের দিকে একটু দেখে হাত নেড়ে বেঞ্চে বসা একটি লোককে ডাকলেন।

তিনি আসতে উর্দুতে তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ কী বললেন!

তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, 'আপনি আসুন আমার সঙ্গে।'

লোকটির পিছন পিছন ভিতরে গেলাম।

একহাতে পর্দা সরিয়ে উঁকি দিয়েই চমকে উঠলাম।

ওস্তাদ জামির খাঁ শুয়ে আছেন। দুটি হাত বুকের ওপর জড়ো করা। চোখ নিমীলিত। বোঝা যায় দেহে প্রাণের লক্ষণ নেই।

লোকটি অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'ওস্তাদজির কাল রাত বারোটায় এন্তেকাল হয়েছে। আমরা মৌলভির জন্য অপেক্ষা করছি বাবু।'

রাত বারোটায়! রাত বারোটায় ওস্তাদজি মারা গেলেন?

আস্তে আস্তে পিছিয়ে এলাম। ঘর থেকে উঠানে। উঠান থেকে রাস্তায়। একী সম্ভব! এ তো শুধু আমার চোখের ভুল নয়; অগণিত দর্শক তাঁকে দেখেছে, অগণিত শ্রোতা তাঁর গান শুনেছে।

লিখতে লিখতে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে। কত বছর হয়ে গেল, কিন্তু এখনও যেন সমস্ত ঘটনা চোখের সামনে জ্বলজ্বল করছে।

কী এর ব্যাখ্যা?

জবান রাখবার জন্য ওস্তাদ জামির খাঁর আত্মা আমাদের আসরে গিয়ে গান গেয়ে এসেছিলেন কিনা, এমন প্রশ্ন করো না, এর উত্তর আমার জানা নেই।

তবে এইটুকু জানি, সংবাদপত্রে ওস্তাদজির মৃত্যুর খবর পড়ে আমার মতন বহুলোকই চমকে উঠেছিলেন, যাঁরা সে রাতে আসরে ওস্তাদজিকে দেখেছিলেন, তাঁর দু-খানি অনবদ্য গান শুনেছিলেন।

অনেকেই মনকে বুঝিয়েছিলেন, কাগজে মৃত্যুর সময়টা ভুল লিখেছে।

কিন্তু আমি মনকে কী বোঝাব!

তাই বলছিলাম, বিশ্বাস করো। বিশ্বাস ছাড়া আর পথ নেই।

সূচীপত্রে যান

আমরা আছি

ছেলেবেলা থেকে আমার ভূত খোঁজার নেশা। যখনই পোড়োবাড়ির খোঁজ পেয়েছি, যেটা ভূতেদের আস্তানা, সব কাজ ফেলে সেখানে গিয়ে হাজির হয়েছি। গুরুজনদের হাজার নিষেধ সত্ত্বেও রাত কাটিয়েছি সেখানে, কিন্তু ভূতের সন্ধান পাইনি।

কতবার যে শ্মশানে ঘুরেছি তার ঠিকঠিকানা নেই। অমাবস্যার রাতে কুকুর-শেয়ালদের আগুন-জ্বলা চোখ দেখেছি। এলোমেলো বাতাসে মড়ার খুলি থেকে অদ্ভুত শব্দ বের হয়েছে, তাই শুনেছি ভয় পাইনি।

সব দেখেশুনে একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছি, ভূত নেই, ভূতের কাহিনি মানুষের কল্পনা। যাঁরা বলেছেন, স্বচক্ষে ভূত দেখেছেন, তাঁরা নিছক চোখের ভুলের শিকার হয়েছেন।

সভা-সমিতিতে বন্ধুবান্ধবদের আসরে সরবে ঘোষণা করেছি, যে যাই বলুক, ভূতটুত নেই। প্ল্যানচেট একটা নিছক ধাপ্পাবাজি।

ঠিক এমনই সময়ে একটা চিঠি এল।

চিঠিটা লিখেছে শৈলেন। আমার কলেজের অন্তরঙ্গ বন্ধু শৈলেন দাস।

শৈলেনও আমার মতন বিশ্বাস করত, ভূত নেই। ভূতের নিবাস মানুষের অলস মস্তিষ্কের এক কোণে।

চিঠিটা খুব ছোটো। মাত্র লাইন দুয়েকের।

যদি ভূত দেখতে চাও, অবিলম্বে ঘাটশিলায় আমার কাছে চলে এসো।—শৈলেন।

শৈলেনের সঙ্গে কলেজ ছাড়ার পর আর বিশেষ দেখা হয়নি।

অন্য বন্ধুদের কাছে শুনেছিলাম, সে আলমকী আর হরতুকির ব্যাবসা করে। ঝাড়গ্রাম না ঘাটশিলা কোথায় রয়েছে।

চিঠি পেয়ে বুঝলাম, শৈলেন ঘাটশিলায় রয়েছে।

হয়তো ভূতটুত সব বাজে কথা, আমাকে তার কাছে নিয়ে যাবার জন্য ভূতের অবতারণা করেছে। জানে, এমন করে লিখলে আমি না-গিয়ে পারব না।

কলেজে অধ্যাপনার কাজ। বছরের মধ্যে ছুটিই বেশি। পূজা পার্বণ, গরমের ছুটি তো আছেই, এ ছাড়া অন্যান্য উপলক্ষ্যে কলেজ প্রায়ই বন্ধ থাকে।

ঠিক করলাম, দিন সাতেকের ছুটি নিয়ে ঘাটশিলায় চলে যাব।

পূজা কেটে গেছে। বাতাসে শীতের মিশেল। এ সময়ে ঘাটশিলার জলবাতাস ভালো। কড়া শীত পড়েনি। ভূতের সন্ধান না পাই, স্বাস্থ্যটা ফিরিয়ে আনতে পারব।

যে-কথা সেই কাজ। সুটকেস আর বিছানা নিয়ে হাওড়া স্টেশনে গিয়ে হাজির হলাম।

ট্রেন ছাড়ার দেরি ছিল।

কামরার এক কোণে মালপত্র রেখে একটা পত্রিকা কিনে বেঞ্চের ওপর বসলাম।

একটা গল্পের লাইন দুয়েক পড়েছি, হঠাৎ পরিচিত কণ্ঠে চমকে উঠলাম।

'আরে কী খবর?'

মুখ তুলে অবাক হলাম।

সামনে দাঁড়িয়ে শৈলেন। বগলে খবরের কাগজ। হাতে রঙিন ব্যাগ।

'খবর আর কী? ভূত দেখাবার জন্য তুই-ই নেমন্তন্ন করেছিলি?'

ভূতের উল্লেখে শৈলেনের মুখটা ম্লান হয়ে গেল। দু-চোখে আতঙ্কের ছায়া।

সূচীপত্রে যান

সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

'কীরে, কথা বল?'

'কী বলব, ব্যাপারটা আমিও ঠিক বুঝতে পারছি না, তোর কথা মনে হল তাই তোকে চিঠি লিখলাম।'

'ভালোই করেছিস। ভূত যদি না পাই, তোর ঘাড়ে চেপে সাতটা দিন তো খেয়ে আসি।'

শৈলেন বলল, 'চল, এবার ট্রেন ছাড়বার সময় হয়েছে। তুই কোন কামরায় উঠেছিস?'

আঙুল দিয়ে কামরাটা দেখিয়ে দিলাম।

দু-জনে উঠে পাশাপাশি বসলাম।

ট্রেন ছাড়তে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কী ব্যাপার বল তো? তুই তো সাত জন্মে ভূত বিশ্বাস করতিস না। ঠিক আমার মতন। কী দেখলি?'

স্পষ্ট দেখলাম, শৈলেনের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠল। গালের পেশিগুলো কেঁপে উঠল থরথরিয়ে।

সে মৃদুকণ্ঠে বলল, 'হঠাৎ বাতি বন্ধ হয়ে গেল। এক তিল হাওয়া নেই, দরজা জানলাগুলো নিজেদের ইচ্ছামতো খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে। পাশের ঘরে খুটখাট শব্দ, গিয়ে দেখি কেউ কোথাও নেই।'

এক ব্যাপার। যারাই ভূতের উপদ্রবের কথা বলেছে, তারা সবাই ঠিক একই কাহিনি শুনিয়েছে। এই হঠাৎ বাতি নিভে যাওয়া, আচমকা জানলা দরজা খুলে যাওয়া।

সেসব ঘরে রাতের-পর-রাত কাটিয়েছি। কিছুই দেখতে পাইনি।

পাশের ঘরে খুটখাট শব্দ ইঁদুরের জন্য। বেড়াল আমদানি করতেই সে শব্দ থেমে গেছে। লাইনের গোলমালের জন্য বাতি হঠাৎ ফিউজ হয়ে গেছে।

তাই হাসতে হাসতে বললাম, 'এসব ব্যাপারে তুইও ভয় পেয়ে গেলি শৈলেন? এর মধ্যে ভূত এল কোথা থেকে?'

শৈলেন আমার একটা হাত চেপে ধরল।

ভয়ার্ত কণ্ঠে বলল, 'ওসব কথা থাক ভাই। অন্য কথা বল। যা দেখবার গিয়েই দেখবি।'

কাজেই অন্য কথা পাড়লাম।

শৈলেনের ব্যাবসার কথা।

'তারপর তোর ব্যাবসা কেমন চলছে বল?'

শৈলেন বলল, 'প্রথম প্রথম তো বেশ ভালোই চলছিল। আমলকী আর হরতুকি কোনোটাই কিনতে হত না। ট্রাক নিয়ে জঙ্গলে গিয়ে স্রেফ পেড়ে নেওয়া। তারপর সেই ট্রাক বড়োবাজারে নিয়ে আসা। ইদানীং মুশকিল হয়েছে।'

'কী মুশকিল?'

'যারা সব জঙ্গল ইজারা নিচ্ছে, তারা জঙ্গলে ঢুকতে দিচ্ছে না। আমলকী, হরতুকি চালান তারাই দিচ্ছে। কিনতে গেলে এমন দর হাঁকছে যে, আমার পোষায় না।'

'তাহলে কী করবি?'

'ভাবছি অন্য ব্যাবসা ধরব।'

'কী ব্যাবসা?'

'ঠিক করিনি, তুই চল, দু-জনে বসে ঠিক করা যাবে। তবে ঘাটশিলায় আর নয়!'

'কেন?'

'না ভাই ঘাটশিলায় আর থাকব না। থাকতে পারব না। অন্য কোথাও যেতে হবে।'

তারপর আর বিশেষ কথা হল না।

দু-জনে দু-খানা পত্রিকা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম।

খেয়াল হল খড়গপুর স্টেশনে আসতে।

সূচীপত্রে যান

শৈলেন বলল, 'তুই বস। আমি খাবারের চেষ্টা দেখি।'

শৈলেন নেমে যেতে কামরার চারদিকে নজর দিলাম।

ভিড়ে আমার চিরকালের ভয়। এই ভিড়ের ভয়ে বাইরে বের হওয়া প্রায় ছেড়েই দিয়েছি।

ঘাটশিলা চলেছি তাই প্রথম শ্রেণিতে।

কিন্তু প্রথম শ্রেণি একেবারে খালি নয়। চারজনের জায়গায় ছ-জন বসেছি। সকলের টিকিট আছে কিনা কে জানে! আজকাল তো টিকিট না-করাই রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বাইরে দৃষ্টি দিলাম। খড়গপুর স্টেশন বদলায়নি।

খড়গপুরে এসেছিলাম বছর পাঁচেক আগে। খড়গপুরে ঠিক নয়, খড়গপুরে নেমে দীঘা গিয়েছিলাম বাসে।

স্বাস্থ্যের কারণে নয়, ভূতের সন্ধানে।

কে একজন খবর দিয়েছিল, সমুদ্রের ধারে এক পরিত্যক্ত বাড়িতে ভূত থাকে।

সন্ধ্যার অন্ধকার নামলেই নানা রঙের আলোর রেখা বাড়ির মধ্যে নাচতে থাকে। বাইরের সমুদ্রের গর্জন সেই সময় নিস্তব্ধ হয়ে যায়।

সেইসব আলোর রেখা যার দেখবার দুর্ভাগ্য হয়, তার মাথার গোলমাল হয়।

খবর সংগ্রহ করে জেনেছিলেম, কে একটা লোক সম্পত্তির লোভে কাকে যেন গলা টিপে এই বাড়িতে দম বন্ধ করে মেরে ফেলেছে।

সেই লোকটিও আর ফিরতে পারেনি।

যতবার বেরোতে গেছে, রঙিন আলোর রেখা তার পথ আটকে ধরেছে। শুধু আলোর রেখাই নয়, সঙ্গে করুণ একটা আর্তস্বর।

লোকটির মস্তিষ্ক বিকৃত হয়েছিল। অজ্ঞান অবস্থায় অন্য লোকেরা তাকে বাইরে নিয়ে আসে। জ্ঞান হলে তার কথাবার্তা শুনে রাঁচির হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়। সেখানেই কিছুদিন পর লোকটির মৃত্যু হয়।

সন্দেহ নেই, খুব জমজমাট গল্প।

আমি গিয়ে সাতদিন ছিলাম।

রঙিন আলো দূরের কথা, কোনো আলোই দেখতে পাইনি। শুধু ভাঙা ছাদের মধ্যে দিয়ে সমুদ্রের ঝোড়ো হাওয়া হু-হু শব্দে বইত। সেই হাওয়ায় জরাজীর্ণ বাড়ির পলেস্তারা ঝুপ ঝুপ করে খসে পড়ত।

দীঘার ভূতের ব্যাপারে নিমগ্ন ছিলাম, খেয়াল হল ট্রেন নড়ে উঠতে। তাই তো, ট্রেন ছেড়ে দিল, অথচ শৈলেন কোথায়?

শৈলেন না উঠতে পারলেই মুশকিল।

এই প্রথম মনে পড়ল, শৈলেনের চিঠিতে তার বাসার কোনো ঠিকানা ছিল না। অবশ্য তাতে খুব অসুবিধা হত না।

ঘাটশিলা এমন কিছু বড়ো জায়গা নয়। সেখানে বাঙালিও কম নেই। তাদের কাছে শৈলেন দাসের আস্তানা পাওয়া দুরূহ হত না।

একটু পরেই শৈলেন এসে দাঁড়াল।

'কীরে, ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে, কোথায় ছিলি?'

'একেবারে গরম ভাজিয়ে আনতে একটু দেরি হয়ে গেল। ছুটতে ছুটতে হাতল ধরেছি। নে খা।'

শৈলেন প্রচুর গরম লুচি এনেছি। লুচি আর তরকারি।

খাওয়ার পর ভরপেটে বেশ একটু ঢুলুনি এল।

যখন চোখ খুললাম, তখন ট্রেন ঘাটশিলা স্টেশনে ঢুকছে।

বেশ লম্বা ঘুমিয়েছি। চোখ চেয়ে দেখলাম, পাশে শৈলেন নেই।

সূচীপত্রে যান

বগলে বিছানা, হাতে সুটকেস ঝুলিয়ে তৈরি হয়ে নিলাম। একটু এগোতেই দেখলাম, শৈলেন দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

স্টেশনে নামা গেল। বেশ কনকনে বাতাস বইছে। পাহাড়ি ঠান্ডা।

স্টেশনের বাইরে আসার পর শৈলেন বলল, 'তুই এখানে দাঁড়া। আমি একটা সাইকেল-রিকশা ডেকে নিয়ে আসি। এখান থেকে বেশ দূর। রঙ্কিনীদেবীর মন্দিরের কাছে আমার ডেরা।'

শৈলেন সিঁড়ি দিয়ে বাইরে নেমে গেল। আবছা অন্ধকার। তার মধ্য দিয়ে দেখলাম প্রচুর সাইকেল-রিকশা গাদাগাদি করে দাঁড়িয়ে আছে। গোটাতিনেক ট্যাক্সিও রয়েছে।

দশ মিনিট, পনেরো মিনিট, কুড়ি মিনিট কাটল।

শৈলেনের আর দেখা নেই।

আশ্চর্য, সাইকেল-রিকশা ডাকতে এত দেরি কেন হবে!

আধঘণ্টা কাটবার পর বিরক্ত হয়ে মালপত্র নিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালাম।

বাইরে তখনও গোটা-ছয়েক সাইকেল-রিকশা দাঁড়িয়ে আছে।

একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'রঙ্গিনীদেবীর মন্দির চেন?'

'হ্যাঁ, হুজুর, বৈঠিয়ে।'

সাইকেল-রিকশা চালক হাত থেকে বাক্স, বিছানা নিয়ে পাদানিতে রাখল। দরদস্তুরও করতে দিল না।

উঠে বসলাম। শৈলেনের অদ্ভুত আচরণের কোনো অর্থ খুঁজে পেলাম না। এ ধরনের রসিকতা অভদ্রজনোচিত, দেখা হলে সেটা বলে দেব।

বেশ অনেকটা পথ। ঝাঁকুনিতে কোমরে ব্যথা হয়ে গেল।

সাইকেল-রিকশাওয়ালাকে যখনই জিজ্ঞাসা করি, 'আর কতদূর রে?' সে বলে, 'আগিয়া হুজুর।'

অবশেষে মন্দির নজরে এল।

তার কাছে একতলা বাড়িও দেখতে পেলাম।

কাছে যখন আর কোনো বাড়ি নেই, তখন ওটাই শৈলেনের আস্তানা হবে।

সাইকেল-রিকশার ভাড়া মিটিয়ে বাক্স-বিছানা নিয়ে দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

হাত দিয়ে ঠেলতেই দরজা খুলে গেল। তার মানে দরজা ভেজানো ছিল।

ভিতরে জমাট অন্ধকার।

সুটকেস খুলে টর্চ বের করলাম।

আমাকে ভয় দেখাবার জন্য শৈলেনের বদমায়েসি?

আগেভাগে চলে এসে বাড়ির মধ্যে ঢুকে কোনো ফন্দি আঁটছে।

ঘরের কোণে টর্চের আলো পড়তেই চিৎকার করে উঠলাম।

মেঝের ওপর শৈলেন পড়ে রয়েছে! চিৎ হয়ে। দুটি চোখ বিস্ফারিত। মনে হয় খুব ভয় পেয়েছে। দু-কষ বেয়ে রক্তের স্রোত গড়িয়ে পড়ছে!

তার দেহে যে প্রাণ নেই— এটা বোঝবার জন্য কাছে যাবার দরকার হল না।

মনে হল কেউ গলা টিপে তাকে হত্যা করেছে।

তখনও টর্চের আলো শৈলেনের দেহের ওপর। তার শরীর ঘুরে গেল। কে যেন ঘুরিয়ে দিল দেহটাকে।

চোখ দুটো আরও বিস্ফারিত! গালের মাংসপেশিগুলো তির তির করে কাঁপছে!

আর দাঁড়িয়ে থাকার সাহস হল না। তিরবেগে রাস্তার ওপর এসে পড়লাম।

ঠিক সেইসময় রাস্তা দিয়ে একটা মোটর ছুটছিল। আর একটু হলে মোটরের তলায় পড়তাম।

চালক ক্ষিপ্রহস্তে মোটর থামিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এ কী, পাগলের মতন ছুটছেন কেন? চাপা পড়তেন যে?'

সূচীপত্রে যান

জ্ঞানশূন্য হয়ে কেন ছুটছিলাম, চালককে বললাম।

ভদ্রলোক বাঙালি। গলায় স্টেথস্কোপ দেখে মনে হল ডাক্তার।

ডাক্তার সবশুনে বলল, 'কী বলছেন আপনি? শৈলেনবাবু তো আজ দিনদশেক হল মারা গেছেন। রহস্যজনকভাবে মৃত্যু। গলা টিপে কারা মেরে রেখে গেছে।'

'চোর, ডাকাত?'

ডাক্তার মাথা নাড়ল, 'না, না, পয়সাকড়ি সব ঠিক ছিল। জিনিসপত্র একটুও এদিক-ওদিক হয়নি। বাড়িটার খুব বদনাম আছে। এর আগেও দুজন এভাবে মারা গেছেন। কিন্তু আপনি দেখলেন কী করে? পুলিশ থেকে তো দরজায় তালা দিয়ে গেছে।'

বললাম, 'কই না তো! দরজা তো খোলা।'

'চলুন তো দেখি।'

টর্চের আলো ফেলতেই চমকে উঠলাম।

দরজায় বিরাট আকারের দুটি তালা।

ডাক্তার এ নিয়ে আর কিছু জিজ্ঞাসা করল না। শুধু বলল, 'স্টেশনে যাবেন তো চলুন। আমি ওইদিকে যাব।'

রাস্তায় একটি কথাও হল না। কোনো কথা বলবার মতন মনের অবস্থা আমার ছিল না। শৈলেনের বীভৎস দু-চোখের দৃষ্টি আমাকে মূক করে ফেলেছিল।

প্ল্যাটফর্মে বেঞ্চের ওপর বসলাম। জানি, আমার কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। যে লোকটা দশদিন আগে মারা গেছে, সে হাওড়া থেকে ঘাটশিলা পর্যন্ত আমার সঙ্গে এসেছে, নিজের মৃতদেহ দেখাবার জন্য, এমন আজগুবি কথা কে বিশ্বাস করবে!

দরজায় তালা আটকানো, মৃতদেহ কবে স্থানান্তরিত হয়ে গেছে, অথচ টর্চের আলোয় শৈলেনের সেই বীভৎস রূপ কী করে দেখলাম।

ঠান্ডা কনকনে হাওয়া। কানের পাশে মৃদুকণ্ঠ, আমরা আছি, আমার আছি— অবিশ্বাস করো না।

অবিকল শৈলেনের গলা।

সূচীপত্রে যান

গোয়েন্দা ও প্রেতাত্মা

সন্ধ্যার গাঢ় অন্ধকার নেমেছে। শহর নয়, শহরতলী। উঁচু-নীচু কাঁকর বিছানো রাস্তা। দু-পাশে আকন্দ, ফণিমনসা, আর বনতুলসীর ঝোপ। এইসব গাছগাছড়ার জন্য জায়গাটা আরও অন্ধকার দেখাচ্ছে।

একটা জীর্ণ বাড়ি। বাড়ির আদি রং কী ছিল বলা মুশকিল। দু-একটা জানলা খুলে ঝুলে পড়ছে।

কোনো লোক বাস করে বলে মনে হয় না।

আশেপাশে কোনো বাড়ি নেই। বাঁজা মাঠ, মজা পুকুর, শেয়াল-কুকুরের আস্তানা।

সহসা অন্ধকার উদ্ভাসিত করে আলোর তির্যক রেখা দেখা গেল।

মোটরের হেডলাইট।

এ রাস্তায় মোটর মাঝে মাঝে যায়। গোবিন্দপুর যাবার এটাই সোজা পথ। সেখানে তামার সন্ধান পাওয়া গেছে, তাই দলে দলে ব্যবসায়ীরা ছোটে।

এ মোটরটা কিন্তু এই বাড়ির সামনেই থামল।

মোটর থেকে শার্ট-প্যান্ট পরা একটি যুবক নামল। হাতে সুটকেস। টর্চ ফেলে রাস্তা দেখে বাড়ির মধ্যে ঢুকল।

লোকটি নামার পরই মোটর চলে গেল। যেদিক থেকে এসেছিল, সেই দিকে।

নীচের ঘরে মোমবাতির আলো জ্বলে উঠল। বোঝা গেল, লোকটা নিজের ঘরেই রয়েছে।

আধঘণ্টা— তার বেশি নয়।

বিদ্যুৎবেগে একটা জিপ এসে থামল। জিপ থেকে একজন ইনস্পেকটর অফ পুলিশ নামল। পেছনে দুজন পুলিশ।

ইনস্পেকটর জিপের মধ্যে উঁকি দিয়ে কাকে লক্ষ করে বলল, 'কীহে, এই বাড়িটাই তো?'

ভেতর থেকে উত্তর এল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, হুজুর।'

'ঠিক আছে, চলো।'

সামনে-পিছনে দু-জন পুলিশ, মাঝখানে ইনস্পেকটর বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

দরজা ঠেলবার আগে ইনস্পেকটর কোমরের রিভলভার হাতে নিল।

জিপ এসে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গেই মোমবাতির আলো নিভে গিয়েছিল। সমস্ত বাড়ি জুড়ে অন্ধকারের রাজত্ব।

প্রায় মিনিট পনেরো করাঘাতের পর ভেতর থেকে আওয়াজ এল— 'কে?'

যাক হুজুরের কপট নিদ্রা ভেঙেছে।

দরজা খুলে গেল। যুবকটি দাঁড়িয়ে। হাতের বাতিদানে একটি বাতি।

বাতির কোনো দরকার ছিল না। ইনস্পেকটরের হাতের টর্চের আলোয় সবকিছু উদ্ভাসিত।

যুবকটির দুটি ভ্রূর মাঝখানে বিরক্তির খাঁজ। রুক্ষ গলায় প্রশ্ন করল, 'কাকে চাই?'

ইনস্পেকটর হাসল। 'পোশাক দেখেই তো বুঝতে পারছেন আমি পুলিশের লোক। এ বাড়ি আমরা সার্চ করব। কারণ, আমরা সন্দেহ করি নেপালের মধ্যে দিয়ে কিছু হাসিস আপনি আমদানি করেছেন এবং একটু আগে সেসব এ বাড়িতে এসে পৌঁছেছে।'

যুবকটি ঠোঁট মুচকে হাসল, 'এমন আজগুবি খবর কোথা থেকে সংগ্রহ করলেন?'

ইনস্পেকটর এ ব্যঙ্গোক্তির কোনো উত্তর দিল না। পুলিশদের দিকে ইশারা করে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ল। ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বলল, 'বাতি জ্বালান। সুইচ কোথায়?'

সূচীপত্রে যান

কথার সঙ্গে সঙ্গে টর্চের আলো এদিক-ওদিক ফেলল।

যুবকটির কণ্ঠে হাসির সুর, 'সুইচ থাকলে তো পাবেন। এ বাড়িতে আলো নেই। মোমবাতির ভরসা করে আছি।'

'সর্বনাশ, বাতিও নেই! নির্বান্ধব পুরীতে কী করে থাকেন মশাই?'

'শহরের হইচই একেবারে ভালো লাগে না। তাই মাঝে মাঝে বিশ্রাম নিতে আসি।'

'সেজন্য, না চোরাকারবারের সুবিধা বলে?'

'আপনাদের সঙ্গে তর্ক করে তো আর লাভ নেই। নিন, কী সার্চ করবার করুন। বাড়ি সার্চ করবার আগে আমাকে সার্চ করবেন না?'

ইনস্পেকটর আড়চোখে যুবকটির দিকে দেখল। ওর পরনে গেঞ্জি আর লুঙ্গি। এ পোশাকে কিছু লুকিয়ে রাখবে এ সম্ভাবনা কম। তবু ইনস্পেকটর একজন পুলিশকে বলল, 'রামবিলাস, তুমি বাবুকে পাহারা দাও। আমি ঘরগুলো খুঁজে দেখি।'

দুটি মাত্র ঘর। পেছনের বারান্দায় খাবার ব্যবস্থা। একটা ঘর একেবারে খালি। দু-একটা ভাঙা কাগজের বাক্স রয়েছে। এদিকের ঘরে তক্তপোশের ওপর বিছানা। একটা আলনা।

ইনস্পেকটর সব উলটেপালটে দেখল। এমনকী দেয়ালের গায়ে লাঠির ঠোক্কর দিয়ে দেখল, কোথাও ফাঁপা কিনা। বিছানাপত্র তছনছ করল। পেছনের বারান্দায় টেবিলের ওপর কয়েকটা পাঁউরুটি আর মাংস বাটি-চাপা দেওয়া।

যুবকটি বোধ হয় খাবার আয়োজন করছিল। পুলিশ আসতে বাধা পড়েছে।

ইনস্পেকটর যুবকটির সামনে দাঁড়াল। বলল, 'কী করা হয়?'

'চাকরি করি।'

'চাকরি তো বুঝেছি। কীসের?'

'কিউরিও বোঝেন; আমি ইন্ডিয়ান কিউরিও হাউসের প্রতিনিধি।'

'অফিসটা কোথায়?'

'সাত নম্বর ওয়েলফেয়ার স্ট্রিট।'

ইনস্পেকটর, পকেট থেকে ছোটো ডায়েরি বের করে ঠিকানাটা লিখে নিয়ে বলল, 'ওখানে আপনাকে খোঁজ করলে পাত্তা পাওয়া যাবে?'

'পাওয়া তো উচিত?'

'আপনার নাম?'

'অতনু গুপ্ত।'

'নাম কি একটাই?'

'মানে?'

'মানে, মহাপুরুষদের অনেক নাম থাকে কিনা!'

'মাফ করবেন, এখন আমি খুব ক্ষুধার্ত। আপনার রসিকতার তারিফ করতে পারছি না। আপনার কাজ হয়ে থাকলে যেতে পারেন।'

যাবার আগে ইনস্পেকটর শেষবারের মতন টর্চের আলো এদিক-সেদিক ফেলল। না, সন্দেহজনক কোথাও কিছু দেখা যাচ্ছে না।

রাস্তায় এসে ইনস্পেকটর একজন পুলিশকে বলল, 'তুলসীচরণ, তোমাকে সারারাত এখানে পাহারা দিতে হবে।'

'সারারাত!'

'হ্যাঁ। আমার মনে হচ্ছে, রাত্রে এ বাড়িতে কেউ আসবে। মালপত্তর হাতবদল করবে।'

সূচীপত্রে যান

'কেউ যদি মোটরে আসে, আমি একলা কী করতে পারি?'

ইনস্পেকটর অভয় দিল। 'তুমি একলা নও, রাত বারোটা নাগাদ জিপে করে থানার ছোটোবাবু আসবে। তার সঙ্গে পুলিশও থাকবে।'

তুলসীচরণ ঝোপের আড়ালে আত্মগোপন করল।

জিপ বেরিয়ে গেল।

পরের দিন ছোটোবাবু ইনস্পেকটরের সাথে দেখা করল।

ইনস্পেকটর প্রশ্ন করল, 'কী সেন, কী খবর?'

ছোটোবাবু মাথা নেড়ে বলল, 'না, কোনো খবর নেই। সাড়ে আটটা বাজতেই বাতি নিভে গেল। ব্যস, সব চুপচাপ। মশার কামড়ে আমাদের প্রাণ যায়। সকাল আটটা পর্যন্ত ছিলাম। মনে হল, ভদ্রলোক তখনও ঘুমোচ্ছে। বেচারামকে পাহারায় রেখে চলে এলাম।'

'বাড়ির পিছন দিকে খোঁজ নিয়েছ?'

'হ্যাঁ, নিয়েছি। সেদিকটা জঙ্গল। সেদিক দিয়ে কেউ গেছে বলে মনে হল না।'

'আশ্চর্য! অথচ যে লোকটা খবর দিয়েছে, সে মোটেই বাজে লোক নয়। এর আগে অনেক দামি খবর দিয়েছে। আর এ কেসে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমরা বাড়িতে ঢুকে পড়লাম, কিন্তু কিছুই পেলাম না।'

বেলা বাড়তে ইনস্পেকটর বেরিয়ে পড়ল।

ইন্ডিয়ান কিউরিও হাউস। ইনস্পেকটর দরজা ঠেলে ম্যানেজারের ঘরে ঢুকে গেল।

প্রৌঢ় পারসি ভদ্রলোক পুলিশের লোক দেখে একটু শঙ্কিত হয়ে পড়ল, 'কী ব্যাপার?'

'আপনাদের এখানে অতনু গুপ্ত কাজ করেন?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, গুপ্ত আমাদের সেলস রিপ্রেজেনটেটিভ। খুব কাজের ছেলে—'

'গুপ্ত থাকেন কোথায়?'

'শহরের বাইরে। মামুদপুরে। তবে গুপ্ত মাসের বেশিরভাগ দিনই বাইরে কাটায়। বিহার, ইউ পি, রাজস্থান।'

'কতদিন গুপ্ত আপনাদের এখানে কাজ করছেন?'

'প্রায় বছর চারেক।'

'তার আগে কোথায় ছিলেন?'

'তা জানি না। এত খোঁজ করছেন কেন বলুন তো?'

ইনস্পেকটর কোনো উত্তর না-দিয়ে বেরিয়ে এল। সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। হিসাব মিলছে না।

পথের মধ্যে ইনস্পেকটর নেমে পড়ল।

বরাত ভালো। বাইরের ঘরেই পারিজাত বক্সী বসেছিলেন। বিখ্যাত সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ বক্সীর ভাইপো ইনস্পেকটরকে দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন, 'স্বাগতম। কী ব্যাপার, গরিবের কুটিরে?'

'বড়ো বিপদে পড়ে এসেছি।'

'তা জানি। সুসময়ে কে আর আমার খোঁজ নেয়! বলো কী করতে পারি?'

ইনস্পেকটর চেয়ার টেনে বসল। বলল, 'ব্যাপারটা এমন কিছু জটিল নয়। খুব সোজা কেস, কিন্তু তদন্ত করতে গিয়ে কোনো কিনারা পাচ্ছি না।'

ইনস্পেকটরের কাছ থেকে পারিজাত বক্সী মনোযোগ দিয়ে সব শুনলেন। শেষে বললেন, 'যে খবর এনেছে সে খুব বিশ্বাসী?'

'আবদুল খবর এনেছে। তার খবর এপর্যন্ত ভুল হয়নি। সে বলেছে, মারিজুয়ানা আর হাসিস আমদানি করে যে দল, সে দলে অতনু গুপ্ত আছে। এবং সেদিন যে সুটকেসে ভরে মাল নিয়ে ওই পোড়ো বাড়িতে উঠেছে, এ একেবারে ধ্রুব সত্য। অথচ সার্চ করে আমরা কিছুই পাইনি।'

সূচীপত্রে যান

পারিজাত বক্সী প্রশ্ন করলেন, 'অতনুবাবুর বাড়ির সামনে কোনো পাহারা আছে?'

'হ্যাঁ, আছে। একজন কনস্টেবলকে মোতায়েন রেখেছি।'

'বাড়িটা ঠিক কোন জায়গায় আমাকে বুঝিয়ে দাও তো—'

ইনস্পেকটর নকশা এঁকে বাড়ির অবস্থান বুঝিয়ে দিল।

পারিজাত বক্সী বললেন, 'ঠিক আছে, আমি একবার সরেজমিনে দেখতে যাব।'

'আমার থাকার দরকার আছে?'

'না, না, তোমার কনস্টেবল আমাকে ঠিক চিনবে। আমি ছদ্মবেশে যাব না।'

ইনস্পেকটর নমস্কার করে বেরিয়ে গেল।

পারিজাত বক্সী কাজের ভার নিলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। অদ্ভুত বিচক্ষণ শক্তি, অনুধাবন ক্ষমতা, অপরাধতত্ত্বের সবকিছু নখদর্পণে। পুলিশকে বহুবার সাহায্য করেছেন। খোদ বড়োকর্তা থেকে সাবইনস্পেকটর পর্যন্ত কৃতজ্ঞ। মনে হয়, কালে ব্যোমকেশ বক্সীর সমকক্ষ হওয়া বিচিত্র নয়।

পরের দিন সকালে পারিজাত বক্সী মামুদপুরে গিয়ে হাজির। মোটর একটু দূরে রেখে হাঁটাতে হাঁটতে পোড়োবাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালেন। যে কনস্টেবল ডিউটিতে ছিল, সে এসে সেলাম করল। 'কী খবর, বাড়ির বাবু বের হন না?'

'হ্যাঁ সাব, বেলা সাড়ে ন-টা নাগাদ বেরিয়ে পড়েন।'

'ফেরেন কখন?'

'অনেক রাতে?'

'উনি কোথায় যান খোঁজ রাখো?'

'ছোটো দারোগাবাবু চৌরাস্তার পেট্রোলপাম্পে বসে থাকেন। বাবু ওখান থেকেই ট্যাক্সিতে ওঠেন। ছোটো দারোগাবাবু জিপে করে তাকে অনুসরণ করেন। পার্ক স্ট্রিটের "মনোলীনা" হোটেলে যান। সেখানে সাত নম্বর ঘর ওঁর নামে নেওয়া আছে। সারাদিন চুপচাপ হোটেলে নিজের রুমে বসে থাকেন। হোটেলেও আমাদের লোক পোস্টেড আছে।'

পারিজাত বক্সী কিছু বললেন না। চিন্তা করতে লাগলেন, তাহলে লোকটা কীভাবে মাল পাচার করে? কোন ছিদ্রপথে?

হোটেলের রুমটাও নিশ্চয় সার্চ করা হয়েছে।

কথাবার্তার মধ্যেই অতনু বের হয়ে এল।

পরনে শার্ট আর ফুলপ্যান্ট। নিতান্ত সাধারণ চেহারা। কোনোদিকে না-চেয়ে হন হন করে রাস্তা ধরে চলতে আরম্ভ করল।

তার আগেই পারিজাত বক্সী আর কনস্টেবল ঝোপের আড়ালে আত্মগোপন করল।

অতনু পথের বাঁকে মিলিয়ে যেতে পারিজাত বক্সী বললেন, 'তাহলে রাত পর্যন্ত লোকটার তো ফেরার সম্ভাবনা নেই। আমি একটু বাড়ির মধ্যে যাব। যদি কোনো কারণে লোকটি ফিরে আসে, আমাকে হুইসিল বাজিয়ে জানিয়ে দিয়ো।'

কনস্টেবল ঘাড় নাড়ল।

পারিজাত বক্সী দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বিস্মিত হলেন। তাঁর ধারণা ছিল, দরজায় খুব দামি তালা লাগানো থাকবে। কিন্তু না, একেবারে সাধারণ তালা।

পকেট থেকে চাবির গোছা বের করে পারিজাত বক্সী দু-মিনিটে তালা খুলে ফেললেন।

ভেতরে ঢুকে এদিক-ওদিক দেখলেন। তক্তপোশের ওপর বিছানো গোটানো। বিছানায় খুঁজলেন তন্নতন্ন করে। আলনার জামাকাপড় নেড়েচেড়ে দেখলেন। দেয়ালে একটা ফোটো টাঙানো। জাঁদরেল চেহারার এক ভদ্রলোক। পাকানো গোঁফ। মিলিটারি পোশাক। বোধ হয়, অতনু গুপ্তের পূর্বপুরুষদের কেউ হবে।

সূচীপত্রে যান

পাশের ঘর একেবারে ফাঁকা। কোনো জিনিসই নেই।

পারিজাত বক্সী কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন। অতনু গুপ্তর এ বাড়িতে থাকার রহস্য কী তাহলে? অন্য লোকের হাতে 'মাল' কীভাবে পাচার করল?

কোণের দিকে ছোটো টেবিল। তাতে দু-খানা বই।

নিতান্ত কৌতূহলের বশে পারিজাত বক্সী বইদুটো তুলে দেখলেন। একটা বই 'পরলোক রহস্য', অন্যটা 'মৃত্যুর পর'। এ ধরনের লোকদের এ জাতীয় বই আকৃষ্ট করে— এটাই আশ্চর্য! মনে হল, অতনু গুপ্ত-র পরলোকতত্ত্বের প্রতি ঝোঁক আছে।

পারিজাত বক্সী বেরিয়ে এলেন।

এমন তো নয়, অতনু গুপ্ত 'মাল' আগেই সরিয়ে ফেলে, খালি সুটকেস হাতে নিয়ে এখানে নেমেছে। স্রেফ পুলিশের চোখে ধুলো দেবার জন্য। ছোটো সুটকেসটাই বা গেল কোথায়?

মনোলীনা হোটেল।

অতনু গুপ্ত বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল, নিজের রুমের সামনে; পেছনে নারীকণ্ঠ শুনে ফিরে দেখল।

অপরূপ সুন্দরী এক তরুণী। পরনে হালকা নীল শাড়ি, সেই রঙেরই ব্লাউজ। পাখির বাসার আকারে খোঁপা।

'শুনছেন?'

'আমাকে বলছেন?'

'এখানে আর কে আছেন! আপনি তো এইমাত্র সিঁড়ি দিয়ে উঠলেন, তাই না?'

'হ্যাঁ, কেন বলুন তো?'

'আমার ঘড়িটা ব্যান্ড ছিঁড়ে পড়ে গেছে।'

'সিঁড়িতে?'

'তাই মনে হচ্ছে। কিন্তু এখন পাচ্ছি না।'

'আমি তো ঘড়ি-টড়ি দেখিনি।'

'কিছু মনে করবেন না। ঘড়িটা একজন আমাকে উপহার দিয়েছিল, তাই ঘড়িটা হারিয়ে মনটা খুব খারাপ হয়ে গেছে।'

অতনু কী ভাবল, তারপর বলল, 'চলুন, আর একবার না-হয় সিঁড়িটা খুঁজে আসি।'

দু-জনে সিঁড়ি দিয়ে নামল।

ভালো করে খুঁজল। ম্যাটিং-এর তলায়, রেলিংয়ের ফাঁকে। না, ঘড়ি কোথাও নেই। বয়, বেয়ারা থেকে শুরু করে নানা ধরনের লোক অনবরত ওঠা-নামা করছে, তাদের কেউ সরিয়ে ফেলেছে হয়তো।

তরুণীর মুখ বিষণ্ণ।

অতনু বলল, 'পাওয়া গেল না।'

তরুণী ম্লান হাসল, 'আমার অদৃষ্ট!'

চা খাবার ঘণ্টা পড়ল।

অতনু বলল, 'চলুন, চা খেয়ে আসি।'

তরুণী কিছু বলল না। অতনুকে অনুসরণ করল।

চায়ের টেবিলে দুজনে মুখোমুখি বসল।

অতনু জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কত নম্বরে থাকেন?'

'দু-নম্বর। আমি মাত্র কাল এসেছি। বাবা দিল্লি বদলি হয়ে গেলেন... আমি এখানে বি টি পড়ি। এ হোটেলের ম্যানেজারের সঙ্গে বাবার অনেক দিনের আলাপ। তাই এখানে এসে উঠেছি। আপনি?'

সূচীপত্রে যান

'আমি দিনের বেলা এ হোটেলে থাকি। এক কিউরিও প্রতিষ্ঠানের আমি প্রতিনিধি। এখান থেকে অনেক দূরে আমার বাড়ি। ক্রেতাদের পক্ষে অতদূরে যাওয়া সম্ভব নয়। তারা এই হোটেলে আমার কাছে আসে।'

তরুণী উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল, 'কিউরিও? ওসবে আমার খুব আগ্রহ? দু-একটা দেখাবেন আমাকে?'

'নিশ্চয়। চা খেয়ে নিয়ে চলুন আমার রুমে।'

অতনু তরুণীকে নিয়ে নিজের রুমে এল।

টেবিলের ওপর ছোটো দুটো প্যাকেট।

চেয়ারের ওপর তরুণী বসল।

একটা প্যাকেট খুলে অতনু দেখাল।

টেরাকোটার সাতটা ঘোড়া। একটি লোক লাগাম ধরে আছে।

অতনু বলল, 'উড়িষ্যার এক শিল্পীর তৈরি। কোনারকের অনুকরণে। সাতটি ঘোড়া সাতটি রশ্মির প্রতীক। চালক অরুণদেব। খুব পুরোনো জিনিস। মাটির তলা থেকে পাওয়া।'

তরুণী মূর্তি নিয়ে নিবিষ্ট চিত্তে পর্যবেক্ষণ করল। অনেকক্ষণ ধরে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখল।

তারপর অতনুর হাতে ফেরত দিয়ে বলল, 'চমৎকার জিনিস! এটার দাম কত?'

অতনু হাসল, 'কিউরিওর কোনো নির্দিষ্ট দাম থাকে না। ক্রেতা হিসাবে এর দাম। আমেরিকান মহিলা পাকড়াতে পারলে, হাজার টাকা দাম হতে পারে।'

'হাজার টাকা একটা মূর্তিতে! তাহলে তো আপনি বড়োলোক?'

'হাজার টাকা তো আর আমি পাই না। আমার কমিশন দশ পার্সেন্ট।'

দ্বিতীয় প্যাকেট খোলা হল। নটরাজ মূর্তি।

তরুণী বলল, 'এ মূর্তি কিন্তু সাধারণ। খুব দেখা যায়।'

অতনু মাথা নাড়ল। বলল, 'প্রথম দৃষ্টিতে এ মূর্তি সাধারণ বলে মনে হলেও, পায়ের ভঙ্গিটা দেখলে বুঝতে পারবেন, সচরাচর যে নটরাজ মূর্তি আমরা দেখতে পাই, তাতে পায়ের ভঙ্গি এরকম নয়। সেইজন্যই এ মূর্তির আলাদা একটা কদর আছে। এটি পাওয়া গেছে ম্যাঙ্গালোরের কাছে। এক চাষার লাঙলের মুখে।'

অনেকক্ষণ ধরে বিভিন্ন ধরনের মূর্তি নিয়ে দু-জনে আলোচনা হল।

তরুণী হাসল, 'মাঝে মাঝে এসে কিন্তু আপনাকে বিরক্ত করব।'

অতনু হাসল। বলল, 'বিরক্তির কী আছে! দুপুর বেলা তো আমি থাকি। যখন খুশি চলে আসবেন।'

'আপনার রুমটা বেশ ঠান্ডা। আমার রুমটার জানলা পশ্চিম দিকে বলে দুপুরের পর থেকেই গরম হয়ে ওঠে। পাখার হাওয়াও গরম। একেবারে পড়াশোনা করতে পারি না।'

'আপনি যখন প্রয়োজন মনে করবেন, এ ঘরে চলে আসবেন। আমার কাছ থেকে চাবি নিয়ে নেবেন।'

তরুণী ধন্যবাদ দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

অতনু জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার নামটা কিন্তু জানা হল না।'

'আমার নাম শিপ্রা নাগ।'

সেই শুরু। তারপর থেকে প্রতিটি দিন।

অতনু রোজই নতুন নতুন কিউরিও হোটেলে নিয়ে আসত। তারপর সাল, কুলুজি নির্ণয় চলত শিপ্রার সঙ্গে।

মাঝে মাঝে চাবি দিয়ে শিপ্রা এ রুমে চলে আসত। অতনুর অনুপস্থিতিতে। বই খাতা নিয়ে পড়াশোনায় ব্যস্ত থাকত।

একদিন অতনু বলল, 'চলুন কোথাও বেড়িয়ে আসি।'

'কোথায়?'

'কাছাকাছি কোথাও, তারপর রাত্রে কোনো হোটেলে ডিনার খেয়ে নেব।'

সূচীপত্রে যান

সলজ্জ ভঙ্গিতে শিপ্রা নিমরাজি হল।

দিন পনেরোর মধ্যে দুজনের মধ্যে মোহময় এক সম্পর্ক রচিত হল।

খুব সকালে অতনু হোটেলে চলে আসত।

বারান্দায় অতনু আর শিপ্রা পাশাপাশি বসত। চায়ের কাপ সামনে নিয়ে। দুপুরে অতনুর রুমে মজলিশ বসত দুজনের।

প্রায়ই এই হোটেলে, কিংবা বাইরে কোথাও ডিনার খাওয়া চলত।

পনেরো দিন পর মনোলীনা হোটেলের সামনে পুলিশের জিপ এসে দাঁড়াল। জিপ থেকে একজন পুলিশ ইনস্পেকটরের সঙ্গে একটি মাঝবয়সি লোক। পেছনে তিনজন পুলিশ।

দু-জন পুলিশ অতনুর রুমের সামনে দাঁড়াল।

মাঝবয়সি ভদ্রলোক আর পুলিশ ইনস্পেকটর প্রথমে দু-নম্বর ঘরে ঢুকল, তারপর বেরিয়ে অতনুর দরজায় করাঘাত করল।

অতনু দরজা খুলেই পিছিয়ে গেল। বলল, 'কী ব্যাপার?'

পুলিশ ইনস্পেকটর রুক্ষকণ্ঠে বলল, 'কী ব্যাপার, তাই জানতেই তো আপনার কাছে আসা।'

'তার মানে?'

'মানে, শিপ্রা দেবী কোথায়? মিস্টার নাগের মেয়ে?'

এবার মাঝবয়সি ভদ্রলোক বলল, 'শুনলাম, আমার মেয়ের সঙ্গে আপনার খুব হৃদ্যতা ছিল। এখানকার বন্ধুরা দিল্লিতে আমাকে লিখেছিল। এখানে-ওখানে দু-জনকে একসঙ্গে দেখা যেত।'

অতনু নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, আমার সঙ্গে আলাপ ছিল। শিপ্রা বলেছিল, আপনি এলে আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবে।'

'হুঁ, কিন্তু মেয়ে কোথায় আমার?'

'কাল দুপুরে আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। বলেছিল, সন্ধ্যা বেলা এক প্রফেসরের কাছে যাব। আমার সঙ্গে দেখা হবে না। আজ সকালে অনেকক্ষণ বারান্দায় অপেক্ষা করেছিলাম, শিপ্রা আসেনি। দু-নম্বর রুমও দেখলাম তালা বন্ধ।'

ঠিক এইসময় একজন পুলিশ ভেতরে ঢুকল, 'সাব টেলিফোন!'

পুলিশ ইনস্পেকটর দ্রুতপায়ে বেরিয়ে এল।

মিনিট দশেক পরে ইনস্পেকটর যখন আবার অতনুর রুমে ঢুকল তখন সে রীতিমতো উত্তেজিত।

মিস্টার নাগের দিকে ফিরে বলল, 'মিস্টার নাগ, বড়ো দুঃসংবাদ আছে।'

'দুঃসংবাদ?'

'হ্যাঁ, এইমাত্র লালপুর থানা থেকে খবর এল শিপ্রা নাগের মৃতদেহ পাওয়া গেছে।'

'সে কী!'

মিস্টার নাগ চেয়ারের ওপর বসে পড়ল। সারা মুখে রক্ত নেই। দুটি চোখ জলে ভেজা।

'চলুন আমরা এখনই বেরিয়ে পড়ি।'

তারপর ইনস্পেকটর অতনুর দিকে রোষকষায়িত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, 'মিস্টার গুপ্ত, আপনাকে গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হলাম। যতক্ষণ না নিজের গতিবিধি সম্বন্ধে সন্তোসজনক উত্তর দিতে পারবেন, ততক্ষণ আপনার মুক্তি নেই।'

দু-জন পুলিশ অতনুর পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

সবাই জিপে উঠল।

শহরের বাইরে লালপুর থানা। সেখানে ইনস্পেকটর কিছুক্ষণের জন্য নেমে গেল, তারপর এক পুলিশ সঙ্গে করে আবার উঠে গেল।

সূচীপত্রে যান

পচা ডোবার পাশে জরাজীর্ণ একতলা বাড়ি।

সকলে নেমে গেল।

ইনস্পেকটর জানলার ভাঙা খড়খড়ি দিয়ে দেখে নিয়ে বলল, 'আমাদের ভেতরে যাওয়া উচিত হবে না। ফোরেনসিক ডিপার্টমেন্টের লোক আসবে। তা ছাড়া ধুলোতে পায়ের দাগ থাকাও বিচিত্র নয়। সেগুলো মুছে যেতে পারে।'

সবাই খড়খড়ি দিয়ে দেখল। অতনুও।

একটা কড়িকাঠে দড়ি বাঁধা। শিপ্রা ঝুলছে। জিভ অনেকটা বেরিয়ে পড়েছে। দুটি চোখ বিস্ফারিত। ঠোঁটের দু-পাশে রক্তের দাগ।

অতনুও চিৎকার করে উঠল— 'শিপ্রা!'

ইনস্পেকটর তীব্রকণ্ঠে বলল, 'খুব চমৎকার অভিনয় করতে পারেন তো? কিন্তু ওসব অভিনয়ে পুলিশের লোক ভোলে না। কাল হোটেল থেকে আপনারা দু-জন বেরিয়েছেন, সে প্রমাণ আমাদের আছে। সন্ধান করে ট্যাক্সিওয়ালাকেও ধরেছি, সে স্বীকার করেছে আপনাদের লালপুর নিয়ে এসেছিল।... মিস্টার নাগ, আপনার মেয়ের গায়ে গহনা ছিল না?'

'হ্যাঁ, জড়োয়ার হার, চুড়ি ছিল।'

'এটা আত্মহত্যা নয়, হত্যা। পোস্ট-মর্টেম রিপোর্টে সঠিক খবরই পাওয়া যাবে। নিশ্চয় লক্ষ করেছেন, আপনার মেয়ের গায়ে কোনো গহনা নেই। খুনের মোটিভ বোঝা গেল।'

এবার অতনু রেগে উঠল। 'আপনারা মগের মুলুক পেয়েছেন নাকি? যা-খুশি তাই করবেন!'

ইনস্পেকটরও গলার স্বর গম্ভীর করল, 'আপনার যা বক্তব্য কোর্টে বলবেন।'

'আমার উকিলের সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই।'

'বেশ, থানায় গিয়ে উকিলকে ফোন করবেন।'

অতনুকে থানায় নিয়ে আসা হল। সেখান থেকে অতনু উকিল ভবতোষ মজুমদারকে ফোন করল। উকিল নেই। খবর দেওয়া হল, এলেই যেন থানায় অতনুর সঙ্গে যোগাযোগ করে।

বিকালে পোস্ট-মর্টেম রিপোর্ট এল। আত্মহত্যা নয়, হত্যা। কেউ গলা টিপে শিপ্রাকে মেরে ফেলেছে, তারপর তার গলায় মোম-মাখানো দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে দিয়েছে।

ফোরেনসিক ডিপার্টমেন্ট হাতের ছাপ তুলে নিয়েছে। পরের দিন সকালে তারা অতনুর হাতের ছাপ নিয়ে গিয়ে মেলাবে। সেইসময় অতনু জুতোর ছাপও নেবে।

ইতিমধ্যে ভবতোষ মজুমদার এসে দেখা করল। অনেকক্ষণ অতনুর সঙ্গে কথা হল। সঙ্গোপনে।

তারপর উকিল বলল, 'কত টাকার জামিন হলে ছাড়তে পারেন?'

ওসি মাথা নাড়ল, 'তিন-শো দু-ধারার কেস নন-বেইলেবল। জামিন চলে না।'

'আপনারা তো শুধু সন্দেহ করছেন।'

'খুনের কেসে প্রত্যক্ষ সাক্ষী খুব কমই থাকে। পরোক্ষ সাক্ষী অনেক আছে। তা ছাড়া ফোরেনসিক ডিপার্টমেন্টের রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত ছাড়বার প্রশ্নই ওঠে না।'

'আমি তাহলে কোর্টে দরখাস্ত করব।'

'স্বচ্ছন্দে।'

ভবতোষ মজুমদার বেরিয়ে গেল।

থানার পেছনে অন্ধকার এক ঘরে অতনুকে রাখা হল। খড়ের বিছানা। এককোণে জলের কুঁজো।

খাওয়া হয়ে যেতে অতনু দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসল। দূরে পেটানো ঘড়িতে বারোটা বাজার শব্দ। অতনুর চোখে ঘুম নেই। এ কী বিপদে সে পড়ল।

সূচীপত্রে যান

মনে হচ্ছে তাকে ঘিরে বিরাট একটা ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তৃত করা হয়েছে। এর থেকে উদ্ধার পাওয়া মুশকিল।

হঠাৎ খুট করে একটা শব্দ।

অতনু চমকে মুখ ফেরাল, তারপরই মেরুদণ্ডে শীতল একটা শিহরণ অনুভব করল। কোণের দিকে দরজার কাছে শিপ্রা নাগ দাঁড়িয়ে!

'একী, তুমি বেঁচে আছ?'

শিপ্রা মাথা নেড়ে বলল, 'না, আমি বেঁচে নেই। আমার এক পুরোনো প্রেমিক ঈর্ষার বশে আমাকে হত্যা করেছে।'

'কিন্তু আমি যে জড়িয়ে পড়েছি।'

'জড়িয়ে পড়েছ কারণ তুমি মিথ্যেবাদী।'

'মিথ্যাবাদী!'

'নিশ্চয়। তুমি নেশার জিনিসের চোরাকারবারী, সে কথা আমার কাছে লুকিয়েছ।'

অতনু ভ্রূ কুঞ্চিত করল। 'বাজে কথা।'

'বাজে কথা! আমি এখন যে-লোকে রয়েছি, সেখানে আমাদের অগোচর কিছু নেই— থাকতে পারে না। আমি জানি, তুমি মারিজুয়ানা, হাসিস আর কোকেনের এক বিরাট আন্তর্জাতিক চোরাকারবারী দলের জড়িত। ঠিক কিনা বলো?'

অতনু কোনো কথা বলল না।

বার বার শিপ্রা একই প্রশ্ন করল; কিন্তু অতনুর কাছ থেকে কোনো উত্তর পেল না।

পর পর তিন দিন একই ব্যাপার।

ক-দিনেই অতনুর চেহারা অর্ধেক হয়ে গেল। চোখের কোলে কালি, নীরক্ত ঠোঁট।

এরপর ফোরেনসিক ডিপার্টমেন্টের রিপোর্টও এসে গেল।

শিপ্রার গলায় অতনুর হাতের ছাপ। ঘরের মেঝেয় জুতোর ছাপের সঙ্গে অতনুর ছাপের কোনো তফাত নেই।

রিপোর্ট অতনুকে শোনানো হল।

বিস্ফারিত চোখে, বিবর্ণ মুখে অতনু সব শুনল। সে রাত্রে সে আহার স্পর্শ করল না।

মাঝরাতে শিপ্রা এসে দাঁড়াল। গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'তোমাকে ফাঁসির দড়ি থেকে বাঁচানো আর সম্ভব নয়।'

'সম্ভব নয়?'

'কী করে সম্ভব হবে? আমি যা প্রশ্ন করেছিলাম, তুমি তার উত্তর দিলে না—'

'কিন্তু একটার সঙ্গে আরেকটার সম্পর্ক কী? তুমি তো ভালোই জানো, আমি তোমার হত্যাকারী নই। তবে আমাকে বাঁচাবে না কেন?'

'বাঁচাব না, কারণ তুমি আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছ।'

'এখন যদি আমি স্বীকার করি, তাহলে?'

'তাহলে হত্যার অপরাধ থেকে তোমাকে আমি বাঁচাব।'

'আর হাসিস নিয়ে কারবারের ব্যাপারে?'

'তুমি হাসিস নিয়ে কোথায় লুকিয়ে রেখেছ বলো, সেখান থেকে হাসিস আমি সরিয়ে ফেলব। কেউ তোমায় ধরতে পারবে না।'

'কিন্তু তুমি যদি সবই জানো, তাহলে কোথায় হাসিস লুকিয়ে রেখেছি, তা তো তোমার অজানা থাকার কথা নয়—'

সূচীপত্রে যান

শিপ্রা একটু দম নিল, তারপর বলল, 'কিছুটা বায়ুমণ্ডল পর্যন্ত আমি জানি। মামুদপুর আমার এলাকা নয়, তাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি।'

'তুমি ঠিক আমাকে বাঁচাবে?

'আমরা মিথ্যা বলি না।' শিপ্রার কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ন।

'মামুদপুরে যে ফোটো টাঙানো আছে, তার পেছনে হাসিস আছে।'

'সুটকেস— সুটকেস কোথায়?'

'ও সুটকেস খোলা যায়। খুললে চাদরের মতন হয়ে যায়। প্রথম দিন আমি লুঙ্গির মধ্যে পরেছিলাম, ইনস্পেকটর টের পায়নি। কারণ আমার বর্ডি সার্চ করেনি। তারপর একসময় কোর্টের মধ্যে করে মনোলীনা হোটেলে এনে রেখেছিলাম। পুলিশ আমার পেছনে লেগেছে বলে এতদিন হাসিস আমি পাচার করতে পারিনি। না-হলে মূর্তির মধ্যে করে খদ্দেরের হাতে চলে যেত।'

শিপ্রা হাসল। বলল, 'অশেষ ধন্যবাদ।'

পারিজাত বক্সির বাইরের ঘরে ইনস্পেকটর রায় বসেছিল। এদিকের সোফায় শিপ্রা নাগ।

পারিজাত বক্সী হাসলেন।

'স্বীকার করি পদ্ধতিটা কিঞ্চিৎ গ্রাম্য হয়ে গেল। বিশেষ করে এই ফোরেনসিক যুগে। অতনুর ঘরে পরলোকতত্ত্ব সম্বন্ধে দু-খানা বই দেখে মতলবটা আমার মাথায় এসেছিল। শিপ্রা আমার শালি। ওর আসল নাম বিজয়া। শখের অভিনয়ে খুব নাম করেছে। ওকে কাজে লাগালাম। অতনুকে কাবু করতে ওর বিশেষ দেরি হল না। চোরাকারবারীই হোক, আর খুনিই হোক, এক জায়গায় সবাই দুর্বল। তারপর শিপ্রা ওকে প্রায়ই বলতো, আমাদের মধ্যে যে আগে মারা যাবে, সে আরেকজনকে দেখা দেবে।

পরের ব্যাপারটা খুব শক্ত নয়।

কৃষ্ণনগরের হেমন্ত পালকে দিয়ে শিপ্রার মূর্তি তৈরি হল। দেখেছ তো কী অদ্ভুত জীবন্ত মূর্তি! রক্তের দাগ, মুখের চেহারা সব কী অস্বাভাবিক। আলো-ছায়ার রহস্যের মধ্যে সে মূর্তি দেখে আমারই ভ্রম হচ্ছিল।

তা ছাড়া, পোস্ট-মর্টেম আর ফোরেনসিক রিপোর্ট সব জাল। কিন্তু তাতে খুব কাজ হল। অতনু গুপ্ত একেবারে ভেঙে পড়ল। আমার নিজেরও ধারণা হয়েছিল যে কিউরিও মারফত চোরাই জিনিস এদিক-ওদিক চালান দেওয়া হয়। তাই শিপ্রা ভাব করে অতনুর কাছ থেকে রুমের চাবি জোগাড় করেছিল।

অতনুর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে সবকিছুতে তল্লাসি করেছে। মূর্তিগুলোও, কিন্তু কিছু পায়নি।

তারপর শিপ্রার প্রেতাত্মার আবির্ভাব। কয়েক দিন সুবিধা হল না, তারপর অতনু ভেঙে পড়ল। তার স্বীকারোক্তি সবই টেপরেকর্ডে ধরা হয়েছে। কাজেই সেদিক দিয়ে কোনো অসুবিধা হবে না।

ইনস্পেকটর রায় জিজ্ঞাসা করল, 'হাসিস?'

'মামুদপুরে অতনুর ঘরে মিলিটারি পোশাকে যে ফোটোটা ছিল, সেটা আমরা ভেবেছিলাম অতনুর পূর্বপুরুষের ছবি, তার মধ্যেই সব পাওয়া গেছে। ছবিটা ফাঁপা। ছবিটা পোশাকের মধ্যে বেশ ফাঁক, সেখানে হাসিস সাজানো। পিচবোর্ড ভাঙতেই সব পরিষ্কার হয়ে গেল।'

পারিজাত বক্সী দাঁড়িয়ে উঠলেন। হেসে বললেন, 'এবার আমার কাজ শেষ। তোমাদের কাজের শুরু। দেখ, যদি জেরার মুখে অতনু অন্যান্য সঙ্গীদের নাম করে। তবে সে সম্ভাবনা কম।'

সূচীপত্রে যান

কুপার সাহেবের বাংলো

কাজ শেষ হতেই স্টেশনের দিকে রওনা হলাম। নামেই স্টেশন। টিনের ছোটো একটা চালা। সেখানে টিকিট বিক্রির বন্দোবস্ত। সাড়ে দশ হাত প্ল্যাটফর্ম। দুটি টিমটিমে তেলের বাতি।

স্টেশনে যখন গিয়ে পৌঁছোলাম, তখন সাড়ে সাতটা। কেউ কোথাও নেই। টিকিট ঘর বন্ধ। প্ল্যাটফর্মের ওপর কে একজন ঘুমোচ্ছিল। আমার আওয়াজে উঠে বসল।

তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ট্রেন ক-টায় রে? জামশেদপুরে ফিরব।'

লোকটা আদিবাসী। দু-হাতে চোখ মুছে বিস্মিত দৃষ্টি মেলে কিছুক্ষণ আমাকে দেখল; তারপর বলল, 'সাড়ে ছ-টায় শেষ ট্রেন চলে গিয়েছে বাবু। আবার ট্রেন কাল বেলা দশটায়।'

'সর্বনাশ! তাহলে রাত কাটাব কোথায়? শীতকাল। এক-একবার হাওয়া দিচ্ছে, মনে হচ্ছে যেন গায়ে হাজার ছুঁচ ফুটছে!'

স্টেশনে কোথায় শোব, তার উপায় নেই।

তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলাম। সাইকেল-রিকশার চিহ্নও নেই। লোকটা বোধ হয় আমাকে নামিয়ে দিয়েই চলে গেছে।

আবার প্ল্যাটফর্ম ফিরে এলাম। আদিবাসীর সামনে।

'হ্যাঁরে, এখানে কোথাও হোটেল আছে?'

'হোটেল!!'

লোকটা এমনভাবে চেয়ে রইল, হোটেল শব্দটা যেন সে জীবনে এই প্রথম শুনছে।

বুঝিয়ে দেবার ভঙ্গিতে বললাম, 'সরাইখানা, যেখানে রাতটা কাটাতে পারি?'

'না বাবু।'

কথা শেষ করেই লোকটা গায়ে কাপড় টেনে শুয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে নাসিকা-ধ্বনি। এরপর ধাক্কা দিলেও উঠবে এমন মনে হল না।

সঙ্গে বিছানাপত্র বা বাক্স-প্যাঁটরা কিছুই ছিল না। থাকবার কথাও নয়। শহরের অফিস থেকে এখানে একটা জরুরি চিঠি বহন করে এনেছিলাম। বনবিভাগের ছোট্ট একটা অফিস আছে। সেখানে একটা টেন্ডার পৌঁছে দেওয়া।

আসবার সময় বাসে এসেছিলাম। যাবার সময় শুনলাম বাস বন্ধ। পথের মাঝখানে একটা বাস বুঝি মানুষ চাপা দিয়েছে। ব্যস, তাই নিয়ে হইহই কাণ্ড। ইঁট মেরে গোটা কয়েক বাস অচল করার পর, বাস আর যাচ্ছে না। অপেক্ষা করে করে ক্লান্ত হয়ে একটা সাইকেল-রিকশা ধরে স্টেশনে এসেছিলাম।

ট্রেনেরও এই ব্যাপার।

এই ঠান্ডায় এভাবে খোলা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে থাকলে জমে যাবার আশঙ্কা। যেভাবেই হোক আশ্রয় একটা খুঁজতেই হবে।

আলোয়ানটা কোটের ওপর ভালো করে জড়িয়ে হাঁটতে আরম্ভ করলাম।

দু-পাশে ঘন জঙ্গল। বন্য জন্তু আছে কিনা ঈশ্বর জানেন। উপস্থিত জোনাকির ঝাঁক দেখা যাচ্ছে।

সমস্ত শরীর ঠকঠক করে কাঁপছে। বার বার হাঁটুতে হাঁটুতে ঠোকাঠুকি হয়ে যাচ্ছে। বুকের মধ্যে এমন শব্দ হচ্ছে, যেকোনো মুহূর্তে হৃদস্পন্দন থেমে যেতে পারে।

সূচীপত্রে যান

অনেকটা চলার পর জঙ্গলের এলাকা পার হলাম। লোকালয়ের চিহ্ন নেই। কুলিদের দু-একটা ঝুপড়ি। সেখানে আশ্রয় চাওয়া অর্থহীন।

অন্ধকার রাত। আকাশে চাঁদ নেই। একটা নক্ষত্রও নয়। ভাবলাম, বনবিভাগের অফিসেই চলে যাই। প্রহরীকে ডেকে তুলে তার ডেরায় রাত কাটাবার ব্যবস্থা করি।

আন্দাজে রাস্তা ধরে অনেকটা চললাম। তেপান্তরের মাঠ। মাঝে মাঝে আগাছার ঝোপ। আসবার সময় এ মাঠ দেখেছিলাম বলে মনে পড়ল না। তার মানে রাস্তা ভুল করেছি।

শুধু কি কনকনে শীত! সকালে পেটে শুধু চা-রুটি পড়েছিল, ব্যস! তারপর থেকে পেট খালি। ভেবেছিলাম, বাস যখন মাঝে মাঝে থামে, তখন রাস্তার পাশের দোকান থেকে কিছু কিনে নেব।

হাতঘড়ি দেখে বুঝলাম, প্রায় আড়াই ঘণ্টা ধরে ঘুরপাক খাচ্ছি। গাছ দেখে মনে হচ্ছে একই জায়গায় ঘুরছি।

এভাবে সারারাত ঘুরলে তো মারা পড়ব!

এবার রাস্তা ছেড়ে মরিয়া হয়ে মাঠের মধ্যে দিয়ে কোণাকুণি হাঁটতে শুরু করলাম। উঁচু-নীচু জমি। বার বার ঠোক্কর লাগল। কাঁটাগাছে পায়ের ছাল রক্তাক্ত হল।

হঠাৎ সামনের দিকে চেয়ে চমকে উঠলাম। অন্ধকারেও দেখা যাচ্ছে, সাদা একতলা বাড়ি। টালির ছাদ।

ক্লান্ত দুটি পা টেনে নিয়ে কোনোরকমে বাড়ির দরজায় গিয়ে উপস্থিত হলাম।

মনে মনে ঠিক করলাম, যারই বাড়ি হোক, হাতে-পায়ে ধরে আশ্রয় ভিক্ষা করব। বিছানার দরকার নেই, মেঝের ওপর শুয়ে থাকব। তবু তো মাথার ওপর একটা আচ্ছাদন থাকবে।

দরজা ঠেলবার আগেই দরজা খুলে গেল। পাদরির পোশাক পরা দীর্ঘ চেহারার একটি লোক হাতে হ্যারিকেন নিয়ে এসে দাঁড়াল।

'কে?'

'আমি আশ্রয়প্রার্থী। শীতে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, দয়া করে যদি একটু আশ্রয় দেন আজ রাতটুকুর জন্য—'

'আসুন, আসুন।'

পাদরি একপাশে সরে দাঁড়াল।

আমি তার গা ঘেঁষে ছুটে ভেতরে গিয়ে দাঁড়ালাম। সামনেই আগুন জ্বলছে। ফায়ারপ্লেসে অনেক কাঠ জড়ো করা। আমি আগুনের সামনে বসে হাত-পা সেঁকতে লাগলাম। আঃ, কী আরাম! ঈশ্বর করুণাময়। প্রাণটা বাঁচল।

পাদরি দরজা বন্ধ করে পেছনে এসে দাঁড়াল। 'এখানে কোথায় এসেছিলেন?'

'বনবিভাগের অফিসে।'

'বনবিভাগের অফিস? সে তো এখান থেকে মাইল দশেকের কম নয়!'

আমার দুর্ভোগের কাহিনি বললাম।

পাদরি সমবেদনাসূচক শব্দ করে বলল, 'পুয়োর বয়! অনেক কষ্ট পেয়েছেন। বুঝতে পারছি আপনি খুব ক্ষুধার্ত, কিন্তু আমার ভাঁড়ার একেবারে খালি। আমি আটটায় খেয়ে নিয়েছি। বোধ হয় একটা ডিম পড়ে আছে। সেটাই আপনাকে দিতে পারি।'

ছোটো একটা ডিম। ওমলেট করে পাদরি নিজে আমার মুখের সামনে ধরল। খুব ক্ষুধার্ত কুকুরের সামনে রুটির টুকরো ফেলে দিলে যেমন হয়, তেমনি ভাবে আমি ওমলেটের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। কয়েকটা মুহূর্ত, তারপরই প্লেট পরিষ্কার।

ধবধবে কোমল বিছানা। গরম কম্বল।

সূচীপত্রে যান

পাদরি দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেল। 'আর দেরি করবেন না। আপনি ভীষণ পরিশ্রান্ত। শুয়ে পড়ুন। আশা করি, কাল বাস চালু হয়ে যাবে।'

খুব সাবধানে দরজা ভেজিয়ে পাদরি বেরিয়ে গেল।

কম্বলটা গায়ে জড়িয়ে বিছানায় শরীর ঠেকাবার সঙ্গে সঙ্গে গভীর নিদ্রায় মগ্ন হয়ে গেলাম।

রাত কত জানবার উপায় নেই। হাতঘড়িটা খুলে জানলার তাকে রেখে দিয়েছিলাম।

হঠাৎ চোখে উজ্জ্বল আলো লাগাতে চমকে চোখ খুললাম। ভোর হয়ে গেল বোধ হয়। কাচের জানলা দিয়ে সূর্যের আলো এসে পড়ছে। ঘুমের ঘোর কাটতে একটু সময় নিল।

চোখ চেয়ে যা দেখলাম, তাতে আমার সারা শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। খাড়া হয়ে উঠল চুল। উজ্জ্বল হ্যারিকেন হাতে একটা মুখ আমার ওপর ঝুঁকে পড়েছে! মুখ বললাম বটে, কিন্তু মুখ নয়, একটা মড়ার মাথা! চোখের জায়গায় বিরাট গর্ত। দাঁতগুলো বেরিয়ে আছে!

'এ যে জ্যান্ত মানুষ গো! কতদিন পরে জ্যান্ত মানুষ দেখলাম। তাও আবার পুরুষমানুষ।'

পুরুষ মানুষ কথাটা উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, চোখের গর্ত থেকে তীব্র লাল আলো বিচ্ছুরিত হল। খটখট করে উঠল দাঁতের সার।

'এই পুরুষগুলোকে দুনিয়া থেকে মুছে ফেলতে পারতাম!'

কথাগুলো সব আমার কানে এল, কিন্তু সমস্ত ইন্দ্রিয় এত ক্লান্ত যে, সবকিছু শোনার বা বোঝার সাধ্য আমার ছিল না।

'কী হয়েছে রে? কী হয়েছে?'

আর একটা কর্কশ শব্দ কানে এল।

চোখ ফিরিয়ে দেখলাম, আলোর আওতায় আর একটা মুখ ভেসে উঠল। এও মুখ নয়, করোটি। শূন্যে শুধু মুখটা ভাসতে ভাসতে এল।

'এই দেখ, জলজ্যান্ত পুরুষ একটা এসেছে। গায়ে মাংস রয়েছে। আরাম করে আমাদের জমিতে শুতে এসেছে।'

'বলিস কী জোয়ান! স্পর্ধা তো কম নয়!'

'তোর তো মনে আছে আমার কথা?'

'ওমা, মনে আবার নেই! এই তো সেদিনের কথা। আমার চোখের সামনেই তো সবকিছু ঘটল।'

'আমি তো কোনোদিন ভুলব না। সে ঘটনা ভোলা যায় না ডরোথি।'

এটুকু বুঝতে পারলাম, দুজনেই মেয়ে। একজনের নাম জোয়ান, আর একজনের নাম ডরোথি।

উজ্জ্বল হ্যারিকেনটা দুলে দুলে উঠল। আর সঙ্গে সঙ্গে কর্কশ একটা শব্দ। ঘর-ঘর-ঘর।

বাড়ির সাদা দেয়ালগুলো সরে সরে গেল। হালকা সবুজ রং করা চারটে দেয়াল এসে আমাকে ঘিরে ফেলল। আগের দেয়াল সাদা আর একেবারে শূন্য। কিন্তু এ দেয়ালে নকশা-কাটা কাগজ আঁটা। গোটা দুয়েক ছবি টাঙানো রয়েছে। একটা ক্যালেন্ডার।

আমি অবশ হয়ে পড়ে আছি। দু-একবার ওঠবার চেষ্টা করেও পারলাম না। নিজের গায়ে চিমটে কাটলাম। বেশ লাগল।

তার মানে সজ্ঞানে রয়েছি।

তাহলে চোখের সামনে এসব কী!

ওমলেটের সঙ্গে অল্প একটু জল খেয়েছিলাম। পাদরি দিয়েছিল। সেই জলের মধ্যে কি মাদক দ্রব্য কিছু মেশানো ছিল?

যার ফলে চোখের সামনে অলৌকিক এসব দৃশ্য দেখে চলেছি।

একটু দূরে কোলাহল শোনা গেল।

সূচীপত্রে যান

পুরুষ-পুরুষ কণ্ঠ।

তারপরই দেখলাম, একটি যুবতীকে টানতে টানতে একজন যুবক প্রবেশ করল।

এদিকে লক্ষ করিনি। গোটা দুয়েক সোফা। সামনে একটা সেন্টার টেবিল। যুবতীকে এনে যুবকটি সোফার ওপর আছড়ে পড়ল।

যুবতীর সাজপোশাক দেখে লজ্জা পেলাম। পাতলা ফিনফিনে একটা স্কার্ট পরনে। ভেতরে আর কোনো আবরণ নেই। তা ছাড়া টানাটানি করে আনার জন্য স্কার্টের অনেক জায়গায় ছিঁড়ে গেছে।

যুবকটি কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াল। 'শয়তানি, এবারে তোকে হাতেনাতে ধরেছি। বল, জানলা দিয়ে যে লোকটা পালাল, সে কে?'

যুবতী মাথা নাড়ল। 'আর্থার ভুল দেখেছ তুমি। নিশ্চয় ক্লাব থেকে নেশা করে এসেছ। আমি তোমার দেরি দেখে বিছানায় শুয়ে পড়েছিলাম। জানি, তোমার কাছে ডুপ্লিকেট চাবি আছে, ঢুকতে কোনো অসুবিধে হবে না। যিশুর দিব্যি, তোমাকে আমি সত্যি কথা বলছি।'

যুবক সজোরে যুবতীকে একটা লাথি মারল। যুবতী সামলাতে না-পেরে কৌচ থেকে মেঝের ওপর গড়িয়ে পড়ল। পোশাক সরে গিয়ে ঊর্ধ্বাঙ্গ একেবারে অবারিত।

'বিচ, তোর এই পাপমুখে যিশুর পবিত্র নাম উচ্চারণ করিস না! যে লোকটা পালাল, সে কপার কারখানার ম্যানেজার হালদার, তা আমি জানি। তোদের আসনাই অনেকদিন থেকে চলছে, সে খবরও আমি রাখি, আমি শুধু ধরবার অপেক্ষায় ছিলাম।'

'তুমি মিথ্যা দোষারোপ করছ আর্থার। ডরোথিকে জিজ্ঞাসা করো, সে তোমাকে সব কথা বলবে।'

'ডরোথি!' আর্থার মাটিতে থুথু ফেলল। 'সে তো আর একটা শূকরী। তা কাজ, কলোনির মেয়েদের পুরুষ জোগানো স্বামীর অনুপস্থিতিতে, তা আমার জানতে বাকি নেই। তাকেও আমি ছাড়ব না। সে অনেক ঘরের শান্তি নষ্ট করেছে, তাঁকে দুনিয়া থেকে হটাতে হবে।'

'তুমি সব বাজে কথা বলছ। নিজের দোষ ঢাকবার জন্য এসব কথার অবতারণা করছ তুমি।'

'চোপরাও! আমি ক্লাবে জুয়া খেলি, মদ খাই, কিন্তু কোনোদিন কোনো মেয়েছেলের দিকে চোখ তুলে চেয়েছি, কেউ বলতে পারবে?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানি, পুরুষ মানুষের সাতখুন মাপ!'

'দোষ করে আবার উলটোপালটা কথা!

এবার আর্থার সজোরে যুবতীর পেটে একটা লাথি মারল।

দু-হাতে পেট টিপে ধরে যুবতী ককিয়ে উঠল, 'কী সর্বনাশ করছ তুমি? জানো না, আমার পেটে তোমার সন্তান। আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরকে তুমি মেরে ফেলবে?'

আর্থার যুবতীর চুলের মুঠি ধরে টেনে তুলতে যাচ্ছিল, কথাটা শুনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

'আমার সন্তান!'

'নিশ্চয়! তোমার ছাড়া আর কার? জোয়ান আর আর্থার পিটারের সন্তান। ছেলে হলে এর নাম রাখব ড্যানিয়েল আর মেয়ে হলে ক্যারোলিন।'

জোয়ান আর বলতে পারল না। আর্থারের উৎকট হাসির শব্দে মাঝপথে থেমে গেল।

দেয়ালে একটা কোট টাঙানো ছিল। হাসতে হাসতে আর্থার পকেট থেকে একটা খাম বের করল। তারপর সেই খাম খুলে একটা কাগজ বের করে চেঁচিয়ে উঠল, 'দেখো, ডাক্তার সেনের রিপোর্ট। আমি কোনোদিন সন্তানের জন্ম দিতে পারব না। গত যুদ্ধ আমার এই সর্বনাশ করেছে। অপারেশন করে গুলি বের করার সময়ে আমার পৌরুষত্ব হরণ করেছে। কাজেই যেটা তোর পেটে এসেছে, সেটা নেটিভ হালদারের দান। নিজের কথায় নিজে ধরা পড়েছিস। শয়তানি, আজ তোর শেষ দিন!'

সূচীপত্রে যান

আর্থার কোমর থেকে রিভলভার বের করল। রিভলভার দেখে জোয়ান মরিয়া হয়ে আর্থারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। দুজনে ধস্তাধস্তি শুরু হল।

আমি বুঝতে পারলাম, ঘামে আমার সমস্ত দেহ ভিজে গেছে। চেঁচাতে গিয়ে দেখলাম, গলা থেকে কোনো স্বর বের হচ্ছে না।

চোখের সামনে একটা নারকীয় কাণ্ড ঘটে যাবে, অথচ নিজে আমি অসহায়ের মতন তাই দেখব, ভাবতেও খারাপ লাগল। কিন্তু নিরুপায়। উঠে বসবার শক্তিও সংগ্রহ করতে পারলাম না।

'কী হচ্ছে কী আর্থার? বাড়িটা নরককুণ্ড করে তুলেছ যে!'

জানলার কাছে আর একটি তরুণী এসে দাঁড়াল।

জোয়ান মেয়েটিকে দেখে চিৎকার করে উঠল, 'ডরোথি, আমাকে বাঁচাও! পশুটা আমাকে শেষ করে দিতে চাইছে!'

মুহূর্তের জন্য জোয়ান একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। আর্থার এ সুযোগ হারাল না। রিভলভারের নল একেবারে জোয়ানের মাথায় ঠেকিয়ে ট্রিগার টিপল।

গুড়ুম! নীল আলোর শিখা। সঙ্গে সঙ্গে ঘিলুর কিছুটা ছিটকে দেয়ালে আটকে রইল। জোয়ানের শরীরটা দু-এক মুহূর্ত স্থির হয়ে রইল, তারপর টলে পড়ল মেঝের ওপর। সারা মুখ রক্তে ভেসে গেল।

'খুন— খুন, আর্থার খুন করেছে!' ডরোথি চিৎকার করে উঠল।

'তোকেও শেষ করব! সাক্ষী রাখতে নেই।'

আর্থার রিভলবার হাতে জানলা দিয়ে লাফিয়ে বাইরে পড়ল। একটু পরেই 'গুড়ুম' করে আর একটা শব্দ নারীকণ্ঠের চিৎকার।

তারপরই অখণ্ড নিস্তব্ধতা। বোঝা গেল, আর্থারের দ্বিতীয় গুলিতে ডরোথি খতম।

আবার ওঠবার চেষ্টা করলাম; পারলাম না।

ঘর-ঘর-ঘর করে শব্দ। বিরাট একটা কাঠের চাকা যেন ঘুরছে।

দেয়ালগুলো সরে সরে গেল। বুঝতে পারলাম, আবার পুরোনো দেয়াল ফিরে আসবে। পুরোনো পরিবেশ। কিন্তু না, এবার আর কোনো দেয়ালই ফিরে এল না। পরিবর্তে কনকনে ঠান্ডা হাওয়া। হাড়ের মধ্যে রক্ত জমিয়ে দেবার মতন অবস্থা।

হাত দিয়ে অনুভব করলাম। বিছানা উধাও। ভিজে ঘাসের ওপর শুয়ে আছি। শিশিরে ভেজা মাঠ। আকাশের দু-একটা নক্ষত্র। মিটমিটে দীপ্তি।

তার মানে অনাবৃত আকাশের তলায়, মাটির শয্যায় শুয়ে ছিলাম। উঠে বসলাম। সারারাত ঠান্ডায় শুয়ে হাত-পা নড়াবার সাধ্য নেই। হিমে আড়ষ্ট। অনেক কষ্টে উঠে বসলাম।

রাত প্রায় শেষ। পূর্বদিকে আলোর আঁচড়। এবার ভোর হবে।

একটু একটু করে আলো ফুটল। পরিবেশের দিকে নজর দিয়েই এবার চমকে উঠলাম। কবরখানার মধ্যে শুয়ে আছি। একেবারে দু-পাশে দুটো কবর।

ঝুঁকে পড়ে প্রস্তরফলকের লেখা পড়লাম

জোয়ান পিটার। জন্ম উনিশ-শো ছাব্বিশ। মৃত্যু উনিশ-শো পঞ্চাশ।

এপাশের প্রস্তরফলকে দেখলাম ডরোথি জোনস। জন্ম উনিশ-শো কুড়ি। মৃত্যু উনিশ-শো পঞ্চাশ।

জানি না এগিয়ে গেলে আর্থারের কবরও দেখতে পাব কি না। আগ্রহ আর সাহস কোনোটাই হল না।

বুঝতে পারলাম, মেরুদণ্ড বেয়ে ঠান্ডা একটা শিহরণ। বুকের স্পন্দন অত্যধিক দ্রুত।

যেমন করে হোক, এ পরিবেশ ছেড়ে পালাতেই হবে।

সম্ভবত কাল আশ্রয়ের আসায় মাঠে মাঠে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে কবরখানার মধ্যেই শুয়ে পড়েছিলাম। তারপর উত্তেজিত মনে বিচিত্র স্বপ্ন দেখেছি।

সূচীপত্রে যান

উঠে পড়লাম রাস্তার দিকে এগোতেই মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল।

একটা শাল গাছের নীচে পাদরি দাঁড়িয়ে।

আমাকে দেখে বলল, 'আশা করি ভালোই ঘুমিয়েছেন। এই রাস্তা ধরে সোজা চলে যান। বাসস্টপ পাবেন। প্রথম বাস এখানে ছ-টা দশে।

মাথাটা ঘুরে উঠল। পেছন দিকে ফিরে দেখলাম, ঘন কুয়াশায় কবরখানা ঢাকা পড়ে আছে। কিছু দেখা যাচ্ছে না।

পাদরিকে বললাম, 'কাল আমি তো আপনার বাড়িতেই আশ্রয় নিয়ে ছিলাম।'

পাদরি বলল, 'হ্যাঁ এখানে আমার বাড়িকে সবাই বলে কুপার সাহেবের বাংলো।'

'কিন্তু আমি কিছু বুঝতে পারছি না। রাত্রে অদ্ভুত সব স্বপ্ন দেখেছি। জোয়ান, ডরোথি আর আর্থারের। নৃশংস হত্যাকাণ্ড। জেগে উঠে দেখি, কবরখানায় শুয়ে আছি।'

'কী সব বলছেন? ওই তো আমার বাংলো।'

পেছন ফিরে দেখলাম, কিছুই দেখতে পেলাম না। সামনের দিকে চেয়ে দেখলাম, গাছতলায় পাদরি নেই। একেবারে ফাঁকা।

আবার পেছনে দেখলাম, কুয়াশা সরে গেছে। কবরখানা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। প্রস্তরফলকগুলো শানিত বর্শার মতন রোদে চকচক করছে।

সূচীপত্রে যান

জনাব মঞ্জিল

হাসপাতাল থেকে বের হয়েই মুশকিলে পড়ে গেলাম। চারিদিক ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন। এদেশের বিখ্যাত আঁধি।

হাসপাতাল থেকে স্টেশন মাইল তিনেকের কম নয়। কিন্তু এই অন্ধকারে যখন দু-হাত দূরের বস্তু দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না, তখন টাঙ্গা খুঁজে পাওয়া অসম্ভব।

হাসপাতালে আশ্রয় নেব তাও সম্ভব নয়। ছ-টায় গেট বন্ধ।

কোনোরকমে পথ হাতড়ে হাতড়ে এগোতে লাগলাম। যদি কোথাও কোনো আশ্রয় পাই।

হাতে ওষুধের নমুনা ভরতি ব্যাগ। জীবিকা মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভের। পথেই বাস। ডাক্তারখানা আর হাসপাতাল ঘুরে বেড়াতে হয়।

সোনায় সোহাগা। কনকনে বাতাস শুরু হল। মনে হল ধারে-কাছে কোথাও বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। বৃষ্টি এখানে হলেই দুর্দশার একশেষ!

বেশ কয়েক বার হোঁচট খেলাম, পাথরে ঠোক্কর, গাছের টুকরো ডাল এসে কপালে লাগল।

ঘন অন্ধকারে সাদা মতো কী-একটা বস্তু দেখা গেল।

খুব কাছে গিয়ে দেখলাম একটা গেট। প্রায় জরাজীর্ণ। পা দিয়ে অনুভব করে বুঝলাম, ছোটো ছোটো নুড়ি বিছানো।

লখনউ শহরে বহু রহিস আদমির পরিত্যক্ত আবাস আছে। যত্নের অভাবে ভগ্নপ্রায়।

পাথরের ওপর দিয়ে এগোতেই একটা বাড়ি নজরে এল।

একতলা বাড়ি, কিন্তু গড়ন দেখে মনে হয় এক সময়ে খুব মজবুত আর সুদৃশ্য ছিল। সুগোল থাম, লতাপাতার নকশা আঁকা। দরজা বন্ধ। ভারী পাল্লার দরজা।

ছুটে গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিলাম।

মাথার ওপর আচ্ছাদন চাই। প্রতিকূল আবহাওয়া থেকে নিষ্কৃতি।

দু-বার ধাক্কা দিতেই দরজা খুলে গেল।

অন্ধকারে চোখ অভ্যস্ত হয়ে যেতে দেখতে পেলাম, ছিন্ন ধুলি মলিন কার্পেট। চারদিকে কিংখাবের তাকিয়া। তাদের অবস্থাও খুবই খারাপ।

বাইরের অন্ধকার বোধ হয় কিঞ্চিৎ তরল হয়ে এসেছে, তাই অভ্যন্তরের সব কিছু একটু একটু দেখা যাচ্ছে।

খুব ক্লান্ত লাগছে। আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না। একটা তাকিয়া টেনে নিয়ে শুয়ে পড়লাম। ব্যাগটা জড়িয়ে ধরে।

বিকেলে পেটে পড়েছে শুধু চা আর শীর্ণদেহে দুটি পাউরুটির টুকরো। ভেবেছিলাম স্টেশনে গিয়ে পেট পুরে রাতের খাবার খেয়ে নেব, কিন্তু বিধি বাদ সাধলো।

এ দুর্যোগ কখন থামবে ঈশ্বর জানেন!

ঘুমিয়ে পড়ার আগে টের পেলাম ভারী পাল্লার দরজাটা এক সময়ে বন্ধ হয়ে গেছে, তাই বাইরের ঠান্ডা বাতাস আর ভিতরে আসছে না।

নূপুরের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল।

চোখ খুলে দেখলাম, ঝোলানো বাতিদানে অজস্র বাতি। দেয়ালে কম্পমান একটা ছায়া।

সূচীপত্রে যান

উঠে বসলাম। প্রথমে ভাবলাম স্বপ্ন ছাড়া আর কী!

কিন্তু না, বার বার দু-হাতে চোখ মুছেও সামনের দৃশ্য মুছতে পারলাম না।

অনিন্দসুন্দরী এক নর্তকী। বুকে কাঁচুলি। পরনে ঘাগরা। নাচের তালে জরি-বাঁধা বিনুনি দুলছে।

সারেঙ্গির আওয়াজ। তবলার বোল।

চোখ ফিরিয়ে দেখলাম সবুজ তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসে আছেন এক বৃদ্ধ। মাথার চুলে, দাড়িতে কমলা রং-এর কলপ। দৃষ্টিতে কলুষ কামনার ছাপ। পলকহীন চোখে নর্তকীর যৌবন জরিপ করছে।

বৃদ্ধের সামনে শ্বেতপাথরের রেকাবিতে স্তূপীকৃত বেলফুল।

দেয়ালে হেলান দিয়ে বসলাম।

একটু পরে নাচ থামল। সারেঙ্গি-বাদক আর তবলচি সেলাম করে বিদায় নিল।

নর্তকী এগিয়ে এসে একেবারে বৃদ্ধের কোলের কাছে বসল।

বৃদ্ধ আবেগ কম্পিত কণ্ঠে বলল, 'কুলসম—'

'হুজুর!'

'তুমি যে আমার নাচের আসরে আবার আসবে তা আমি ভাবতেও পারিনি।'

'আমি কি না-এসে পারি হুজুর!'

'দু-বার ফৈজাবাদে তোমাকে খবর পাঠিয়ে ছিলাম, তুমি ছিলে না।'

'না হুজুর, আমি মুজরোয় গোয়ালিয়র গিয়েছিলাম। ফিরে খবর পেয়েই চলে এসেছি।'

'আজ আমার ভগ্নদশা কুলসম। তোমাকে নজরানা দেবার অর্থ আমার নেই। এই ভাঙা মঞ্জিলে মৃত্যুর অপেক্ষা করছি।'

'ওভাবে কথা বলবেন না হুজুর। আপনার সঙ্গে যে আমার টাকা পয়সার সম্পর্ক নয়, তাতো আপনি ভালোই জানেন।'

'কিন্তু আমাদের মহব্বতের সম্পর্ক— এ কথা কেউ বিশ্বাস করবে?'

'কে কী বিশ্বাস করবে তা নিয়ে আমার একটুও মাথাব্যথা নেই। আমি চিরদিন আপনার বাঁদী।'

'পিয়ারি কুলসম!'

বৃদ্ধ নর্তকীকে বুকে টেনে নিতে যাবার চেষ্টা করতেই বিপর্যয়।

দুম করে একটা শব্দ। থামের আড়ালে ধোঁয়ার কুণ্ডলী। নর্তকী চিৎকার করে বৃদ্ধের পায়ের কাছে পড়ে গেল।

'একী হল? কোন দুশমন এমন কাজ করলে?'

বৃদ্ধ নীচু হয়ে কম্পমান হাতে নর্তকীর কাঁচুলি খুলে ফেলল।

দুটি স্বর্ণাভ পয়োধর। তার মাঝখানে রক্তের ধারা।

'এই কে আছিস! হাকিম সায়েবকে একবার ডাক।'

বৃদ্ধের ভীত কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে এল। কেউ সাড়া দিল না।

নর্তকী ক্রমে নির্জীব হয়ে পড়ল।

বৃদ্ধ শ্লথগতিতে বোধ হয় অন্তঃপুরের দিকে গেল। কিন্তু বেশিদূর যেতে পারল না। আবার শব্দ।

'ইয়া আল্লা' বলে চিৎকার করে মেঝের ওপর পড়ে গেল।

একটা ছায়া নিঃশব্দে সরে গেল।

আমার অবস্থা কাহিল। ক্ষুধার্ত শরীর এমনিতেই অবসন্ন ছিল, সামনে দুটি হত্যাকাণ্ড দেখে শরীরের রক্ত শীতল হয়ে গেল।

একবার ভাবলাম এইবেলা এখান থেকে পালাই। বাইরে হয়তো এতক্ষণে আঁধি পরিষ্কার হয়ে গেছে। পথ চলতে কোনো অসুবিধা হবে না। উঠতে গিয়েই থেমে গেলাম। বাইরে মোটরের শব্দ। সিঁড়িতে ভারী বুটের

সূচীপত্রে যান

আওয়াজ।

একজন ইনস্পেকটর, সঙ্গে দুজনে পুলিশ। একেবারে পিছনে কামিজ পাজামা-পরা একটি লোক, ভৃত্য শ্রেণির বলেই মনে হল।

'এই দেখুন হুজুর কুলসমের লাশ।'

কুলসম একভাবে পড়ে আছে। ঊর্ধ্বাঙ্গে কিছু নেই। দুটি স্তনের মাঝখানে শোণিতের গাঢ় কালো রেখা।

ইনস্পেকটর হাঁটু মুড়ে বসে পরীক্ষা করলে, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'জনাবের দেহ কই?'

'ওই যে হুজুর সিঁড়ির ওপর। থামের পাশে।'

ইনস্পেকটর এগিয়ে গেল।

বৃদ্ধের মৃতদেহ পরীক্ষা করল। তারপর প্রশ্ন করল, 'এ বাড়িতে কে থাকে?'

'জনাব আর আমি, হুজুর!'

'তাহলে গুলি করল কে?'

'তাতো জানি না হুজুর। আমি রসুইখানায় ছিলাম। পর পর দু-বার বন্দুকের শব্দ শুনে রসুইখানা থেকেই উঁকি দিয়ে দেখলাম এই কাণ্ড। আমি আর এদিকে আসিনি। কোতোয়ালিতে খবর দিতে ছুটেছিলাম।'

'তাহলে তো তোমাকে গ্রেপ্তার করতে হয় মনসুর।'

মনসুর ভীতি-বিহ্বল কণ্ঠে বলল, 'আমাকে? আমি বন্দুক কোথায় পাব হুজুর। তা ছাড়া জনাবকে আমি কেন গুলি করতে যাব, যদিও ওই বাইজি মেয়েটা আমার দু-চোখের বিষ।'

'তাহলে আসমান থেকে গুলি এল?'

ইনস্পেকটর এদিক-ওদিক চোখ ফেরাতেই চিন্তিত হয়ে পড়লাম। বাইরের লোক তো আমিই রয়েছি। যদিও আমার কাছে বন্দুক নেই, কিন্তু হত্যাকাণ্ডের পর কোনো আসামিই নিজের কাছে হত্যার হাতিয়ার রেখে দেয় না।

নীচু হয়ে একটা থামের আড়ালে আত্মগোপন করে রইলাম।

ভাগ্য ভালো, আমার দিকে ইনস্পেকটরের নজর পড়ল না।

'কুসলম এতদিন এই মঞ্জিলে রয়েছে?'

'আজ বিকালে এসেছে হুজুর। ফৈজাবাদ থেকে টানা মোটরে। এক রহিস আদমি নামিয়ে দিয়ে গেছে।'

'তোমার মনিবের বাইজি পোষার মতন টাকাকড়ি আছে এখনও? আমরা তো জানি কিছুই নেই। যৌবন থেকে দু-হাতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে সব নষ্ট করেছেন।'

'কিছুই নেই হুজুর। আপনারা ঠিকই জানেন। এ পয়সাকড়ির ব্যাপার নয়।'

'তবে?'

'মহব্বতের ব্যাপার।'

'মহব্বত? একটা বুড়োর সঙ্গে নও জোয়ানির মহব্বত?'

'হ্যাঁ হুজুর! আজ দশ বছর ধরে। কুলসমের বয়স যখন ষোলো তখন থেকে।'

ইনস্পেকটর হাতের ছড়িটা নিজের প্যান্টে আছড়াল।

'তাজ্জব কী বাত! ব্যাপারটা কী?'

'ব্যাপার জানি না হুজুর, শুনেছি দুর্ভিক্ষের সময় একটা গাছের নীচে জনাব কুলসমকে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন। কেউ বোধ হয় ফেলে দিয়েছিল। নিজের বাড়িতে আওরত কেউ না থাকায় কানপুরে বোনের কাছে দিয়েছিল। মানুষ করতে। তারপর জনাবের আর খেয়াল ছিল না। শিকার আর শরাবের নেশায় ডুবে ছিলেন। বেশ কয়েক বছর পর খবর পেলেন, বোনের বাড়ি থেকে কুলসম পালিয়েছে। বোধ হয় কারও হাতছানিতে।

সূচীপত্রে যান

জনাব কিন্তু কথাটা বিশ্বাস করেননি। আমাকে বলেছিলেন, সব বাজে কথা মনসুর। আমার বোনকে তো আমি চিনি। নিশ্চয় পয়সার লোভে কুলসমকে কারও কাছে বিক্রি করে দিয়েছে।

তার বছর দুয়েক পর কুলসম এসেছিল। আমি তখন জনাবের কাছে বসে তাঁর পা টিপে দিচ্ছি। বিশ্বাস করুন হুজুর, আমার মনে হল, বেহস্ত থেকে হুরি এসে দাঁড়াল। মানুষের দেহে এতরূপ হয়, হতে পারে— আমার জানা ছিল না।

জনাব প্রশ্ন করলেন, ''কে?''

''আমি কুলসম।''

''কুলসম! কুলসম কে?''

জনাব স্মৃতি হাতড়েও কিছু পেলেন না।

''চিনতে পারলেন না হুজুর, এ নাম তো আপনারই দেওয়া। এ দেহও গাছতলা থেকে আপনিই তুলে নিয়েছিলেন।''

''ও কুলসম তুমি? এতদিন পরে তুমি এলে?''

''আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে। সেদিন কেন আমায় বাঁচিয়ে ছিলেন হুজুর! যদি দেহই বাঁচিয়ে ছিলেন, তবে সে দেহ পবিত্র রাখার ভার নেননি কেন?''

''পবিত্র রাখার ভার? কিন্তু তুমি তো স্বেচ্ছায় আমার বোনের কাছ থেকে পালিয়ে গিয়েছিলে।''

''হ্যাঁ গিয়েছিলাম, কারণ এ ছাড়া আমার অন্য পথ ছিল না। আপনার বোন আমাকে দিয়ে ব্যাবসা করতে চেয়েছিলেন। তাই পালিয়ে ছিলাম। কিন্তু পালিয়েও নিজেকে বাঁচাতে পারিনি হুজুর।

মেয়েদের দেহই তাদের বড়ো শত্রু। আর একজনের হাতে পড়লাম। অনেক চেষ্টা করেও নিজেকে রক্ষা করতে পারলাম না। আজ আমি বাইজি হুজুর! নজরানা নিয়ে গান গাই, নাচি, দেহও বিক্রি করি।''

''তুমি এখানে থাক কুলসম। আমার কাছে।''

কুলসম রয়ে গেল।

আমি জনাবের কাছে অনেক দিন রয়েছি, তাঁর ধাত আমার খুব চেনা। আমি দেখতাম যখনই কুলসম কাছে এসে বসত, জনাবের চোখের কোণে রক্ত জমত। তার মানে আমি বুঝি। তার মানে দেহের তৃষ্ণা। উচ্ছল যৌবনকে ভোগ করার স্পৃহা।'

'হুঁ, তারপর?'

'সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, মেয়েটাও মজল। জনাবের দেহে যেন নতুন যৌবন ফিরে এল। ওদের ব্যাপার দেখে আমারই লজ্জা করত। কুলসম কিন্তু থাকল না। কুসলমকে তবিয়ত করার, খাওয়াবার সামর্থ্য জনাবের ছিল না।

কুলসম চলে যেত, টাকাপয়সা রোজগার করে আবার ফিরে আসত।'

'তাহলে কুলসমই তোমার জনাবকে পুষত?'

'তাই।'

'তাহলে মনে হচ্ছে কুলসমের কোনো বাবুই বোধ হয় এ কাজ করেছে। প্রতিহিংসা নিয়েছে।'

ইনস্পেকটর কিছুক্ষণ কী ভাবল, তারপর সঙ্গের পুলিশ দুজনকে বলল, 'এই লাশ উঠিয়ে নিয়ে চলো।'

তারপর মনসুরের দিকে ফিরে বলল, 'তুমি এ মঞ্জিল ছেড়ে কোথাও যাবে না। বাইরে পুলিশ মোতায়েন করে রাখলাম। পালাবার চেষ্টা করলে মুশকিলে পড়বে।'

এত দুঃখ, এত ভয়ের মধ্যেও কৌতুক অনুভব করলাম। জাঁদরেল পুলিশ কুলসমের যৌবন পুষ্পিত অনিন্দিত দেহ কাঁধে ফেলে নিল।

আর একজন পুলিশ জনাবের দেহ তুলে নিয়ে গেল।

আমি নির্জীবের মতন বসে। সব অনুভূতির ঊর্ধ্বে।

সূচীপত্রে যান

পুলিশরা বোধ হয় বাইরের দরজা খুলে রেখে গেছে। কনকনে ঠান্ডা বাতাস। ভোরের বাতাস।

ঠিক করলাম আরও পুলিশি হাঙ্গামা হবার আগেই পালিয়ে যাব।

যথেষ্ট শীতবস্ত্র সঙ্গে নেই, কিন্তু প্রাণের দাম এসব কিছুর চেয়ে বেশি। ব্যাগ হাতে উঠাতে গিয়েই থেমে গেলাম। মনে পড়ে গেল, গেটে পুলিশ মোতায়েন আছে। আমি বাইরে যাবার চেষ্টা করলেই ধরা পড়ব। খুট করে শব্দ হতেই চোখ ফেরালাম।

অদ্ভুত দৃশ্য।

মনসুর সিঁড়ির ধাপে বসেছে। হাতে একটা বন্দুক!

দুটো চোখ লাল টকটকে। গালের মাংসপেশী থরথরিয়ে কাঁপছে।

হ্যাঁ, আমি খুন করেছি বেশ করেছি। কুলসম আমাকে ভালোবাসেনি। বলেনি আমিই তার আসল লক্ষ্য, বুড়ো উপলক্ষ্য মাত্র। এখন বুঝতে পারছি, দিনের পর দিন আমার সঙ্গে ছলনার অভিনয় করেছে। সারা মঞ্জিল ঘুমিয়ে পড়লে নিঃশব্দ চরণে আমার কাছে এসেছে। প্রতি রাতে।

তারপর আসা বন্ধ করেছে।

একদিন আড়ালে যখন জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি হল, আর আসো না যে?'

কুলসম দৃষ্টিতে অবজ্ঞা আর ঔদাসীন্য ফুটিয়ে বলেছে, 'এখন আমার দর অনেক বেশি। নজরানা এক-শো আশরফি। নোকরের এ নজরানা দেবার সাধ্য নেই।'

'নোকরের নেই, মনিবের কি আছে?'

'তবে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত জনাবের কাছে কেন পড়ে থাকতে? দৈহিক সুখ, মানসিক তৃপ্তি কোনটা তুমি পেতে?'

'এ ছাড়া আমার আর কোনো পথ ছিল না।'

দুজনকেই দুনিয়া থেকে হটিয়ে দিতে বাধ্য হলাম।

আমি এবার মনস্থির করে ফেললাম।

কোনোরকমে গেটের কাছে পুলিশকে খবর দিই। বন্দুক সুদ্ধু আসামি মজুত। তা হলেই সমস্যার সামধান হবে।

উঠতে গিয়েও পারলাম না। দুটি চোখ ঘুমে বুজে আসছে। শরীরের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে অবসাদ।

আবার শুয়ে পড়লাম।

খুনি ধরার দায়িত্ব আমার নয়। আমি বিদেশি। শেষকালে কোন বিপদের জালে জড়িয়ে পড়ব।

চোখ বন্ধ করতে গিয়েই চমক উঠলাম।

আবার বাইরে অনেকগুলো বুটের আওয়াজ। প্রথমে ইনস্পেকটর, তারপর নীল সুট পরা এক ভদ্রলোক। তার হাতে চামড়ার দড়িতে বাঁধা বিরাট আয়তন একটা অ্যালসেশিয়ান। অ্যালসেশিয়ানই যেন লোকটাকে ঠেলে নিয়ে আসছে।

ইনস্পেকটর হাত দিয়ে দেখাল। যেখানে কুলসমের কয়েক ফোঁটা রক্ত পড়েছিল সেই জায়গাটা।

অ্যালসেশিয়ান রক্তের গন্ধ শুঁকেই উত্তাল হয়ে উঠল। বাঁধন ছেঁড়ার নেশায় দুর্বার। ভদ্রলোক নীচু হয়ে বাঁধন খুলে দিল।

সঙ্গে সঙ্গে অ্যালশেসিয়ান তিরবেগে ভিতরের দিকে ছুটল।

ভিতরে যেতে গিয়েও সিঁড়ির ধাপের কাছে আবার থামল। এখানেও কয়েক ফোঁটা রক্ত। সে রক্তও শুঁকল তারপর সিঁড়ি দিয়ে সজোরে লাফ দিল।

উত্তেজনায় সোজা হয়ে বসলাম। বুঝতে পারলাম এখনই অ্যালসেশিয়ান লাফ দিয়ে মনসুরের টুঁটি কামড়ে ধরে তাকে টানতে টানতে বাইরে নিয়ে আসবে।

জোড়া খুনের আসামি।

সূচীপত্রে যান

কিন্তু না, অ্যালসেশিয়ান বাইরে এসে আবার চক্রাকারে ঘুরতে লাগল। একটা থাম বেষ্টন করে।

তার মার্বেলের মতন নীল চোখ দপদপ করে জ্বলছে। জিভ ঝুলে পড়েছে। বিদ্যুতের মতন ক্ষিপ্রগতি।

অ্যালসেশিয়ানের তীক্ষ্ন দৃষ্টি আমার দিকে। ভয়ে সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল!

হঠাৎ যদি আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে? এই বিদেশে, সহায় সম্বলহীন অবস্থায় কী করব? কী করে নিজের নির্দোষিতা প্রমাণ করব?

যেকোনো খুনের একটা উদ্দেশ্য থাকে। এই বাইজি আর বৃদ্ধকে হত্যা করার পিছনে কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে?

আমি যে মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ। অফিসের কাজে লখনউ এসেছি, যেসব হাসপাতালে আর ডাক্তারদের কাছে গেছি, তারাই এর প্রমাণ দেবে।

কিন্তু এসব তো পরের কথা। উপস্থিত দুর্ভোগের হাত থেকে আমি কী করে পরিত্রাণ পাব?

বুঝতে পারলাম এই ঠান্ডা আবহাওয়াতে ঘামে আমার সর্বশরীর ভিজে গেল।

কী কুক্ষণে যে লখনউতে পা দিয়েছিলাম!

কিন্তু না, অ্যালসেশিয়ান আমার দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল। দ্রুত পায়ে থামের চারপাশে ঘুরতে লাগল, তারপর পায়ের নখ দিয়ে থামটা আঁচড়াতে আরম্ভ করল।

ইনস্পেকটরের সঙ্গে যে যে লোকটি এসেছিল, সে বলল, 'কী ব্যাপার, লুসি এমন করছে কেন?'

লোকটা এগিয়ে এসে থামটা মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করল।

ইনস্পেকটরের দিকে চেয়ে বলল, 'একটা হাতুড়ি পাওয়া যাবে?'

ইনস্পেকটর মনসুরকে বলল, 'এই একটা হাতুড়ি নিয়ে এসো তো।'

'হাতুড়ি? হাতুড়ি কোথায় পাব হুজুর?'

'কয়লা ভাঙো কী দিয়ে?'

'ইট দিয়ে। কয়লা ভাঙার রোজ দরকারই হয় না। প্রায়ই তো হোটেল থেকে খানা আসে।'

ইনস্পেকটর বলল, 'ঠিক আছে। আমি দেখছি।'

একটু পরেই ফিরে এল। এক হাতে মোটর উঁচু করার জ্যাক।

জ্যাকটা নিয়ে ভদ্রলোক আস্তে আস্তে থামের গায়ে ঠুকতে লাগল। কিছুক্ষণ ঠোকার পরই থামের গায়ে একটা ফাটল দেখা গেল। ফাটলে চাপ দিতেই ছোটো দরজার মতন সেটা খুলে এল।

ভদ্রলোক ফাটলের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে একটা বন্দুক বের করে আনল।

'এটা কার বন্দুক?'

স্পষ্ট দেখলাম মনসুরের মুখ পাংশু, নীরক্ত।

কাঁপা গলায় উত্তর দিল, 'জনাবের।'

'জনাবের বন্দুক এখানে কেন?'

'জানি না হুজুর।'

ইনস্পেকটর বন্দুক খুলে কী দেখল। তারপর বলল, 'নল দেখে বোঝা যাচ্ছে, এই বন্দুক থেকেই কিছু গুলি ছোড়া হয়েছিল। কে ছুড়তে পারে?'

মনসুর বলল, 'আমার মনে হচ্ছে হুজুর, জনাবই কুলসমকে গুলি করে তারপর নিজে আত্মহত্যা করেছেন।'

ভদ্রলোক একবার মনসুরের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে দেখল, তারপর বলল, 'নিজেকে গুলি করে তোমার জনাব আবার এই থামের ফাটলে বন্দুকটা লুকিয়ে রেখেছে? তুমি যা-ইচ্ছা তাই বোঝাচ্ছ। জনাবের মাথায় গুলি লেগেছে, তার মানে প্রায়ই সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু। বন্দুক লুকোবার তার শক্তিও ছিল না, প্রয়োজনও নয়।'

সূচীপত্রে যান

ইনস্পেকটর আর ভদ্রলোকটি যখন বন্দুক পর্যবেক্ষণে ব্যস্ত, তখন হঠাৎ অ্যালসেশিয়ানের বিকট আওয়াজ শোনা গেল।

আমি চমকে মুখ ফেরালাম।

অ্যালসেশিয়ান মনসুরের একটা হাত কামড়ে ধরল।

মনসুরের করুণ কণ্ঠ, 'বাঁচান হুজুর, বাঁচান! এ ইবলিশের বাচ্ছা আমাকে শেষ করে দিল!'

ইনস্পেকটর এগিয়ে এসে মনসুরের দু-হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিল।

বলল, 'চলো ফটকে। সেখানে তোমার যা বলবার শুনব।'

আমি স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম।

কেবল একটা কথা মনে হতে লাগল— এ রাত কী অনন্ত! কিছুতেই শেষ হবে না!

রাত শেষ হলেই রাস্তায় বেরিয়ে পড়ব।

উঁকি দিয়ে দেখলাম।

কয়েক মুঠো নক্ষত্র দেখা যাচ্ছে। শীতের কনকনে বাতাস তখনও রয়েছে। তাকিয়ার ওপর মাথা রেখে শুয়ে পড়লাম। শোবার সঙ্গেই নিদ্রা।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল।

নূপুরের শব্দ। সারেঙ্গির আওয়াজ।

দু-হাতে চোখ মুছে উঠে বসলাম।

একী সম্ভব? আমার চোখ কি আমার সঙ্গে প্রতারণা করছে?

সেই এক দৃশ্য!

অপূর্ব ছন্দে কুলসম নেচে চলেছে। সারেঙ্গির তালে তালে?

জনাব তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সজাগ করে নাচের তারিফ করছে।

এ কী করে সম্ভব! কোন দৃশ্য ঠিক? আগের না পরের?

চোখের সামনে যে নারকীয় হত্যাকাণ্ড দেখলাম, তারপরেও এ নৃত্য কী করে সম্ভব হতে পারে!

আমি কি স্বপ্ন দেখছি!

পকেট থেকে রুমাল বের করে দুটো চোখ ভালো করে মুছে নিলাম।

না, সেই একই দৃশ্য!

বেশিক্ষণ চোখ খুলে রাখতে পারলাম না। ঘুমে চোখ জড়িয়ে এল।

নূপুর আর সারেঙ্গির শব্দ ক্রমে দূরাগত মূর্ছনার মতন মনে হল।

* * *

কয়েক জন লোকের চিৎকারে ঘুম ভেঙে গেল।

সকাল হয়েছে। চড়া রোদে সবকিছু স্পষ্ট, উজ্জ্বল।

'সাহাব! সাহাব!'

চোখ খুলে দেখলাম কয়েক জন লোক আমার দিকে ঝুঁকে রয়েছে। তাদের সাজপোশাক ঝাড়ুওয়ালা বলেই মনে হল।

উঠে বসলাম।

জরাজীর্ণ বাড়ি। অনেক জায়গা ধসে পড়েছে। দেয়ালের ফাঁকে ফাঁকে বট-অশ্বত্থের চারা।

ওপর দিকে দেখলাম, অবারিত আকাশ। ফাঁক নেই।

'এখানে কী করে এলাম? তাকিয়া নেই, পুরোনো কার্পেট, কুলসম, মনসুর সব উধাও।

আমি কোথায়?'

আমার প্রশ্ন শুনে লোকগুলো পরস্পরের দিকে দেখল।

সূচীপত্রে যান

একজন বলল, 'এখানে এলেন কী করে? লখনউ-এর লোক ভুলেও এদিক মাড়ায় না।'

'কেন?'

'এ জনাব সায়েবের কোঠি।'

'জনাব সায়েব? যে জনাব সায়েবকে তার নোকর মনসুর গুলি করে মেরেছে?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেটা আপনি জানলেন কী করে?'

'কাল রাতে আমি যে দেখলাম নিজের চোখে।'

আমার কথা শুনে লোকগুলো ফিস ফিস করে নিজেদের মধ্যে কী বলাবলি করল। একটা কথা আমার কানে এল। 'বাওরা।'

বাওরা তো মানে পাগল।

এরা কি আমায় পাগল সাব্যস্ত করল।

'কেন বাওরা কেন? আমি সব দেখেছি। মনসুর জোড়া খুন করেছে। জনাব আর বাইজি কুলসমকে।'

একজন আমার খুব কাছে এসে আমাকে নিরীক্ষণ করল। বোধ হয় পরীক্ষা করল শরাবের ঘোরে আমি এসব বলছি কিনা।

তারপর বলল, 'উঠুন সাহাব। নিজের চোখে দেখুন।'

উঠলাম।

ভাঙা পাথর ডিঙিয়ে পিছন দিকে এলাম। সবুজ উঠোন। উঠোনের মাঝখানে পাশাপাশি দুটো কবর।

কবরের মাথায় উর্দুতে কী সব লেখা।

লোকটাই বলল, 'এই দেখুন এটা জনাব সায়েবের কবর। লেখা রয়েছে, জনাব গিয়াসুদ্দিন রিজভি। জন্ম আঠেরো-শো চুয়ান্ন, মৃত্যু উনিশ-শো চব্বিশ।

আর এ পাশে দেখুন, কুলসম বাইয়ের কবর। জন্ম জানা নেই, মৃত্যু উনিশ-শো চব্বিশ।

বিস্মিত হলাম, তাহলে আমি কী দেখলাম!

একজন বলল, 'খোয়াব।'

আর একজন বৃদ্ধ মৌলভি, যে ভিড় দেখে সরে এসে দাঁড়িয়েছিল, সে বলল, 'না, না, খোয়াব নয়। এরকম ব্যাপার আগেও ঘটেছে। আমরা আত্মা মানি না। কিন্তু এ ঘটনা ব্যাখ্যা করার মতো বুদ্ধিও রাখি না। সাহাব, আপনি খুব বেঁচে গেছেন।'

উত্তর দিতে গিয়ে চমকে উঠলাম।

আবার কানে নূপুরের শব্দ ভেসে এল। সারেঙ্গির সুর!

সূচীপত্রে যান

মূর্তির কবলে

একেবারে আচমকা। তাও অন্য কোনো বড়ো শহর হলে এক কথা। আপশোস করার বিশেষ কিছু থাকত না।

কিন্তু বদলি করল কলকাতা থেকে এলোর। অন্ধ্রদেশে, ইংরেজ আমলে ওই নাম ছিল, এখন স্বাধীনতা পরবর্তী যুগে নাম হয়েছে এলরু।

একটা আশার কথা বিয়ে থা করিনি। বউ-ছেলেপুলের বালাই নেই। ঝাড়া হাত-পা।

কাজেই তল্পি-তল্পা বেঁধে ট্রেনে উঠলাম।

স্টেশনে রামকৃষ্ণ রাও ছিলেন। এঁর জায়গাতেই আমি যাচ্ছি। ইনি বদলি হচ্ছেন কোয়াম্বোটুর।

এঁকে থাকবার একটা আস্তানার সন্ধান করতে বলেছিলাম। বিদেশ বিভুঁই, কিছুই জানা নেই। অন্তত মাথা গোঁজবার একটা জায়গা থাকা দরকার।

করমর্দন, পরস্পরের কুশল জিজ্ঞাসার পর প্রশ্ন করেছিলাম, 'আমার আসার কী ব্যবস্থা হবে?' রামকৃষ্ণ প্রশান্ত হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, 'চিন্তার কোনো কারণ নেই। আমি যেখানে ছিলাম সেখানেই আপনি থাকতে পারবেন। বাড়িওয়ালা খুব সদাশয়, বাড়িটাও যথেষ্ট খোলামেলা।'

যেতে যেতে রামকৃষ্ণ বললেন, 'আমি এখানে একলাই থাকতাম। বদলির চাকরির জন্য স্ত্রী, পুত্রকে মামার বাড়ি মাদ্রাজে রেখে দিয়েছি।'

তারপর হঠাৎ থেমে রামকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'আপনার নিজের রান্না করার অভ্যাস আছে?'

'বিশেষ নেই, তবে কলকাতায় ঝি না এলে মাঝে মাঝে নিজেকেই চালিয়ে নিতে হত।'

'ওই এক মুশকিল। এখানকার রান্না খেতে আপনাদের মানে বাঙালিদের হয়তো অসুবিধা হবে। সবই নারকেল তেলে রান্না কি না?'

আর কিছু বললাম না। অদৃষ্টে দুর্ভোগ আছে জানি।

বাড়িটা বেশ পছন্দসই। চারপাশে একটু বাগান আছে। নারকেল আর কিছু আম গাছ।

রান্না করার লোক একটা হয়ে গেল। শঙ্করণ। সে শুধু ভাত রেঁধে দিয়ে যাবে। মাছ, মাংস, ডিম ছোঁবে না। ওগুলো আমাকেই করে নিতে হত।

রামকৃষ্ণ যাবার সময় একটি জিনিস দিয়ে গেলেন। টেরাকোটার মূর্তি। লাল রং-এর। প্রথমে আমি ভেবেছিলাম নটরাজের মূর্তি। কিন্তু ভালো করে দেখলাম। না, নটরাজ নয়, সেই ধরনের ভঙ্গি। মুখ-চোখের চেহারা বীভৎস! চারিদিকে আগুনের লেলিহান শিখা।

রামকৃষ্ণ বললেন, 'কী মূর্তি জানি না। হরিদ্বারে এক সাধুর কাছ থেকে পেয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন কালভৈরবীর মূর্তি। রোজ শুতে যাবার আগে এ মূর্তিকে প্রণাম করে শুলে মঙ্গল হবে, অবহেলা করলে অশুভ।'

এসব ব্যাপারে আমার ভক্তি-শ্রদ্ধা একটু কম। বরং বলা যায়, আমি কিছুটা নাস্তিক। নিজের পুরস্কার ছাড়া আর কিছু মানি না।

তবু রামকৃষ্ণের মুখের ওপর আমি কিছু বলিনি। বলতে পারিনি। মূর্তিটা নিয়ে আলনার ওপর রেখে দিলাম।

এলুরুর চারিপাশে আমাদের খেত। আমার কাজ এইসব তামাক পরিদর্শন করো। একেবারে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত।

সূচীপত্রে যান

তামাকে যাতে পোকা না লাগে, লাগলে তার প্রতিষেধক কী, তারপর কীভাবে তাকে গুদামজাত করে রপ্তানির উপযোগী করা যায়, সে বিষয়ে নির্দেশ।

অনেকদিন আমাকে গ্রাম অঞ্চলেই কাটাতে হত।

তখন শঙ্করণ থাকত বাড়ির তদারকিতে। একেবারে নিস্তরঙ্গ জীবন। সংস্কৃতির ছিঁটেফোঁটা কোথাও নেই।

'কী আর করা যাবে! ক-টা লোক আর জীবন জীবিকা মেলাতে পারে।

মাস খানেক পর মুশকিলে পড়লাম। শঙ্করণ এল না।

এইসময় বর্ষার খুব প্রকোপ। চারিদিকে ম্যালেরিয়া। দিন পনেরো শয্যাপাত করে রাখে।

নিরুপায়, নিজে সেই হাত পুড়িয়ে রান্নাবান্না করতে হয়।

কাজ বিশেষ নেই। রাত আটটার মধ্যে শুয়ে পড়ি।

বাইরে বৃষ্টির নূপুর আর ব্যাঙের আলাপ জলসার আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছে। শোওয়া মাত্র— চোখে ঘুম এল।

রাত কত খেয়াল নেই। হঠাৎ ধড়মড় করে বিছানার ওপর উঠে বসলাম।

মশারিতে আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। কী আশ্চর্য, কী করে এটা হল!

বেড সুইচ নেই। ঘরের আলো বন্ধ করে আমি শুয়েছি।

কারণ আলো থাকলে আমি ঘুমোতে পারি না। ভীষণ বিপদে পড়ে গেলাম। মশারির চারিদিক জ্বলে উঠেছে। নাইলনের মশারি। নামবার কোনো পথ নেই। আগুনের তাপ আমার শরীর ঝলসে দিচ্ছে।

চেঁচাবার শক্তি পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছি। আর চেঁচিয়েও কোনো লাভ নেই। সবচেয়ে কাছে যে বাড়ি সেটাও আধ মাইল দূর।

বিদেশে এভাবে কি পুড়ে মরতে হবে! মরিয়া হয়ে নামবার চেষ্টা করলাম। এ ছাড়া উপায় নেই।

একটু এগিয়ে থেমে গেলাম।

সেই অগ্নিশিখার পিছনে বিরাট এক মূর্তি। শুধু বিরাট নয়, বিকটও। কালভৈরবীর মূর্তি। দুটি চোখে অগ্নিপিণ্ড ঠোঁটের দু-পাশে আগুনের ঝলক। ভাবলাম ভুল দেখছি। চোখদুটো ভালো করে রগড়ে নিলাম।

কিন্তু না, এক দৃশ্য।

কালভৈরবীর মূর্তি যেন জীবন্ত হয়েছে। এদিকে আগুনের উত্তাপ বাড়ছে। বিছানার ওপর বসে থাকা আর সম্ভব নয়।

লাফিয়ে মেঝের ওপর পড়লাম। সঙ্গে সঙ্গে আগুন যেন মিলিয়ে গেল। কালভৈরবীর মূর্তিও উধাও।

কিন্তু আর একটা আশ্চর্য কাণ্ড। একটা অদৃশ্য টানে কে যেন আমাকে আলনার দিকে নিয়ে গেল। আলনার কাছে গিয়েই অবাক হলাম। কালভৈরবীর মূর্তিটা নেই!

শঙ্করণ মূর্তিটা আলনার ওপর একটা তাকের মধ্যে রাখত।

মাঝে মাঝে লক্ষ করেছি, সে মূর্তির সামনে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে বিড় বিড় করে মন্ত্র পড়ছে।

আমি নিজে এসব না মানলেও, কারও ধর্মবিশ্বাসে বাধা দিতে চাইনি।

পিছন ফিরে দেখলাম, মশারির অবস্থা স্বাভাবিক। আগুনের সামান্য চিহ্নও কোথাও নেই।

নিজের ওপর রাগ হল।

নিশ্চয় বিশ্রী একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম। স্বপ্ন দেখে এতটা ভয় পাওয়া নিঃসন্দেহে ছেলেমানুষি।

কিছুক্ষণ পায়চারি করে শুতে গেলাম।

ভোরের দিকে একই কাণ্ড।

এবারে কালভৈরবীর মূর্তির দুটি নাসারন্ধ্র দিয়ে আগুনের হল্কা। মশারি পুড়ছে। আগের বারের মতন লাফ দিয়ে নীচে নামতে সব স্বাভাবিক। আর বিছানায় যাইনি। আলো ফোটা পর্যন্ত বেতের চেয়ারে চুপচাপ বসে রইলাম।

সূচীপত্রে যান

শেষ রাত্রের দিকে বৃষ্টি থেমে গিয়েছিল। আকাশ প্রায় পরিষ্কার। ছেঁড়া মেঘের ফাঁকে ফাঁকে নীল আকাশের আভাস।

শঙ্করণ এসে হাজির। জ্বর নেই, তবে চেহারা বেশ কাহিল।

একবার ভাবলাম শঙ্করণকে কিছু বলব না। আমার সম্বন্ধে তার ধারণা খারাপ হবে। ভাববে, আমি অহেতুক ভয় পেয়েছি।

কিন্তু তাকে অন্যভাবে জিজ্ঞাসা করলাম।

'আচ্ছা শঙ্করণ, সেই কালভৈরবীর মূর্তিটা কোথায় জানো?'

'কালভৈরবীর মূর্তি! কেন, তাকের ওপর নেই?'

শঙ্করণ ছুটে এল ঘরের মধ্যে।

তাক খালি। মূর্তি নেই।

লক্ষ করলাম, শঙ্করণের মুখ পাংশু, নীরক্ত হয়ে গেল।

এদিক-ওদিক খুঁজতে লাগল।

'তাইতো, কোথায় গেল? আপনি ফেলে দেননি তো?'

আমার ঈশ্বর-বিশ্বাসের ওপর শঙ্করণের মোটেই শ্রদ্ধা ছিল না। সে আমার হালচাল দেখে হয়তো কিছুটা মালুম করেছে।

আমি বললাম, 'মূর্তি সম্বন্ধে আমি কোনো খোঁজ রাখি না। তুমিই তো দেখাশোনা করতে।'

শঙ্করণের আমার কথার উত্তর দেবার অবকাশ নেই। সে তন্ন তন্ন করে মূর্তিটা খুঁজছে। আলনাটা সরিয়েই সে চেঁচিয়ে উঠল, 'এই তো এখানে পড়ে রয়েছে।'

দেখলাম দু-জোড়া জুতোর ফাঁকে মূর্তিটা পড়ে আছে।

শঙ্করণ সন্তর্পণে মূর্তিটা তুলে নিল।

রুক্ষকণ্ঠে বলল, 'এটা এখানে কে ফেলল?'

উত্তর দেওয়া প্রয়োজন মনে করলাম না। চুপ করে রইলাম।

শঙ্করণ মূর্তিটা কাপড় দিয়ে ভালো করে মুছে তাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করল। নতজানু হয়ে মূর্তির সামনে বিড় বিড় করে মন্ত্রোচ্চারণ করল।

মাস খানেক একভাবে গেল। কোনো উপদ্রব নেই।

কলকাতা থেকে একটা চিঠি এল। বন্ধু অসিতের লেখা।

অসিত শুধু আমার মামুলি বন্ধুই নয়, কলেজে আমরা অভিন্ন হৃদয় ছিলাম। অসিত বম্বেতে এক কাপড়ের কলের টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার।

সে লিখেছে, দু-মাসের ছুটিতে কলকাতা এসেছে। এসে ভালো লাগছে না, কারণ আমি কলকাতায় নেই। তার খুব ইচ্ছা আমার কাছে মাস খানেক কাটিয়ে যাবে।

প্রস্তাবটা খুব ভালো লাগল। পাণ্ডববর্জিত দেশে অসিতের মতন বন্ধু পাশে থাকলে সময়টা ভালোই কাটবে। পত্রপাঠ তাকে আসতে লিখে দিলাম। চিঠি লেখার সাতদিনের মধ্যে এসে হাজির। এলুরু স্টেশন থেকে ট্যাক্সি করে নিয়ে এলাম। বাড়ি দেখে অসিত বেজায় খুশি।

সবকিছুতেই তার দারুণ উৎসাহ। বিন্দুতে সিন্ধুর স্পর্শ পেল!

'বা এ যে একেবারে বাগানবাড়ি রে? শহর অথচ শহরের গোলমাল নেই। বেশ আছিস।'

চা খেতে খেতে হঠাৎ তার দৃষ্টি মূর্তির দিকে গেল।

জিজ্ঞাসা করল, 'ওটা কীসের মূর্তি রে?'

'কালভৈরবীর।'

'সেটা আবার কী?'

সূচীপত্রে যান

চা শেষ করে অসিত মূর্তির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। অনুসন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে দেখে বলল, 'বাড়ির মধ্যে এই কিম্ভুতকিমাকার মূর্তিটা রেখেছিস কেন? ফেলে দে!'

'শঙ্করণ ওই মূর্তিটা রোজ পূজা করে, তাই আর সরাইনি। নাহলে ও মোটেই আমার পছন্দসই নয়।'

'শঙ্করণ পছন্দ করে তো এটা সে তার বাড়িতে নিয়ে যাক, কিংবা রান্নাঘরে, তার কাজের জায়গায় রাখুক। তোকে তো নাস্তিক বলেই জানতাম, অন্তত মূর্তিপূজার বিরোধী।'

কিছু বললাম না। কীই-বা বলব। অসিত আমার মনের কথাই বলেছে।

আমার ঠিক পাশের ঘরটা তার শোবার জন্য নির্দিষ্ট হয়েছিল।

দুটো দরজার মাঝখানে একটা দরজা ছিল।

বেশ কিছুটা গল্পগুজব করার পর অসিত শুতে গিয়েছিল।

আমার ঘুম আসেনি। টেবল-ল্যাম্প জ্বেলে টোবাকো কিওরিং সম্বন্ধে একটা বই পড়লাম, তারপর শুতে গেলাম।

বোধ হয় মাঝরাত, ঠিক খেয়াল নেই। পাশের ঘরে দুপদাপ শব্দ। অনেকগুলো লোক যেন দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে।

একবার মনে হল ডাকাত পড়েছে। তারপর ভাবলাম ডাকাতদের তো এই ঘরের মধ্যে দিয়েই যেতে হবে। পাশের ঘরে ঢোকবার আলাদা কোনো রাস্তা নেই।

সারা ঘর জুড়ে তাণ্ডব নৃত্য চলেছে, অথচ অসিতের কোনো শব্দ নেই।

তবে কি তার কোনো বিপদ ঘটল।

উঠে পড়লাম।

দরজার পাশে গিয়ে দেখলাম, অসিত পাশের দরজাটা ভেজিয়ে দিয়েছে।

হাত রাখতেই দরজাটা খুলে গেল।

শব্দ চলছে, কিন্তু কাউকে দেখতে পেলাম না।

শুধু অসিতের মশারিটা প্রবল বাতাসে উড়ছে।

অথচ আজ গুমোট। বাতাস একেবারেই নেই।

'অসিত, অসিত!'

বার কয়েক চেঁচালাম। কোনো উত্তর নেই।

সূচীপত্রে যান

অমানুষিক

যাঁদের খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খবরের কাগজ পড়া অভ্যাস তাঁরা নিশ্চয় ঘটনাটা পড়েছেন। আজ থেকে প্রায় বছর দশেক আগের কথা। হত্যা কাহিনিটা ফলাও করে সংবাদপত্র ছাপিয়েছিল, কিন্তু হৈমন্তী ঘোষালের কবিত্বটার কথায় বিশেষ জোর দেয়নি।

সমস্ত ঘটনাটা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আমার জানা, কারণ সেই সময়ে হৈমন্তী ঘোষালের সহকারী হিসেবে আমি কাজ করেছিলাম।

এদেশে হৈমন্তীর আগে নারী-গোয়েন্দা কেউ ছিল বলে জানি না, পরে আর কেউ হয়েছে কি না তাও বলতে পারব না। এমএসসি পাশ করে ফোরেনসিক মেডিসিন নিয়ে পড়াশোনা করছি এক অভিজ্ঞ বিজ্ঞানের অধ্যাপকের কাছে, হৈমন্তীর হঠাৎ চোখে পড়ে গেলাম।

কী একটা ব্যাপারে হৈমন্তী অধ্যাপকের কাছে আনাগোনা করছিল, সেই সূত্রেই আলাপ হয়ে গেল। হৈমন্তী আমাকে সোজাসুজি জানাল তার সহকারী হিসাবে কাজ করার জন্য। হৈমন্তী ঘোষাল যে শখের গোয়েন্দা সে-পরিচয় তখনই পেলাম।

যাক, আসল ঘটনাটা বলি।

রায়বাহাদুর তেজেশ সরকার। অভ্র ব্যাবসার একচ্ছত্র মালিক। থাকেন গিরিডিতে। বিপত্নীক, একটি ছেলে পড়ার ব্যাপারে গ্লাসগো, একটি মেয়ে শ্বশুরবাড়ি মিরাটে।

তেজেশ সরকার থাকতেন ভৃত্যদের হেফাজতে। বিশেষ করে বৃদ্ধ রামকমলই দেখাশোনা করত। খুব পুরোনো লোক। ছেলেবেলায় তেজেশবাবুর খেলার সাথি ছিল।

এক শনিবারের ভোরে। বিছানায় শুয়ে আধ ঘুম জাগরণ অবস্থা, ফোন বেজে উঠল।

'কে নিরুপম? আমি হৈমন্তী। এখনই চলে এসো।'

'কী ব্যাপার?' বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলাম।

'আজই আমরা গিরিডি রওনা হব। তুমি তৈরি হয়ে এসো।'

তখনও সকালের কাগজটা পড়া হয়নি। তাড়াতাড়ি গোছগাছ করে রওনা হয়ে পড়লাম।

হৈমন্তীও তৈরি হয়ে বাইরের ঘরে অপেক্ষা করছিল।

আবার উৎকণ্ঠিত প্রশ্ন করলাম, 'কী, হল কী?'

'ট্রেনে বলব।'

ট্রেনে উঠে হৈমন্তী হাতের কাগজটা আমার সামনে প্রসারিত করে দিল। বড়ো বড়ো অক্ষরের লেখা—রায়বাহাদুর তেজেশচন্দ্র সরকার নিহত।

তারপর ছোটো ছোটো অক্ষরে বিবরণ 'কে বা কাহারা রায়বাহাদুরকে হত্যা করিয়া গিয়াছে। প্রতি রাত্রের মতোই এক কাপ দুধ পান করিয়া শয়ন করেন। পরদিন অনেক দরজা ঠেলাঠেলির পর তাঁহার ঘুম না ভাঙাইতে পারিয়া বৃদ্ধ ভৃত্য লোক ডাকিয়া দরজা ভাঙিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া প্রভুকে মৃত অবস্থায় দেখিতে পায়। অত্যন্ত আশ্চর্যের কথা, সমস্ত দরজা জানলা ভিতর হইতে অর্গল বন্ধ ছিল। কাজেই দুর্বৃত্তরা কীভাবে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল, তাহা কিছু জানা যাইতেছে না। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য প্রেরিত হইয়াছে।'

তারপর তেজেশবাবুর জনহিতকর কাজের তালিকা, তাঁর বিশাল হৃদয়ের পরিচয় প্রভৃতির ফিরিস্তি।

'তোমার কী মনে হয় নিরুপম?'

'আত্মহত্যা নয়তো?'

সূচীপত্রে যান

'সে রকম কোনো স্বীকারোক্তি পাওয়া যায়নি। তা ছাড়া এ বয়সে লোকে আত্মহত্যা করেও না।'

'তবে, আপনার কী মনে হয়?'

হৈমন্তী হাসল, 'আমার কিছুই মনে হয় না। সরেজমিনে তদারক না করলে কিছুই বলতে পারব না। আমি ফোনে পুলিশ সুপারের সঙ্গে কথা বলেছি। তিনি আমাদের সবরকম সুযোগ দেবেন। দেখা যাক।'

হোটেলে জিনিসপত্র রেখেই দুজনে বেরিয়ে পড়লাম। তেজেশবাবুর দরজায় পুলিশ মোতায়েন ছিল। আমাদের দেখে সেলাম করে পথ ছেড়ে দিল। সম্ভবত পুলিশ সুপার আমাদের কথা তাকে বলে থাকবেন।

দরজা খুলে ভিতরে ঢুকলাম। তেজেশবাবুর শয়নকক্ষ। দোতলায়। এককোণে আধুনিক ডিজাইনের একটি খাট। মাথার কাছে টিপয়ের ওপর টেলিফোন। পাশে একটি ছোটো টেবিল, নীচের থাকে কতকগুলো বই। ওপরে সম্ভবত দুধের কাপটা ছিল। ঘরে আর কোনো আসবাব নেই। দেয়ালে মাত্র একটা ছবি। বুদ্ধের। তিব্বতী ঢং-এ আঁকা। সেই ছবির সামনে মেঝের ওপর একটা কার্পেটের আসন পাতা।

রামকমলকে ডেকে পাঠানো হল। চোখ মুছতে মুছতে বেচারি এসে হাজির।

রাত্রে তেজেশবাবু দুধ ছাড়া কিছু খান না। শুধু এক কাপ ঠান্ডা দুধ। খুব ঠান্ডা। প্রত্যেক রাতেই দুধ চাপা দিয়ে রেখে রামকমল চলে যায়। দুধ ঠান্ডা হলে তেজেশবাবু পান করেন।

'এখানে আসন কেন?' হৈমন্তী প্রশ্ন করল।

'বাবু প্রত্যেদিন বসে জপ করেন। প্রায় দু-ঘণ্টা ধরে।'

'এ ছবিটা কোথা থেকে এল?'

'অনেক আগে বাবু গ্যাংটক থেকে কিনে এসেছিলেন।'

হৈমন্তী আর কিছু বলল না। ঘুরে ঘুরে সমস্ত জানলা দরজা মেঝে তন্ন তন্ন করে দেখতে লাগল। কোথাও কোনো চিহ্ন নেই। হাতের অথবা পায়ের।

'এমনও তো হতে পারে, কেউ আগে থেকে খাটের তলায় লুকিয়েছিল।'

দোরগোড়ায় দাঁড়ানো পুলিশটা আলোকপাত করার চেষ্টা করল।

হৈমন্তী হাসল, 'কাজ শেষ করে লোকটা তাহলে পালাল কোথা দিয়ে? দরজা ভেঙে এ ঘরে ঢুকতে হয়েছিল, শুনলাম। দরজা এখনও ভাঙাই রয়েছে।'

অপ্রস্তুত পুলিশটি সরে গেল সেখান থেকে।

একটু পরেই অনেকগুলো বুটের শব্দ শোনা গেল। দারোগা আর এক সহকর্মী এসে হাজির হল।

'এই যে হৈমন্তীবাবু, কিছু পেলেন খুঁজে?'

হৈমন্তী কোনো উত্তর দিল না। একটা আতশ কাচ হাতে নিয়ে মনোযোগ দিয়ে কী দেখতে লাগল।

দারোগা বলতে লাগল, 'পোস্ট-মর্টেম রিপোর্ট এসেছে, পোটাসিয়াম সায়নাইডে মৃত্যু। দুধে মেশানো ছিল। বুঝতে পারছেন, এ রামকমলের কীর্তি। তাকে গ্রেপ্তার করার অর্ডার দিয়েছি।'

এবারেও হৈমন্তী কিছু বলল না। এদিক-ওদিক চেয়ে একবার দেখল। রামকমল নেই। পুলিশ তখন তাকে বাইরে ডেকে নিয়ে গিয়ে অ্যারেস্ট করেছে।

'আর কী দেখবেন?' দারোগা তাড়া দিল।

হৈমন্তী কয়েক পা পিছিয়ে এসে একটা ভেন্টিলেটারের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, 'ওটা খোলা ছিল?'

দারোগা টিটকিরি দিয়ে হেসে উঠল, 'একেই বলে স্ত্রী বুদ্ধি! এ ভেন্টিলেটারের ফাঁক দিয়ে বড়োজোর একটা বেড়ালবাচ্ছা গলে আসতে পারে, মানুষের কথা বাদ দিন।'

'আমাকে একটা কাঠের মই জোগাড় করে দিতে পারেন?' হৈমন্তী দারোগার কথায় কর্ণপাত করল না।

'কী করবেন? ভেন্টিলেটার দিয়ে ঢোকা যায় কি না পরখ করবেন?' দারোগার হাসি আকর্ণ বিস্তৃত।

হৈমন্তী দৃঢ়কণ্ঠে আমার দিকে চেয়ে বলল, 'দেখ তো নিরুপম, কাঠের একটা মই জোগাড় করতে পারো কিনা?'

সূচীপত্রে যান

আমাকে আর যেতে হল না। বাইরে থেকে একটা পুলিশই মই নিয়ে এল। কিছুদিন আগেই বাড়িতে রং দেওয়া হয়েছিল, মিস্ত্রিদের মই বাইরে পড়েছিল।

মই আনতেই হৈমন্তী তর তর করে মই বেয়ে উঠে পড়ল। ভেন্টিলেটারের কাছে ঝুঁকে পড়ে অনেকক্ষণ ধরে কী দেখল, তারপর সাবধানে নেমে এল।

'কি, পেলেন কিছু খুঁজে?' দারোগা জিজ্ঞাসা করল।

'না, মিস্টার রয়, নতুন কিছু পেলাম না,' হৈমন্তী ঘাড় নাড়ল; 'রামকমলই বোধ হয় অপরাধী।'

হোটেলে ফিরে খাওয়াদাওয়া সেরে হৈমন্তী আবার বের হল। সঙ্গে যথারীতি আমি।

এবার লক্ষ্য তেজেশবাবুর অভ্রের কারখানা।

কারখানা বন্ধ ছিল। আমরা ম্যানেজারের কামরায় ঢুকলাম।

সেই দুর্ঘটনার দিন সকাল থেকে তেজেশবাবুর সঙ্গে কারা দেখা করেছিল, তার একটা তালিকা জোগাড় হল। বেশিরভাগ লোকই অফিসের। কাগজপত্র সই করাতে এসেছিল। ব্যাবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে তেজেশবাবুর সঙ্গে কারও মনোমালিন্য আছে, এমন খবর পাওয়া গেল না।

আমরা দুজনে বেরিয়ে এলাম। হৈমন্তী খুব চিন্তিত। সারা পথ আমার সঙ্গে একটি কথাও বলল না।

'চলো, একবার স্টেশনের এলাকাটা ঘুরে আসি।'

হৈমন্তীর সঙ্গে ঘুরে ঘুরে বিস্মিত হওয়া ছেড়ে দিয়েছি। কোনো উত্তর না-দিয়ে তার অনুসরণ করলাম।

স্টেশন ফাঁকা। এখন বোধ হয় আপ-ডাউন কোনো ট্রেনেরই আসার সম্ভাবনা নেই।

হৈমন্তী সোজা স্টেশনমাস্টারের ঘরে ঢুকে গেল। আমি পিছন পিছন।

স্টেশনমাস্টার টেবিলের ওপর দুটি পা তুলে দিবানিদ্রার আয়োজন করছিল, হঠাৎ ঘরের মধ্যে একটি তরুণীকে দেখে বিব্রত হয়ে পা নামিয়ে নিল।

'নমস্কার!' হৈমন্তী সামনের টুলটা টেনে নিয়ে বসল।

'কী বলুন?' স্টেশনমাস্টার গলাটা প্রসারিত করল।

'আচ্ছা, এখানে দেখার কী আছে বলুন তো? আপনি এখানে কত দিন আছেন?'

হৈমন্তীর কণ্ঠে কিশোরীর চাপল্য।

'তা বছর পাঁচেক হয়ে গেল। এখানে তো লোকে উশ্রী জলপ্রপাত দেখতেই আসে। দেখেছেন সেটা?'

'কবে!' হৈমন্তী ঠোঁট ওলটাল, তারপর একটু থেমে বলল, 'আচ্ছা, সেদিন পথের ধারে চমৎকার মেটে রং-এর খরগোশ দেখলাম। কাউকে বললে খরগোশ ধরে দেয় না?'

'তা দেবে না কেন? সাঁওতালদের বলুন না, তারা ফাঁদ পেতে ধরে দেবে।'

'আর পাখি, পাখি কেউ বিক্রি করে না? আমি অনেকগুলো কিনতে চাই।'

'পাখি।' ঠোঁট কামড়ে স্টেশনমাস্টার ভাবতে শুরু করল, তারপর হঠাৎ মনে পড়েছে এইভাবে বলল, 'আরে, ভালো কথা, আপনি রূপচাঁদের দোকানে সোজা চলে যান না। পাখি, জানোয়ার যা দরকার তাই পাবেন।'

'রূপচাঁদের দোকান।' হৈমন্তী উত্তেজনা দমন করে বলল, 'ঠিকানাটা দয়া করে বলে দেবেন?'

'ঠিকানা আর কী! সোজা ওই রাস্তাটা ধরে চলে যান। ছোট্ট টিলা দেখছেন একটা, ওরই কোলে একটা সাইনবোর্ড দেখবেন। রূপচাঁদ অ্যান্ড কোং। কিন্তু খুব সাবধান, বেটা একেবারে গলাকাটা। যা দাম বলবে ঠিক তার অর্ধেক বলবেন, বুঝলেন?'

হৈমন্তী বুঝল।

দুজনে বেরিয়ে এসে প্ল্যাটফর্মের ওপর দাঁড়ালাম।

হৈমন্তীই বলল, 'নিরুপম, চলো আগে এক কাপ চা খেয়ে নিই, তারপর রূপচাঁদ কোম্পানিতে যাব।'

সূচীপত্রে যান

একটু বিরক্ত হয়েই বললাম, 'কোথায় এসেছেন খুনের কিনারা করতে, আর তা না-করে কোথায় রংবেরঙের পাখি পাওয়া যায়, তারই খোঁজে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছেন!'

হৈমন্তী মুখ টিপে হাসল। বলল, 'আমাকে বিশ্বাস করতে শেখো নিরুপম। বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর।'

আর কোনো কথা বললাম না। হাঁটতে হাঁটতে রূপচাঁদের দোকানে গিয়ে পৌঁছোলাম।

একতলা বাড়ি। পিছন দিকে বাগানের মধ্যে বিরাট টিনের চালা। তারই নীচে অজস্র খাঁচায় পাখি আর জন্তুর মেলা। পথে আসতে আসতেই পাখির কাকলি কানে আসছিল।

রূপচাঁদের দেখা মিলল। খর্বকায়, কৃশতনু। মনে হয় মানুষটা যেন অনেক ঝড়ঝাপটা পার হয়ে এসেছে।

হৈমন্তী এগিয়ে গেল।

'কলকাতা থেকে আসছি। পাখির খুব শখ। প্রতি সপ্তাহে নিউ মার্কেট ঘুরে ঘুরে পাখি কিনি। আপনার কাছে নতুন রকমের পাখি কিছু আছে?'

রূপচাঁদ অপাঙ্গে আমাদের দুজনের আপাদমস্তক একবার জরিপ করল। তারপর বলল, 'আসুন।'

খরগোশ গিনিপিগ আর হরেক রকমের পাখি।

হৈমন্তী এধার থেকে ওধারে দ্রুত চোখ বোলাতে লাগল। মনে হল সে যা আশা করেছিল, তা যেন পায়নি। চোখের দৃষ্টিতে হতাশায় আভা।

আমি বললাম, 'এসব কাদের বিক্রি করেন?'

'দেশ বিদেশ থেকে অর্ডার আসে। অনেক জায়গার চিড়িয়াখানাতেও যায়। তা ছাড়া অনেক বিজ্ঞানের কলেজে গিনিপিগ, খরগোশ এসবও দিতে হয়।'

হৈমন্তী আরও এগিয়ে গেছল। খাঁচায় সারের মাঝখানের সরু পথ দিয়ে। একেবারে কোণের দিকে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

আমরাও তার পিছনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

একটা বড়ো খাঁচায় একটা ছোটো আকারের বানর। খাঁচার মাঝখানের রডটা ধরে ডিগবাজি খাচ্ছে।

'বা, ভারি চমৎকার তো! এটা কত দাম?' হৈমন্তী উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

রূপচাঁদ গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'না, ওটা বিক্রি করতে পারব না। ওটা একটা সার্কাস কোম্পানিকে দেবার কথা হয়ে গেছে। তারা অগ্রিম টাকাও পাঠিয়ে দিয়েছে। সেইজন্যই ওটাকে কিছু খেলা শিখিয়েছি।'

হৈমন্তী একবার রূপচাঁদের দিকে চেয়ে দেখল, তারপর সরে এল খাঁচার কাছ থেকে।

একটা বাচ্ছা হরিণ দর করে আগাম কিছু টাকা রূপচাঁদকে দিয়ে এল। বলে এল, পরের দিন সকালে লোক পাঠিয়ে হরিণটা নিয়ে যাবে।

রূপচাঁদ প্রাপ্তির একটা রসিদ লিখে দিল। তারপর অনেক রাত পর্যন্ত হৈমন্তী খুব ব্যস্ত হয়ে রইল।

আমি হোটেলে শুয়ে রইলাম একটা মাসিক পত্রিকা নিয়ে। হৈমন্তীর সঙ্গে যেতে চেয়েছিলাম, কিন্তু সে বারণ করল। হেসে বলল, 'এখন নয়, পরে। এখন সঙ্গে থাকলে সাসপেন্সটা নষ্ট হয়ে যাবে। নিরুপায়। নারীচরিত্রের হদিস দেবতারাও পান না, তাও নারী গোয়েন্দা-চরিত্র!'

রাত কাটল। পরের দিন সকালে হৈমন্তীকে হরিণটা আনার কথা মনে করিয়ে দিলাম।

হৈমন্তী হেসে বলল, 'আনব কার কাছ থেকে? রূপচাঁদবাবু হাজতে।'

চমকে উঠলাম, 'সেকী?'

'ধীরে, রজনী ধীরে। সময়ে সবই জানতে পারবে।'

হৈমন্তী বেরিয়ে গেল, আমাকে সঙ্গে না নিয়েই।

সমস্ত দিন হৈমন্তী বাইরেই রইল। হোটেলে ফিরল না। আমি বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে খাওয়াদাওয়া সেরে শয্যায় গা এলিয়ে দিলাম।

সূচীপত্রে যান

কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম জানি না, ঘুম ভাঙল হৈমন্তীর চিৎকারে। ধড়মড় করে উঠে বসলাম।

'কী ব্যাপার?'

'চলো সার্কাস দেখে আসি।'

আমি হতভম্ব। বিছানা থেকে নামতে নামতে বললাম, 'কী ব্যাপার আপনার বলুন তো? খুনের কিনারা করতে এসেছেন, না ফুর্তি করতে এসেছেন। আসামি ধরা চুলোয় গেল, কেবল কোথায় হরিণ বিক্রি হচ্ছে, কোথায় সার্কাস হচ্ছে, এই করে বেড়াচ্ছেন!'

হৈমন্তী হাসল। 'শখের গোয়েন্দা হবার ওই এক মস্ত সুবিধা নিরুপম, কাউকে কৈফিয়ত দিতে হয় না। আসামি না ধরতে পারলে চাকরি যাবার ভয় নেই। নাও, যাবে তো চলো।'

অগত্যা উঠতে হল।

বাইরে একটা টাঙ্গা অপেক্ষা করছিল। তাতে উঠে বসলাম।

টাঙ্গা যে বাড়ির সামনে থাকল, উঁকি দিয়ে দেখেই আমি অবাক।

'একী, এ যে রায়বাহাদুরের বাড়ি!'

'সার্কাসের তাঁবু এখানেই পড়েছে। আর একটি কথাও নয় নিরুপম। চুপচাপ বাড়ির পিছন দিকে চলে এসো।'

আস্তে আস্তে পা ফেলে বাড়ির পিছন দিকে গেলাম, তারপর খিড়কির দরজা দিয়ে ঢুকে বাড়ির মধ্যে ঢুকলাম। সিঁড়ি দিয়ে একেবারে দোতলায়।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে, বাইরে কোথাও বাতি নেই। হৈমন্তী টর্চের আলোয় পথ দেখিয়ে চলল।

কিছুটা এগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

টর্চের আলোতে দেখলাম দারোগাবাবু আর তার একজন সহকর্মী দাঁড়িয়ে। দারোগাবাবু নিজের ঠোঁটে আঙুল দিয়ে কথা বলতে নিষেধ করল।

নিঃশব্দ পায়ে তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম।

দরজায় সার সার তিনটি ছিদ্র। হৈমন্তীর নির্দেশে এক একজন এক একটি ছিদ্রে চোখ রাখলাম।

রায়বাহাদুর তেজেশ সরকারের শয়নকক্ষ। অনুজ্জ্বল আলো, কিন্তু দেখতে কোনো অসুবিধা হল না।

শয্যা প্রস্তুত। এদিকে টেবিলের ওপর ডিশ-ঢাকা কাপ। অন্যদিকে আসনের ওপর ছবির দিকে মুখ করে কে একজন উপবিষ্ট। এ কোণ থেকে তার মুখটা দেখা যাচ্ছে না।

বুঝতে পারলাম। ঠিক হত্যার রাতের দৃশ্য সাজানো হয়েছে। আসামিকে ধরার জন্য এ পদ্ধতিও অন্য দেশে একাধিকবার অনুসৃত হয়েছে।

এও বোধ হয় তাই।

খুট করে একটা শব্দ হতেই চমকে উঠলাম, তারপর উত্তেজনায়, বিস্ময়ে যেন বাকরোধ হয়ে গেল।

দেয়ালের পাইপ বেয়ে তরতর করে বানরের একটা বাচ্ছা নেমে এল। আস্তে আস্তে এসে ডিশটা তুলে কাপে কী-একটা ফেলে দিয়ে আবার পাইপ বেয়ে নক্ষত্রগতিতে ভেন্টিলেটারের মধ্যে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

'আশ্চর্য!' কপালের ঘাম মুছতে মুছতে দারোগাবাবু প্রথম কথা বলল।

ভিতরের দরজা খুলে হৈমন্তী বাইরে এল। পিছনের আসন থেকে উঠে একটি পুলিশ কর্মচারীও বাইরে এসে দাঁড়াল।

দারোগাবাবুর দিকে চেয়ে হৈমন্তী বলল, 'কি স্যার, বিশ্বাস হল?'

দারোগাবাবু হাতজোড় করে বলল, 'অবলা কেন মা এত বলে!'

'এবার অবশ্য বিষ নয়, অ্যানাসিনের বড়ি বানরটির হাতে দিয়েছিলাম। একই স্টিমুলাস, কাজেই তার রেসপন্স একই হয়েছিল।'

সূচীপত্রে যান

'কিন্তু রূপচাঁদকে এর সঙ্গে জড়াবেন কী করে?'

'রূপচাঁদের সই করা স্বীকারোক্তি আমার কাছে আছে। যাবার আগে আপনাকে দিয়ে যাব। আপনি অনুগ্রহ করে বৃদ্ধ রামকমলবাবুকে আজই ছেড়ে দেবেন। বেচারি বড়ো কান্নাকাটি করছে।'

দারোগাবাবু মাথা নীচু করেই ঘাড় নাড়ল।

আসল কথা হল ফেরার সময়। ট্রেনে। 'তা হলে সার্কাসটা তোমার খারাপ লাগেনি নিরুপম?' চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে হৈমন্তী জিজ্ঞাসা করল।

'না, তা লাগেনি, কিন্তু গোড়া থেকে আমাকে একটু খুলে বলুন।'

হৈমন্তী চায়ের কাপটা সরিয়ে রেখে বলতে আরম্ভ করল।

'প্রথমেই দুটো জিনিস আমার মনে হয়েছিল। এক, যে-ই রায়বাহাদুরকে হত্যা করে থাকুক, টাকা পয়সার জন্য যে করেনি— সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ, কোনো টাকা পয়সা চুরি যায়নি, যদিও বালিশের তলায় তাঁর মানিব্যাগ থাকত। রায়বাহাদুরের মৃত্যুতে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি অন্য কেউ পাবে, এমন সম্ভাবনাও ছিল না, কারণ তিনি নিঃসন্তান নন। তাঁর উইলে তাঁর পুত্র-কন্যার জন্য যথারীতি সংস্থান করা আছে।

দুই, যেভাবে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে, তাতে বোঝা যায় কোনো মানুষের পক্ষে বন্ধ ঘরে বাইরে থেকে ঢোকা সম্ভব নয়।

তোমার মনে থাকতে পারে, মই আনিয়ে আমি ভেন্টিলেটারের চারপাশ দেখেছিলাম।'

আমি ঘাড় নাড়লাম।

'একটা হাতের বা পায়ের দাগ ছিল। মানুষের নয়, অন্য জন্তুর। আমার প্রথম ধারণা হয়েছিল কুকুরের। কেউ যেন ভেন্টিলেটার দিয়ে ঢুকেই নতুন দেওয়া রঙে পা পিছলে গিয়েছিল। সেই পায়ের ছাপ আমি মনে মনে তুলে নিই, তারপর হোটেলে ফিরে জন্তুজানোয়ারদের হাত পায়ের ছাপের যে বই আমার আছে, তা দেখে বুঝতে পারি, ছাপটা কুকুরের পায়ের নয়, বানরের। বুঝতে পারলাম বানরটি যথেষ্ট পরিমাণে শিক্ষিত। তারপর কী করে রূপচাঁদের সন্ধান পাই তা তোমার অজানা নয়। সেখানে বানরের নখে তখনও রং লেগেছিল।'

হৈমন্তী একটু থামল। আঁচল দিয়ে মুখটা মুছে আবার বলতে লাগল, রূপচাঁদকে নিয়েই আমাকে একটু বেগ পেতে হয়েছিল। কিছুটা মিথ্যার আশ্রয়ও নিতে হয়েছে'।

'মিথ্যার আশ্রয়?'

'তাই বই কী!'

'তাই বই কী।' সোজাসুজি রূপচাঁদকে বললাম, 'ছি, রূপচাঁদ, সবই বেশ কায়দামাফিক করে এসেছিলে, কিন্তু বিষটা আর একটু জোরালো দিতে হয়। দুধটা খাওয়ার পরও রায়বাহাদুর একটা কাগজ টেনে তোমার নামটা লেখবার যথেষ্ট সময় পেলেন কী করে? মানুষের মতন কাজ কি আর বানরে পারে? তাকে যতই ট্রেনিং দাও।'

রূপচাঁদ দুটো ঠোঁট টিপে রইল।

আমি বলতে লাগলাম, ''তোমার অনুতপ্ত হওয়া উচিত রূপচাঁদ। একজন নিরীহ, ধার্মিক ভদ্রলোককে তুমি এভাবে শেষ করলে। অমায়িক, দেশপূজ্য লোক, জীবনে কখনো কোনো অন্যায় করেননি—''

''আঃ থামুন, থামুন আপনি! জীবনে কখনো কোনো অন্যায় করেনি। মহাধার্মিক লোক! আমার সর্বনাশ কে করেছে? কে আমাকে আহত করে আমার যথাসর্বস্ব—''

রূপচাঁদ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

তারপরের কথাগুলো জানতে আর অসুবিধা হয়নি নিরুপম। অনেক বছর আগে দুই বন্ধু তেজেশ আর রূপচাঁদ, তখন তার নাম ছিল সুবিনয়, গ্যাংটক বেড়াতে গিয়েছিলেন। সেখানে গুম্ফার ধ্বংসস্তূপের মধ্যে বেড়াতে বেড়াতে বেশ কিছু স্বর্ণমুদ্রার সন্ধান তাঁরা পেয়েছিলেন। দুজনে সে স্বর্ণমুদ্রা সমান ভাগে ভাগ করে

সূচীপত্রে যান

নিয়েছিলেন। তারপর একই পান্থনিবাসে পাশাপাশি দুজনে যখন শুয়ে, তখন তেজেশবাবুর মনে লোভের সাপটা ফণা মেলে দাঁড়িয়ে উঠেছিল। অর্ধেকের চেয়ে সম্পূর্ণটা যে অনেক বেশি এমন একটা চিন্তা বার বার তার মস্তিষ্ককোষ আলোড়িত করেছিল।

তাই রাতের অন্ধকারে আস্তে আস্তে উঠে লোহা বাঁধানো বাঁশের লাঠিটা নিয়ে সুবিনয়ের মাথায় সবেগে আঘাত করে তার বুকের মধ্যে লুকানো স্বর্ণমুদ্রাগুলো নিয়ে সেই রাতেই তেজেশবাবু দার্জিলিং চলে এসেছিলেন। তার পরের দিন কলকাতা। সেখান থেকে পশ্চিমের নানা দেশ।

তারপর কোথাও কোনো আলোড়ন না-দেখে গিরিডিতে এসে অভ্রের ব্যাবসা শুরু করেছিলেন। তেজেশবাবু নিশ্চিন্তে ছিলেন যে কোনো ভয় নেই। মৃত ব্যক্তি তার অংশ চাইতে আসে না। তা ছাড়া এ অর্থের মালিকানা প্রমাণ করাও সহজসাধ্য নয়।

কিন্তু বছর দুয়েক আগে বেড়াতে বেড়াতে রূপচাঁদের মুখোমুখি হয়েছিলেন। তেজেশবাবু চিনতে পারেননি, কিন্তু রূপচাঁদ পেরেছিল।

রূপচাঁদ সত্যিই যে লোকটাকে চিনতে পেরেছিল, তাকে নিশ্চিহ্ন করে তার প্রমাণও সে দিয়েছে।'

সূচীপত্রে যান

বানরের পাঞ্জা

লখনউ থেকে দিল্লি, সেখান থেকে আগ্রা।

মনোজ, অসীমাভ আর সরোজ, তিনজন অন্তরঙ্গ বন্ধু। স্কুলের নীচু ক্লাস থেকে পাশাপাশি বসত; তারপর কলেজে এসে ছাড়াছাড়ি। মনোজ আর পড়ল না। বাপের বাসনের কারবারে ঢুকে পড়ল। অসীমাভ ডাক্তারি লাইনে গেল আর সরোজ অধ্যাপক। ছাড়াছাড়ি মানে আগের মতন পাশাপাশি বসল না, কিন্তু যোগাযোগ ঠিকই রইল। সপ্তাহে একদিন কী দু-দিন মনোজের দোকানে কিংবা অসীমাভ অথবা সরোজের বাড়িতে ঠিক তিনজনের দেখা হত। একটানা ঘণ্টা তিনেক আড্ডা।

তিনজনের কেউ এখনও বিয়ে করেনি, তবে সরোজের একটি মেয়ের সঙ্গে প্রগাঢ় প্রেম চলছে। মেয়েটির নাম লীলা। বন্ধুরা আশা করছে শীঘ্রই একটা বিয়ের নিমন্ত্রণ পাবে।

পূজার ছুটিতে তিনজন ঠিক করল বেড়িয়ে আসবে। প্রথমে লখনউ, তারপর দিল্লি হয়ে আগ্রা। যেখানে মুসলিম ভাস্কর্য আর স্থাপত্যের চিহ্ন আছে, সেইসব জায়গা।

সরোজ এসব নিয়ে গবেষণা করছে, তার কাজের সুবিধা হবে।

আগ্রায় ফতেপুর সিক্রি থেকে বেরিয়েই তিন বন্ধু দাঁড়িয়ে পড়ল। গাছের তলায় দু-তিনজন লোক নানারকমের পাথরের মালা বিক্রি করছে।

সরোজের খুব ইচ্ছা ছিল লীলাকে সঙ্গে আনে, কিন্তু মধ্যবিত্ত সমাজে বিয়ের আগে এভাবে ছেড়ে দেওয়ার রেওয়াজ নেই, তাই লীলার যাওয়া সম্ভব হয়নি।

সরোজ মালা কেনবার জন্য লোকটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

এর আগে লখনউ থেকে লীলার জন্য সরোজ নাগরা কিনেছিল। দিল্লি থেকে সোয়েটার, আগ্রা থেকেও কিছু-একটা নিয়ে যেতে চায়।

বন্ধুরাও সরোজের পিছন পিছন এসে হাজির। অনেক রকমের মালা দেখা হল, কিন্তু সরোজের পছন্দ হল না। অসীমাভ সরোজকে বলল, 'চল, ওইদিকে একটা লোক বসে আছে। ওর কাছে দেখি।'

একদিকে পাঁচিল ঘেঁষে বিরাট একটা গাছের নীচে পাথরের ওপর একটা লোক বসে। তার সামনে একটা ডালায় নানারকমের হার, লকেট, পাথরের তাজমহল, দোয়াতদান।

লোকটার চোখে চশমা, মুখে বসন্তের দাগ। তামাটে রং, অতি শীর্ণকায়, মাথায় 'কত করে' বসানো মুসলমানি টুপি।

তিন বন্ধু তার সামনে বসল।

নানা রং-এর হার রয়েছে। নানা প্যাটার্নের। সরোজ বেছে বেছে গোটা ছয়েক কিনল। অসীমাভ আর মনোজ কিনল দুটো পাথরের তাজমহল।

ওঠবার মুখে হঠাৎ অসীমাভর নজরে পড়ল, 'ওটা কী? ওটা?'

লোকটা তাড়াতাড়ি জিনিসটা সরিয়ে ফেলে বলল, 'ওটা বিক্রির নয় হুজুর!'

অসীমাভ নাছোড়বান্দা। বলল, 'আরে বিক্রির নাই-বা হল, একবার দেখিই না।'

অনেক ধরাধরির পর লোকটা দেখাল। ডালার নীচে একটা বইয়ের মধ্যে জিনিসটা ছিল।

একটা বানরের হাত। কবজি পর্যন্ত কালো লোম। হাতের চেটোয় লাল রং-এর মাংস।

'এটা এখানে রেখেছো কেন?'

সূচীপত্রে যান

মনোজের কথার উত্তরে লোকটা বলল, 'খুব পয়মন্ত জিনিস হুজুর। সেকালের জিনিস। আমার নানার কাছ থেকে বাবা পেয়েছিল। তাঁর কাছ থেকে আমি। এখানকার বানর নয় হুজুর, মধ্যপ্রদেশের।'

মনোজ বলল, 'কত পেলে এটা দেবে বলো তো? পয়মন্ত কিনা আমাদের জানবার আগ্রহ নেই, নতুন ধরনের জিনিস বলে কিনতে চাই।'

লোকটা মাথা নীচু করে বলল, 'না হুজুর, এটা বেচব না।'

কোনো কথা না-বলে মনোজ ব্যাগ থেকে একটা এক-শো টাকার নোট বের করে এগিয়ে দিল, 'এই নাও — এটা রাখো।'

নোটটা দেখে লোকটার দুটো চোখ জ্বলে উঠল। তবু মুখে বলল, 'কিন্তু হুজুর—'

'আর কিন্তু নয়, দিয়ে দাও।' লোকটা একটু ইতস্তত করে একটা কাগজে ভালো করে বানরের পাঞ্জাটা প্যাক করে বলল, 'একটা কথা আছে হুজুর।'

'কী বলো?'

'কোনো আওরত যেন এ পাঞ্জা না ছোঁয়।'

মনোজ হেসে উঠল, 'ঠিক আছে। সে ভয় নেই। আমি বিয়ে-থা করিনি। এ পাঞ্জা আমার দোকানে রাখব।'

'আর একটা কথা।'

'কী?'

'কোনো বাক্স বা সিন্ধুকে এটাকে রাখবেন না। বইয়ের মধ্যে রাখবেন, তবে ইংরেজি বইয়ের মধ্যে নয়।'

টাকা দিয়ে মনোজ পাঞ্জাটা নিয়ে এল।

রাস্তায় অসীমাভ বলল, 'তোর কি মাথা খারাপ, এ জিনিস কিনতে গেলি কেন?'

মনোজ উত্তর দিল, 'কত দিকে তো কত বাজে খরচ করি। দেখাই যাক-না পাঞ্জার কেরামতি! আশেপাশে অনেকগুলো বাসনের দোকান হওয়াতে আমার দোকানের অবস্থা খুব ভালো নয়। কার মধ্যে কী শক্তি আছে, বলা যায়। তা ছাড়া আরও কথা।'

'কী?'

'এ তো পুরোনো বানরের পাঞ্জা, সেই তুলনায় ছোটো, কত লাল আর তুলতুলে হয়েছে। তুই তো ডাক্তার, বল অসীমাভ, এ কি করে সম্ভব?'

অসীমাভ হেসে উঠল, 'তোকে লোকটা যা বলেছে, সবই দেখছি তুই বিশ্বাস করে বসে আছিস। মোটেই পাঞ্জাটা এত পুরোনো নয়। তা ছাড়া বইয়ের মধ্যে রাখতে হবে, কোনো স্ত্রীলোকে ছোঁবে না— এসব যা বললে সবই ভড়ং। এ ধনের কথা না বললে তোর মনে বিশ্বাস জন্মাবে কী করে?'

ব্যাস, এ সম্বন্ধে আর কথা হল না।

আগ্রা থেকে তিনজনে কলকাতায় ফিরে এল।

সপ্তাহে দিন দুয়েক যদিও তিন বন্ধুর দেখা হত, কিন্তু বানরের পাঞ্জার কথা কেউ তুলত না। কারও খেয়ালই হত না।

পাঞ্জাটা মনোজ তার দোকানে রাখল। একটা বাঁধানো বইয়ের মাঝখানে।

আশ্চর্য কাণ্ড, মাস খানেকের মধ্যে দোকানের উন্নতির আভাস দেখা গেল!

দুটো অভিজাত পরিবার বিয়ের বাসনের অর্ডার মনোজ পেল। এ ছাড়া উত্তরবঙ্গে এক দোকানদার বাসনের এজেন্সি নিল। সারা উত্তরবঙ্গের জন্য।

একদিন মনোজই কথাটা পাড়ল। বলল, 'তোরা বিশ্বাস করতে চাইবি না; পাঞ্জাটায় যেন আমার উপকার হয়েছে।'

'ও, সেই পাঞ্জাটা? কী রকম?'

মনোজ দোকানের বিক্রির উন্নতির কথাটা বলল।

সূচীপত্রে যান

অসীমাভ হাসল, 'বন্ধু, ওটা কাকতালীয় ব্যাপার। পাঞ্জা না এলেও এসব অর্ডার তোর আসত!'

সরোজ শুধু বলল, 'যাক, তোর ভালো হলেই ভালো।'

দিন পনেরো পর অসীমাভ আর সরোজ দুজনেই খবরের কাগজে দেখল মনোজের দোকানে আগুন লেগে বেশ ক্ষতি হয়েছে।

দুজনেই মনোজের সঙ্গে দেখা করতে গেল। মনোজের অবস্থা অবর্ণনীয়। দু-চোখ লাল। ভগ্নকণ্ঠ। বন্ধুদের দেখে বলল, 'আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে ভাই! কী করে যে আগুন লাগল ভগবান জানেন। মনে হচ্ছে আগুন যেন আমার দোকানকে শেষ করার জন্যই শুরু হয়েছিল। আশপাশের দোকানে আঁচটুকু লাগেনি।'

অসীমাভ প্রশ্ন করল, 'কেউ শত্রুতা করে আগুন লাগিয়ে দেয়নি তো?'

'কে দেবে? এতদিনকার দোকান, কারও সঙ্গে তো আমার শত্রুতা নেই।'

'কর্মচারীরাও খুশি। তবে—'

'কী তবে?'

মনোজ কিন্তু বলল না। দুই বন্ধুর মুখের দিকে চোখ ফিরিয়ে দেখল। দ্বিধাগ্রস্ত ভাব।

'কী হল, বল?' সরোজ তাড়া দিল।

'বলব, কিন্তু তোরা কি বিশ্বাস করবি?'

'আগে বলেই দেখ।'

মনোজ বলতে আরম্ভ করল।

'রাধার মা বলে একটি ঝি আমার দোকান ঝাঁট দেয়। দিন পাঁচেক আগে দোকানে বসে আছি, রাধার মা সেই বানরের পাঞ্জাটা হাতে করে আমার সামনে এসে দাঁড়াল। ''বাবু, এটা কী দেখুন তো?''

পাঞ্জাটা দেখেই চমকে উঠলাম, ''একী, এটা তুমি পেলে কোথা থেকে?''

''ওই বড়ো বইটার নীচে মেঝের ওপর পড়েছিল।''

আমি তাড়াতাড়ি পাঞ্জাটা রাধার মার হাত থেকে আবার বইয়ের মধ্যে রেখে দিলাম। বুঝতে পারলাম ঠিক সেদিন থেকে সর্বনাশ শুরু হল, কারণ স্ত্রীলোক পাঞ্জা স্পর্শ করেছে। দোকানের বিক্রি কমল। দু-একজন ভালো খদ্দের বাসনপত্র ফেরত দিয়ে গেল মনোমত হয়নি বলে। ওপরের তাকে রাখা কিছু বাসনপত্র পাওয়া গেল না। এই নিয়ে কর্মচারীদের সন্দেহ হল, কিন্তু কাউকে কিছু বললাম না, বুঝলাম সবই আমার অদৃষ্ট। তারপর চরম সর্বনাশ এই অগ্নিকাণ্ড!'

'পাঞ্জাটা এখন কোথায়?'

'সেটা যাতে দ্বিতীয়বার না ওই মহিলা হাত দেয়, তাই বাড়িতে নিয়ে গিয়ে আমার বসবার ঘরে একটা বই-এর মধ্যে রেখে দিয়েছি।'

মনোজের বর্তমান অবস্থায় পাঞ্জার ব্যাপার নিয়ে অসীমাভ আর সরোজ কোনো তর্কের অবতারণা করল না।

দিন সাতেক পর অসীমাভ সরোজের বাড়ি এল, রাত তখন দশটা। বলল, 'মনোজের মা ফোন করেছিলেন, কাল থেকে মনোজ নাকি বাড়ি ফেরেনি।'

'সেকী? দোকানের লোকেরা কী বলে?'

'তারা বলে কাল রাত আটটায় দোকানে তালা দিয়ে মনোজ রোজকার মতন বাড়ি ফিরছিল। আজ সকালে অনেক বেলা অবধি দোকান না খোলাতে দুজন কর্মচারী বাড়িতে খবর নিতে এসে মনোজের নিখোঁজ হওয়ার ব্যাপারটা শোনে।'

ইতিমধ্যে মনোজের মা থানায় খবর দিয়েছেন। কান্নাকাটি আরম্ভ করেছেন। বাড়িতে কেবলমাত্র মনোজের মা, আর কেউ নেই।'

অসীমাভ আর সরোজ দুজনেই মনোজের বাড়ি গিয়ে হাজির হল।

সূচীপত্রে যান

তারা পৌঁছোবার আধ ঘণ্টার মধ্যে পুলিশ খবর পাঠাল একটা লাশ পাওয়া গেছে। সনাক্তকরণের জন্য মনোজের মার যাওয়া প্রয়োজন।

মনোজের মার সঙ্গে অসীমাভ আর সরোজ দুজনেই গেল।

মনোজেরই লাশ। দেহে কোথাও আঘাতের চিহ্ন নেই, শুধু গলার দু-পাশে পাঁচ আঙুলের নীলচে দাগ।

পুলিশ বলল, 'মানুষের আঙুলের দাগ বলে কিন্তু মনে হচ্ছে না।'

সঙ্গে সঙ্গে অসীমাভ আর সরোজের বানরের পাঞ্জার কথা মনে পড়ে গেল।

মনোজের মৃত্যুর ব্যাপারে পুলিশ তোলপাড় করে ফেলল, কিন্তু হত্যাকারীর সন্ধান পেল না।

একসময় সবকিছু স্তিমিত হয়ে এল।

মনোজের দোকান আর একজন ব্যবসায়ী কিনে নিল। টাকাটা অসীমাভ আর সরোজ মনোজের মা যাতে পায় তার ব্যবস্থা করে দিল।

অসীমাভ একটা হাসপাতালের ডাক্তার ছিল।

হঠাৎ প্রসিদ্ধ চিকিৎসক রুদ্রপ্রসাদ সিংহ অসীমাভকে ডেকে পাঠালেন তাঁর লোটাস নার্সিং হোমে যোগ দেবার জন্য।

অসীমাভ সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেল। দু-এক মাসের মধ্যে তার পশার খুব বেড়ে গেল। নার্সিংহোমে প্রচুর রোগী সমাগম হতে লাগল। সার্জারিতে অসীমাভের হাত ভালোই ছিল, সুযোগ পেয়ে হাত-যশ আরও বাড়ল।

সরোজ পরিহাস করে জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার, ডাক্তার রুদ্রপ্রসাদের মেয়ে আছে নাকি?'

অসীমাভ হেসে উত্তর দিল, 'একটিই মেয়ে, কিন্তু বিবাহিত। বিলেতে স্বামীর কাছে থাকে।'

মাস কয়েকের মধ্যে অসীমাভ মোটর কিনল, কলকতার উপকণ্ঠে বেশ কিছু জমি। তখন এত ব্যস্ত যে সরোজের সঙ্গে সপ্তাহে একবার দেখা করারও সময় করে উঠতে পারে না।

এক শনিবারের বিকালে সরোজই গিয়ে অসীমাভকে পাকড়াও করল। সবে একটা শক্ত অপারেশন সেরে অসীমাভ নিজের রুমে এসে বসেছে, সরোজ বলল, 'কি ব্রাদার, একেবারে ডুমুরের ফুল হয়ে গেছ?'

অসীমাভ সলজ্জ হাসল।

'তোর উন্নতিতে আমি খুবই খুশি।'

অসীমাভ বলল, 'বোস সরোজ, তোর সঙ্গে দরকারি কথা আছে। তোর মনে আছে মনোজের মার ফোন পেয়ে তার বাড়িতে গিয়েছিলাম? সেইসময় চুপি চুপি তার বসবার ঘর থেকে বানরের পাঞ্জাটা নিয়ে আসি। প্রথমে উদ্দেশ্য ছিল এটা সরিয়ে নিয়ে মনোজকে বিপদমুক্ত করব, তারপর লোভ হল, দেখি পাঞ্জা আমাকে কী দেয়! আশ্চর্য কাণ্ড, পাঞ্জাটা আমার ঘরে আসার সঙ্গে সঙ্গে দেখছিস তো সবদিক থেকে আমার কীরকম উন্নতি হচ্ছে!'

সরোজ বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল, 'পাঞ্জাটা এখন তাহলে তোর কাছে?'

'এই যে,' অসীমাভ সেলফ থেকে মেডিকোর একটা বই পেড়ে পাতা খুলে দেখাল। সেই বানরের পাঞ্জা। আরও যেন জীবন্ত, আরও লোমশ মনে হল।

মাস ছয়েক পর।

অসীমাভ নার্সিং হোমের ডিউটি সেরে নিজের রুমে ঢুকেই চমকে উঠল।

নার্স বাসন্তী তার টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে। তার হাতে পাঞ্জা।

অসীমাভকে দেখে বাসন্তী জিজ্ঞাসা করল, 'এটা কী ড. সেন, আপনার বইয়ের মধ্যে ছিল?'

কিছুক্ষণ অসীমাভ কথা বলতে পারল না। তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমল। বুকের স্পন্দন দ্রুততর হল।

পাঞ্জা স্ত্রীলোক স্পর্শ করেছে; তার অর্থ বিপদ ঘনিয়ে আসছে। কখন কীভাবে আসবে কে জানে! জড়ানো গলায় অসীমাভ কোনোরকমে বলল, 'পরীক্ষা করার জন্য এটা জোগাড় করেছিলাম। দিন আমাকে।'

সূচীপত্রে যান

পাঞ্জাটা নিয়ে আবার সে বইয়ের মধ্যে রেখে দিল।

তিনদিন পার হল না।

একটা অপারেশন করতে করতে অসীমাভ মাথা ঘুরে পড়ে গেল। রোগিণীর পাশে। নিজের হাতের অস্ত্র বুকে বিঁধে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু।

সঙ্গে যারা ছিল হইহই করে উঠল। সহকারী ডাক্তার রোগিণীর অপারেশনে মন দিলেন। অসীমাভর দেহ বাইরে আনা হল। করোনারি অ্যাটাক, তার কোনো স্থির প্রমাণ পাওয়া গেল না।

যথাসময়ে সরোজের কানে খবর গেল। সে ভাবল কোনোরকমে পাঞ্জাটা হস্তগত করে গঙ্গাগর্ভে বিসর্জন দেবে। ও পাপ আর পৃথিবীর বুকে রাখবে না।

কিছুদিন পর সরোজ অসীমাভর রুমে গেল। সেখানে অন্য এক ডাক্তার বসছে।

সরোজ বলল, 'অসীমাভর কাছে আমার একটা জিনিস ছিল।'

'কী জিনিস বলুন তো?'

'ওই মেটিরিয়া মেডিকোর মধ্যে আছে। একটা বানরের পাঞ্জা।'

মেটিরিয়া মেডিকা খুলতেই পাঞ্জা বেরিয়ে পড়ল, 'এটা পেলেন কোথা থেকে?'

'হরিদ্বারে এক সাধুর কাছ থেকে। পরীক্ষা করার জন্য অসীমাভ আমার কাছ থেকে চেয়ে এনেছিল।'

বানরের পাঞ্জা নিয়ে সরোজ বাড়ি এল।

ফিরতে ফিরতেই প্রতিজ্ঞা করল, এই অশুভ প্রত্যঙ্গ নিশ্চিহ্ন করবেই!

বাড়ি ফিরে পুরোনো খবরের কাগজের গোছার মধ্যে পাঞ্জাটা রেখে দিল।

দু-দিন পরে সরকারি এক কলেজ থেকে সরোজের নিয়োগপত্র এল। এ চাকরির জন্য অনেক দিন ধরে সে চেষ্টা করছিল। হবে এমন আশা করেনি। এ চাকরির ওপর তার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছিল। মাইনে অনেক বাড়বে। লীলাকে জীবনসঙ্গিনী করার পথে আর বাধা থাকবে না। সরোজের মনের গোপনে ক্ষীণ একটা চিন্তা ক্ষণেকের জন্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। বানরের পাঞ্জার জন্য এ উন্নতি নয় তো? সঙ্গে সঙ্গে সরোজ নিজেকে ধমকাল। আর সে লোভের বশবর্তী হবে না। দুই বন্ধু লোভের ফাঁদে প্রাণ হারিয়েছে।

সরোজের একলার সংসার। একটি ঝি আছে। রান্না-বান্না গৃহস্থালির সব কাজ সে করে দেয়। মাঝে মাঝে লীলা আসে। ঘর গুছিয়ে দেয়। দু-একদিন রান্নাও করে। আবার লীলার বাড়িতেও সরোজের নিমন্ত্রণ থাকে।

এ বাড়ির বাড়তি একটা চাবি আছে লীলার কাছে। কাজেই সরোজ না থাকলেও তার প্রবেশের কোনো অসুবিধা হয় না।

একদিন বিকালে সরোজ কলেজ থেকে ফিরে দেখল, লীলা বসে আছে। সরোজকে দেখে লীলা হাসল, 'কী মশাই, নতুন চাকরি হল, সন্দেশ কই?'

সন্ধ্যার দিকে দুজনে যখন চায়ের টেবিলে, তখন লীলা বলল, 'তোমায় একটা কথা বলা হয়নি। কোণের ঘরে খবরের কাগজের স্তূপ জমা হয়ে রয়েছে, বিক্রি করার জন্য নামতে গিয়েই দেখি, বাবা কী বিরাট এক মাকড়শা! আমি ভয়ে পালিয়ে এসেছি।'

সরোজ চেয়ারে টান হয়ে বসে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি সেটা ছোঁওনি তো?'

'না, না, ছোঁব কেন?'

সরোজ আর দেরি করল না। পরের দিন কাগজে প্যাক করে পাঞ্জাটা কলেজে নিয়ে গেল।

দিন দুয়েক পর দুজন অধ্যাপক বারোজন ছাত্র নিয়ে আন্দামান যাবার কথা।

একজন অধ্যাপকের হাতে প্যাকেটটা দিয়ে সরোজ বলল, 'এটাতে আমার এক আত্মীয়ের অস্থি আছে। আপনি দয়া করে সমুদ্রে ফেলে দেবেন।'

অধ্যাপকরা ছাত্রদের নিয়ে আন্দামান রওনা হয়ে যেতে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। যাক আর ভয় নেই। দেশের মাটি থেকে পাপ দূর হয়েছে।

সূচীপত্রে যান

দিন সাতেক পর, ঝিয়ের চিৎকারে প্রতিবেশীরা সরোজের শোবার ঘরের দরজা ভেঙে ঢুকেই পুলিশে খবর দিল। খবর পেয়ে লীলাও ছুটে এল।

বিছানায় সরোজ চিৎ হয়ে শুয়ে। দুটি চোখ বিস্ফারিত। মনে হয় বীভৎস কোনো দৃশ্য দেখে ভয় পেয়েছে। শরীর বরফের মতন ঠান্ডা। বুকের উপর বানরের একটা পাঞ্জা।

সেই দেখেই লীলা চিৎকার করে উঠল, 'সেদিন কাগজ সরাতে গিয়ে ওইটে আমার গায়ে পড়েছিল, আমি হাত দিয়ে ছুড়ে সরিয়ে দিয়েছিলাম। ওটা এখানে এল কী করে!'

থানা থেকে দারোগা এসে লাশ মর্গে পাঠাল আর পাঞ্জাটা নিজের পকেটে রেখে দিল। কিন্তু কী আশ্চর্য! থানায় নেমে পকেট তন্ন তন্ন করে খুঁজেও পাঞ্জাটা আর পেল না। পাঞ্জাটা যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল!

সূচীপত্রে যান

গভীর রাতের কান্না

আনন্দ আর প্রদীপ সেদিন একটা চায়ের দোকানে বসে গল্প করছিল। হঠাৎ ভূতের কথা ওঠায় আনন্দ বললে, 'আমি ওসব ভূত প্রেত বিশ্বাস করি না।'

প্রদীপ বললে, 'আমি বিশ্বাস করি। ভূত প্রেত একেবারে আজগুবি কথা নয়। ভূত সত্যি আছে।'

আনন্দ বললে, 'তুই ভূত দেখেছিস?

প্রদীপ বললে, 'আলবাত দেখেছি!'

আনন্দ বললে, 'তাই নাকি বল তাহলে কোথায় দেখেছিস?'

প্রদীপ বললে, 'শোন তাহলে।'

এই বলে প্রদীপ দু-কাপ চায়ের অর্ডার দিয়ে, সিগাটের ধরিয়ে বলতে আরম্ভ করল—

'আমার কাঠের ব্যাবসা, তাই যখন প্রয়োজন হয় আমাকে কাঠের জন্য আসাম, উত্তরবঙ্গ, বিহার যেতে হয়।

হঠাৎ একবার প্রয়োজন হল আসাম যাবার। তখন ব্রিজ তৈরি হয়নি, তাই গঙ্গাসাগর হয়ে কাটিহারের ওপর দিয়ে যেতে হত শিলিগুড়ি বা আসাম।'

তখন স্টেশনে ছিল একটা টিকিট ঘর আর একটা টিনের চালা, যাত্রীদের জন্য। আর আলোর মধ্যে ছিল কেরোসিনের লণ্ঠন।

এর কিছুটা দূরে রেল কোয়ার্টার। একটাতে থাকত স্টেশনমাস্টার আর একটায় কেরানি ও অন্যান্য কর্মচারী।

সারাদিনে মাত্র দু-তিনটে ট্রেন। ট্রেন এলে স্টেশনটা একটু জমজমাট হত। মাঝ পথ ফাঁকা জনমানব শূন্য। বিছানাপত্র বেঁধে খাবার কিছু সঙ্গে নিয়ে যথাসময়ে শিয়ালদহ স্টেশনে গেলাম। ট্রেন ছাড়তে আর দশ মিনিট।

টিকিট কাউন্টার থেকে একটা দ্বিতীয় শ্রেণির টিকিট কাটলাম। দেখতে দেখতে সময় হয়ে এল। ট্রেন এল, উঠলাম।

স্টেশন পার হতেই চারদিক অন্ধকার। সেই অন্ধকারের ভেতর দিয়ে ছুটে চলল আসাম মেল। আমি যে কামরায় উঠেছিলাম তার মধ্যে খুব বেশি যাত্রী ছিল না। সব মিলিয়ে ছেলে-মেয়ে পনেরো থেকে ষোলো জন মাত্র।

সিট প্রায় ফাঁকা দেখে বিছানা পেতে শুয়ে পড়লাম। একখানা ম্যাগাজিন পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়লাম।

ভোরবেলা হকারদের 'গরম চা গরম সিঙাড়া' ইত্যাদি বিভিন্ন কণ্ঠের চিৎকারে আর কুলিদের ওঠা-নামার দুমদাম শব্দে ঘুম ভেঙে গেল।

জানলা দিয়ে চেয়ে দেখি সাহেবগঞ্জ স্টেশন। আর কালবিলম্ব না-করে বিছানা বগলে নিয়ে ব্যাগটা ঝুলিয়ে নেমে গেলাম।

স্টেশনের বাথরুমে গিয়ে মুখ-হাত ধুয়ে একটা চায়ের দোকানে চা নিলাম, সঙ্গে লুচি আলুরদম। চায়ের সঙ্গে সেগুলো সদ্ব্যবহার করে সকালের আহার শেষে করলাম।

খাওয়াদাওয়া শেষ করে স্টিমারের ওপারে বেশ খানিকটা বালির ওপর দিয়ে হেঁটে উঠে বসলাম ট্রেনে। তখন রেলপথের অবস্থা ভালো ছিল না বলে অনেক সময় আস্তে আস্তে আবার থেমে থেমে যেত ট্রেন।

কামরায় খুব লোক ছিল না। কাজেই বেশ আরাম করে বসলাম। গাড়ি স্টার্ট দিল কিন্তু খুব আস্তে আস্তে। বালির ওপর দিয়ে জোরে চালানো অসম্ভব। এইভাবেই গাড়িটা এল মতিহারি স্টেশনে। এখানে কিছু যাত্রী উঠল।

সূচীপত্রে যান

এবার ট্রেন জোরে চলতে লাগল। এখানে বয় এসে খাবার অর্ডার নিয়ে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই এল কাটিহার স্টেশন। অনেক লোক এখানে ওঠা-নামা করতে লাগল। আমার মাছ ভাতের অর্ডার ছিল, আমাকে বয় দিয়ে গেল। আমি দেরি না-করে খাওয়ার পাট শেষ করে ফেললুম।

সন্ধ্যার কিছু আগে শিলিগুড়িতে এসে পৌঁছোলাম।

এখানে গাড়ি প্রায় বিশ-পঁচিশ মিনিট দাঁড়িয়েছিল।

ভোরে এসে পৌঁছোলাম আলিপুরদুয়ার স্টেশনে।

স্টেশনমাস্টারের বয়স বেশি নয়, আর লোকটিও অমায়িক দেখলাম। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এখানে কোনো হোটেল বা থাকবার জায়গা আছে?'

স্টেশনমাস্টার বললেন, 'এই জংলা জায়গায় হোটেল কোথায় পাবেন? এখানে বেশি যাত্রীও আসে না।'

তার কথা শুনে আমার চোখ কপালে উঠল। আজ দু-দিন স্নান হয়নি। এ অবস্থায় কোথায় যাই।

আমার অবস্থা দেখে ভদ্রলোক বললেন, 'আপনি বোধ হয় প্রথম এখানে এসেছেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

স্টেশনমাস্টার বললেন, 'আসুন আমার সঙ্গে। এখানে আমার একটা মেস আছে সেখানে আপনি দু-একদিন থাকতে পারেন।'

আমি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললাম, 'ধন্যবাদ। আপনার অনুগ্রহের কথা চিরদিন মনে থাকবে।'

রেলওয়ে কোয়ার্টাসের মধ্যেই মেস। রেলের দশ-বারোজন কর্মচারী এখানে খায়।

আমি মেসের একটা ঘরে বিছানাপত্র রেখে পাতকুয়ায় স্নান করে আহারাদি সমাপ্ত করে একজন রেল কর্মচারীকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এখানে কাছাকাছি কাঠের কোনো ঠিকাদার আছে কিনা।'

তিনি বললেন, 'কাছাকাছি বলতে এখান থেকে দু-মাইল দূরে একজন কাঠ চালান দেবার ঠিকাদার আছেন। কেন, আপনি কি কাঠের ব্যাবসা করেন?'

আমি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাতেই তিনি বললেন, 'তাহলে ওর কাছেই যান। তা হলেই আপনার কাজ মিটে যাবে। তিনি লোকজন নিয়ে জঙ্গলে একপাশে বাংলো তৈরি করে বাস করেন।'

সব শুনে আমি খুশি হলাম। তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করে কলকাতায় ফিরে যাবার উদ্দেশ্যে আমি দুপুরের ঠিকাদারের বাংলোয় যাবার কথা বললাম।

রেল কর্মচারী বললেন, 'এখন গেলে ফিরতে হয়তো সন্ধ্যা হয়ে যাবে। তার চেয়ে আপনি সকালে উঠে যাবেন। এখান আবার চিতাবাঘের ভয় আছে।'

আমি বললাম, 'উপায় নেই আমাকে তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে কলকাতায়, সেজন্যে কাজ মিটিয়ে ফেলতে চাই। আপনি বরং আমাকে পথের সন্ধান বলে দিন।'

তিনি বললেন, 'স্টেশন থেকে বেরিয়ে যে সোজা রাস্তা পাবেন ওই রাস্তায় একমাইল এগিয়ে গেলে দেখবেন রাস্তাটা দু-ভাগ হয়ে গেছে। যেটা বাঁ-দিকে জঙ্গলের দিকে গেছে আপনি সেদিকে গিয়ে দেখবেন একটা কাঠের বাংলো। ওইটাই ঠিকাদারের বাংলো।'

আমি আর অপেক্ষা না-করে টর্চলাইটটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। ঠিকাদারের বাংলোর উদ্দেশ্যে।

চলেছি তো চলেছি। পথ যেন আর শেষ হয় না। শেষে ঠিকাদারের আস্তানায় এসে হাজির হলাম। ভাগ্যের জোরে তিনি তখন বাংলোতেই ছিলেন। ভদ্রলোক বাঙালি নয়। যত্ন করে আমায় বসালেন। চা খাওয়ালেন। তারপর ব্যাবসার কথাবার্তা পাকা করে বেরিয়ে পড়লাম সেখান থেকে। তিনি বাংলোতে থাকতে বলছিলেন।

আমি বললাম, 'ধন্যবাদ। থাকবার উপায় নেই। কলকাতায় ফিরতে হবে। ঠিক সময় মতো যদি স্টেশনে পৌঁছোতে পারি তাহলে রাতের ট্রেনেই কলকাতা রওনা হব।'

এই কথা বলে সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লাম।

প্রায় একমাইল রাস্তা হাঁটার পর হঠাৎ সারা আকাশ ছেয়ে কালো মেঘ ছেয়ে গেল। দু-পাশে জঙ্গল।

সূচীপত্রে যান

টর্চলাইটের ব্যাটারিও প্রায় শেষ। তাড়াতাড়ি নতুন ব্যাটারি নিতে ভুল হয়ে গেছে। ব্যাটারির অল্প আলোতে এগিয়ে চলেছি। হঠাৎ সামনে একটা কালো কুকুর দেখতে পেলাম। চোখ দুটো দপ দপ করে জ্বলছে। আমি বার বার আঁতকে উঠছিলাম। হঠাৎ উঠল হাওয়া আর সেইসঙ্গে বৃষ্টি। কুকুরটা অন্ধকারে মিশে গেল।

আমিও আশ্রয়ের আশায় ছুট দিলাম।

কিছুদূর এসে মনে হল আমি অন্যদিকে এসেছি। এমন সময় বিদ্যুতের আলোয় খানিকটা দূরে দেখা গেল একখানা ঘর।

আমি ছুটলাম সেইদিকে। ঘরের কাছে গিয়ে দেখলাম দরজা খোলা। আমি কোনোকিছু না-ভেবে ভেতরে ঢুকে গেলাম।

টর্চলাইটটা জ্বেলে দেখলাম, ঘরটা বৈঠকখানা বলেই মনে হয়। তবে ঘরের মধ্যে আসবার কিছু নেই। চারদিক ধুলো বালি জমা হয়ে আছে।

ভেতর দিকে একটা দরজা। সেটাও খোলা, সেই দরজা দিয়ে দেখলাম একটা ছোটো উঠোন।

বুঝতে পারলাম ঘরে কেউ থাকে না। যাইহোক আশ্রয় যখন পেয়েছি তখন বৃষ্টি না-থামা পর্যন্ত অপেক্ষা করা যাক। এই ভেবে দরজার পাশে কাঠের মেঝের উপরেই বসে রইলাম।

বৃষ্টি যেন থামতেই চায় না।

যত রাত হয় বৃষ্টি আরও জোরে হয়। টর্চলাইটের আলোতে হাতঘড়িটা দেখলাম তখন রাত একটা।

চুপ করে বসে আছি নিরুপায় হয়ে, হঠাৎ মাথার ওপর ঝটপটানি শব্দ শুনে চমকে উঠে দেখি একটা বাদুড় আমার মাথার উপর ঘুরপাক খাচ্ছে, ঘুরতে ঘুরতে এক কোণে ঝুলে রইল। চোখ দুটো কী ভয়ংকর! যেন আগুনের মতো জ্বলছে।

ভয়ে কাঠ হয়ে বসে রইলাম। ঘরের ভেতর থেকে নানারকম শব্দ। কখনো মনে হল কেউ ঘুরে বেড়াচ্ছে। আবার পরক্ষণেই শোনা গেল বিচিত্র সব শব্দ।

বাদুড়টা ঝটপট করতে করতে আমার মাথার ওপর দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল।

আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

কিছুক্ষণ কেটে গেল, কোনো শব্দ নেই।

এমন সময়ে ঘরের ভেতর থেকে কান্নার শব্দ ভেসে এল।

কান্নার শব্দে চমকে উঠলাম। বুঝলাম কোনো মেয়েছেলে কাঁদছে। ঘরে তাহলে লোকজন আছে। এই ভেবে সাহস পেলাম। একবার ভাবলাম ভেতরে গিয়ে দেখি ব্যাপারটা কী? আবার ভাবলাম কী দরকার পরের ব্যাপারে মাথা গলাবার।

বৃষ্টি অনেকটা কমে এসেছে। কিন্তু কান্নার শব্দ কমেনি।

একঘেয়ে কান্নার শব্দে অসহ্য হয়ে উঠলাম। ভাবলাম স্টেশনে ফিরে যাওয়া উচিত ছিল।

বিরক্ত হয়ে টর্চটা হাতে নিয়ে ভেতরে গেলাম।

সামনের ঘর থেকে কান্নার শব্দ আসছিল। দরজা খোলা ছিল, সাহস করে ঢুকে গেলাম ঘরের মধ্যে। ঘরে লোকজন দূরে কথা একটা আসবাবপত্রও নেই। শুধুমাত্র একটা পুরোনো শাড়ি পড়ে আছে।

টর্চ নিভিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসব আবার কান্নার শব্দ হল। কেউ কোথাও নেই, অথচ কাঁদছে কে?

আমি ঘরের মাঝখানে গিয়ে চেঁচিয়ে বললাম, 'কে কাঁদছ উত্তর দাও!'

সঙ্গে সঙ্গে ঠিক আমার মাথার উপর কে যেন হেসে উঠল। সেই হাসি শুনে বুকের রক্ত যেন জল হয়ে গেল!

আমি ভয়ে বাইরে বেরিয়ে আসার জন্য পা ফেলতেই বন্ধ হয়ে গেল দরজাটা।

আমি ভয়ে কাঠ হয়ে গেলাম, আবার দরজা খুলে গেল।

সূচীপত্রে যান

ঘরের কোণে যেখানে শাড়িটা পড়েছিল সেখানে দেখা গেল একটা অস্পষ্ট নারীমূর্তি! মূর্তিটা নাকি সুরে বললে, 'টর্চ জ্বালিও না। কেন কাঁদছি তাহলে শোনো।'

এই বলে ছায়ামূর্তি বলতে শুরু করল—

'আমি বাঙালি ঘরের মেয়ে। অল্প বয়সে বিধবা হই।

আমার স্বামীর অনেক টাকা পয়সা ছিল। জমিজমাও ছিল প্রচুর। সেই লোভে স্বামীর এক আত্মীয় আমাকে খুন করে কাঠের বাক্স করে আমায় পুঁতে দেয়। সেই থেকে আমি ভূত হয়ে আছি। ভূত হয়ে আমি অনেক কষ্ট পাচ্ছি, আর সহ্য করতে পারছি না, তুমি দয়া করে আমার নামে গয়ায় যদি পিণ্ড দাও!'

'আচ্ছা, আপনি যে মুক্তি পেয়েছেন জানব কী করে?'

ভূতটা বলল, 'তুমি যেখানে পিণ্ড দেবে ফল্গু নদীর ধারে, সেখানে আধ মাইল দূরে দেখবে বালি আছে; তার ওপর দেখবে আমার নাম যেটা তোমায় দিলাম। তাহলে বুঝবে আমার মুক্তি হয়েছে।'

আমি বাধ্য হয়ে বললাম, 'বেশ তাই হবে।'

'তাহলে এটা রাখো, কিন্তু বেইমানি কোরো না। তাহলে আমি তোমার ঘাড় মটকাব।'

সঙ্গে সঙ্গে আমার পকেটে কেউ যেন কী দিল। আমি পকেটে হাত দিতেই মেয়েটি বলল, 'এখানে নয় কাল দেখো। গয়া যাবার খরচ আমার নাম লিখে দিলুম। তুমি ভুল পথে এসেছ। আমি তোমায় পৌঁছে দিচ্ছি।'

আমি একেবারে ঘর থেকে বেরিয়ে রাস্তায়।

স্টেশনের কাছাকাছি একটা জঙ্গল। সেখানে আসতেই ভোর হয়ে এল।

পেছন থেকে মেয়েটি বললে, 'আমি আর যেতে পারব না সকাল হয়ে গেছে।'

তারপর আমি পিছন ফিরে দেখি, একটা নরকঙ্কাল যাচ্ছে। কী ভয়ঙ্কর দেখতে! আমার সারাদেহ তখন কাঁপছে। ওঃ এরই সঙ্গে আমি কাল সারারাত একটা নোংরা বাড়িতে বন্দি ছিলাম!

স্টেশনে ফিরে এসে দেখলাম এক টুকরো নাম লেখা কাগজ ও একটা সোনার হার।

কলকাতায় ফিরে সেটা বিক্রি করে গয়ায় পিণ্ড দিয়ে এসেছিলাম।

সূচীপত্রে যান

রাত্রি নিশীথে

চামেলি বউদি ছাড়লেন না বললেন, 'তুমি আমার সঙ্গে চলো। ঘাটশিলার জল বিখ্যাত। পনেরো দিনে তোমার শরীর ফিরে যাবে।'

কোথাও একটু যাবার প্রয়োজনবোধ করছিলাম। কলকাতার ভিড়, ধোঁয়া, ধুলো প্রায় দুঃসহ হয়ে উঠেছিল।

ভাবলাম দিন কতক বাইরে ঘুরে আসি। ঘাটশিলায় মুকুলের বাড়ি আছে। চামেলি বউদি মুকুলের স্ত্রী। অনেক সময় দেখা যায় আত্মীয়দের চেয়েও অনাত্মীয়রা বেশি ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে।

কিন্তু ঘাটশিলায় গিয়ে এত অভিজ্ঞতা হবে ভাবতেও পারিনি।

একেবারে পরিপূর্ণ বিশ্রাম। সম্পাদকের কিংবা পরিবেশকদের তাগাদা নেই। খুব ভোরে মুকুলের সঙ্গে ফুলডুংরির পথ ধরে বেড়িয়ে আসি। বিকালে মোটরে কোনোদিন টির্কার কিংবা মশাবনীর দিকে।

একদিন রাত তখন এগারোটা, ভাড়াটেরা সবাই চলে গেছে, আমি আর মুকুল উঠব উঠব করছি, চামেলি বউদি রান্নাঘরে আমাদের রাতের আহারের তদারকিতে ব্যস্ত, সেই সময় সামন্ত এসে দাঁড়ালেন। অধ্যাপক সামন্ত রঘুনাথপুর কলেজে রসায়ন পড়ান। স্থির, নির্বিকার মানুষ। আমাদের অনেক আড্ডায় যোগ দেন না। স্ত্রী পুত্র কন্যা নিয়ে বেড়াতে যান। মুকুল জিজ্ঞাসা করল, 'কিছু বলবেন প্রফেসর সামন্ত?'

ভাবলাম হয়তো বাড়ি সম্বন্ধে সামন্ত কোনো অভিযোগ পেশ করবেন, তাই আমি উঠে দাঁড়ালাম।

সামন্ত হাত নেড়ে আমাকে বাধা দিলেন। বললেন, 'আপনিও থাকুন, আপনারও শোনা দরকার।'

অগত্যা আবার চেয়ারে বসে পড়লাম।

'ব্যাপারটা তিনদিন যাবৎ হচ্ছে, কিন্তু আমি সাহস করে আপনাদের বলতে পারছি না।'

মুকুল খুব নিরীহ মানুষ, স্থিতধী। খুব সহজে বিচলিত বা বিগলিত কোনোটাই হয় না। সে শুধু জিজ্ঞাসা করল, 'ব্যাপারটা কী?' উত্তরে সামন্ত পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছলেন।

এবার লক্ষ করলাম সামন্তর মুখ পাংশু, নীরক্ত, ভয়ার্ত।

একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে বললেন, 'দিন তিনেক ঠিক রাত দেড়টার সময় আওয়াজটা শুনছি। জানলার ওপাশে উঠানের উপর ঘুঙুর পায়ে কে যেন নাচছে, ঝুন, ঝুন, ঝুন। ভাগ্যে আমার স্ত্রীর ঘুম খুব গাঢ়। এসব আওয়াজ তার কানে যায় না, না হলে এখানে বাস করা দুষ্কর হত।'

আমি হাসলাম, 'আপনি বিজ্ঞানের অধ্যাপক হয়ে শেষকালে এমন একটা ভূতের গল্প ফাঁদলেন।'

সামন্ত কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে দেখলেন তারপর গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'আপনার কি মনে হয় বিজ্ঞান পৃথিবীর শেষ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে? সমাধান করতে পারে সব রহস্যের?'

আমি উত্তর দিলাম, 'সে তো কোনো কালেই পারে না, কিন্তু আপনি কোনোদিন জানলা দিয়ে বাইরে দেখার চেষ্টা করেছেন?'

'না করিনি। আমার মনে হয় সেই ঝুন ঝুন শব্দ শুনলে আপনারও বিছানা থেকে ওঠবার সাহস হত না।'

আমি উঠে দাঁড়ালাম। 'যদি সাহস করে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেন, দেখতে পেতেন একটা কালো বেড়ালের গলায় ছোটো ঘণ্টা বাঁধা। তার লাফালাফির সঙ্গে ওইরকম ঝুন ঝুন শব্দ হচ্ছে।'

কথাটা বলে আমি সোজা বাড়ির মধ্যে চলে এসেছিলাম।

চামেলি বউদি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার দাদা কোথায়?'

বললাম, 'ভূতের গল্প শুনছে।'

'ভূতের গল্প? কার কাছে?'

সূচীপত্রে যান

'প্রফেসর সামন্ত বলছেন।'

চামেলি বউদি শুধু বললেন, 'ওঁরা দশ নম্বরে আছেন না?'

বলেই তিনি চুপ করে গেলেন।

একটু পরে মুকুল খাবার টেবিলে এসে বসল। তার মুখ রীতিমতো গম্ভীর।

'কীহে, ভূতের গল্প শুনলে।'

'হুঁ।' মুকুল গলা খাদে নামিয়ে ছোট্ট করে উত্তর দিল।

খাওয়া শেষ করে মুকুল আর আমি ওপরে উঠে এলাম। বিছানায় যাবার আগে আমরা কিছুক্ষণ বারান্দায় বসে থাকি।

বারান্দা অন্ধকার। কেউ কারুর মুখ দেখতে পাচ্ছি না।

মুকুলের গলা শুনতে পেলাম। 'আজ একটু জেগে থেকো।'

'জেগে থাকব? কেন?'

'রাত দেড়টা নাগাদ প্রফেসর সামন্ত আমাদের ডাকতে পারেন।'

আশ্চর্য হলাম, 'কী ব্যাপার বলোতো মুকুল? কিছু রহস্য তুমি যেন চেপে যাচ্ছ বলে মনে হচ্ছে। সামন্তর গল্পে বিশ্বাস করে তুমি কি রাতের ঘুমটা নষ্ট করতে চাও?'

মুকুল কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। যখন মনে হল সে আর কিছু বলবে না, এবার শুতে যাবে, তখন তার কণ্ঠ ভেসে এল।

'দশ নম্বরটা আমি সচরাচর ভাড়া দিই না। এ বছর চেঞ্জার এত বেশি এসেছে, আর প্রফেসর সামন্ত কোনো খবর না-দিয়ে বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে যেভাবে হাজির হয়ে পড়লেন, কাকুতিমিনতি করতে লাগলেন যে একমাত্র খালি বাড়ি ওই দশ নম্বর ওটাই ওঁকে দিতে হল।'

এবার আমি চেয়ার ঠেলে মুকুলের কাছাকাছি চলে গেলাম।

চাপা গলায় বললাম, 'এভাবে আর উৎকণ্ঠিত রেখো না। ব্যাপারটা বলেই ফ্যালো।'

মুকুল কিছুক্ষণ নিশ্চুপ হয়ে বসে রইল। তারপর যেন স্বগতোক্তি করছে এমনভাবেই ক্ষীণ অথচ স্পষ্ট স্বরে শুরু করল—

'ছোটোবেলা থেকেই আমি রাজা-বাদশাদের প্রাসাদ-মহল এসব জায়গায় ঘুরতে যেতে বেশি পছন্দ করতাম। বড়ো হয়ে কর্মজগতে প্রবেশ করলেও অভ্যাসটা রয়ে গিয়েছিল। একদিন হঠাৎই ঘাটশিলার নবাবের এই পরিত্যক্ত বাড়িটি বিক্রি হওয়ার খবর কানে এল। এমন খবরে যে আমি আকৃষ্ট হব সেটা বলাই বাহুল্য। খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারলাম আর্থিক দূরবস্থার কারণে বর্তমান মালিক বাড়িটি বিক্রি করতে চায়। কিন্তু চাইলেই তো হল না। খরিদ্দার কোথায়? সবায়েরই ধারণা ওটা ভূতুড়ে বাড়ি। তাই কেনার জন্য অনেকে এগিয়ে এলেও শেষপর্যন্ত পিছু হঠল।

এমন একটা সুযোগের অপেক্ষাতেই আমি ছিলাম। কিনে নিলাম; প্রায় বলতে পারো জলের দরেই বাড়িটা কিনে নিলাম। অবশ্য সিদ্ধান্তটা তাড়াতাড়ি নেবার পিছনে অন্য আর একটা কারণও ছিল। এই ঘাটশিলায় জল-হাওয়ার গুণে মানুষের স্বাস্থ্য ফিরে যায়— এমন একটা কথা চালু থাকায় ফি বছর বহু মানুষ এখানে আসে। তাই যদি একটা বোর্ডিং খুলতে পারি তাহলে রোজগারের আর ভাবনা কী!

যাইহোক, তখন কিছুদিন হল বিয়ে করেছি। আগে একদিন আমি এসে বাড়ি পরিষ্কার ও মেরামতি করিয়ে সস্ত্রীক এখানে চলে এলাম। বাড়ি দেখে তোমার বউদি ভীষণ খুশি। তিনতলা বাড়ি। দেওয়ালগুলোতে পর্যন্ত নানা কারুকার্য করা, লতাপাতার নানা নকশা আঁকা। বাড়ির সামনে উঠোনের মতো অনেকটা ফাঁকা জায়গা। তার একদিকে একটা কুয়ো। চারিদিকে গাছপালা, নিরিবিলি পরিবেশ।

যেদিন আমি এখানে প্রথম এসেছিলাম, সেদিন এখানকার বাজারে একজনের সঙ্গে পরিচয় হয়। নাম আমজাদ আলি। স্থানীয় লোক। মাঝবয়সি, মিডিয়াম হাইট, রোগাটে গড়ন। পেশায় দর্জি। কথা প্রসঙ্গে আমি

সূচীপত্রে যান

নবাব বাড়ি কিনেছি শুনে প্রথম কিছুক্ষণ আমার দিকে কেমন একটা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল। তারপর শুধু বলল, 'একটু সাবধানে থাকবেন, বাড়িটার বদনাম আছে।' আমি কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। সে কোনো উত্তর না-দিয়ে হনহন করে চলে গেল।

আমি ব্যাপারটি নিয়ে একটু চিন্তায় থাকলেও এখানে এসে যখন সবকিছু স্বাভাবিক চলতে থাকল তখন ও বিষয়টা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেললাম।

কিছুদিন পর তোমার বউদি বাপের বাড়ি কলকাতায় চলে গেল। আমি একা। সারাদিন টুকিটাকি কাজ করার পর সন্ধ্যে নেমে এল। আর দিন-দুই পরেই অমাবস্যা। তাই এই সন্ধ্যে বেলাও চারিদিক গাঢ় অন্ধকারে ঢেকে গেছে। গরমকাল। ভাবলাম আজ দোতলার ওদিকের ওই ধারের ঘরটাই শোব। কারণ ওদিকে জানালা থেকে ঠান্ডা হাওয়া আসে। রাতের খাওয়া সেরে রাত্রি দশটার দিকে শুয়ে পড়লাম।

মাঝরাতে হঠাৎ একটা আওয়াজে ঘুমটা ভেঙে গেল। ভালো করে কান পাতলাম আওয়াজটা কী শোনার জন্য। মনে হল কোনো মেয়ে পায়ে ঘুঙুর পরে গানের তালে তালে নেচে বেড়াচ্ছে। রাত্রির নিস্তব্ধতায় ঝিঁঝি পোকার ডাক ছাড়িয়ে সে শব্দ স্পষ্ট হয়ে উঠল। আমি ভীতু এমন অপবাদ কেউ কখনো দিতে পারবে না। কিন্তু ওই জনমানবহীন পরিবেশে ওই আওয়াজ একটা ভয়ের আবহ তৈরি করল। চুপ করে শুনতে শুনতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি, সকালের পাখির ডাকে ঘুম ভাঙল।

ঘুম ভেঙে সকালের ঝলমলে পরিবেশ দেখে রাত্রির ঘটনাটি দুঃস্বপ্ন মনে হল। সবকিছু মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিলাম। কিন্তু সেদিন রাতেও একই ঘটনা ঘটল। পরদিন সকালে উঠে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম আজ যদি এমন ঘটনা ঘটে জানলা দিয়ে দেখব, কপালে যা আছে হবে।

সেদিন ছিল অমাবস্যা। একে ঘোর কালো রাত, তায় আকাশ কালো মেঘে আচ্ছন্ন। যে কোনো সময় বৃষ্টি নামবে। চারিদিকে গুমোট পরিবেশ। হাওয়া না থাকায় ঘুমও আসছিল না। ঝিঁঝির আওয়াজ রাত্রির নিস্তব্ধতাকে ভেঙে খানখান করে দিচ্ছিল।

রাত্রি আন্দাজ দেড়টা হবে। আবার সেই শব্দ শুনলাম। আজকে শব্দটা যেন আরও কাছে, আরও স্পষ্ট। আমি সাহসে ভর করে বিছানা থেকে উঠে খোলা জানলার কাছে গিয়ে বাইরের দিকে তাকালাম। রাত্রির কালো অন্ধকারেও স্পষ্ট দেখলাম— একটি তরুণী পরনে বাইজিদের পোশাক; খোঁপা-বাঁধা চুল, পায়ে ঘুঙুর পরে ঝুনঝুন শব্দে ছন্দে ছন্দে সারা উঠোন জুড়ে নেচে বেড়াচ্ছে।

আমার সারা শরীর জুড়ে বিদ্যুৎ খেলে গেল। মেরুদণ্ড বেয়ে শীতল স্রোত নেমে গেল। পা দুটো যেন কোনো অদৃশ্য শক্তি আটকে রেখেছে। চলার শক্তি লোপ পেয়েছে।

একটু পরেই নাচতে নাচতে তরুণী উঠানের একপাশে চলে গেল। তারপর আর তাকে দেখা গেল না।

আমি জানতাম উঠানের ওইপাশে একটা কুয়া ছিল। সে কুয়া বহুদিন কেউ ব্যবহার করত না। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আমি ফিরে এসে শুলাম।

সারা রাত আর ঘুম এল না। একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হবার সঙ্গে সঙ্গে কানে শব্দ ভেসে এল, ঝুন, ঝুন, ঝুন।

তারপর ওখানে আর শোবার সাহস হয়নি। অর্ধনিমীলিত ওই বসতবাড়ির একতলাতেই রাত কাটাতে হল।

তোমার বউদি বাপের বাড়ি থেকে কয়েক দিন পর ফিরে এল। কিন্তু ভয় পাবে ভেবে কথাটা আর তাকে বলিনি।

জানতাম, অন্য কাউকে বললেও এই উদ্ভট কাহিনি কেউ বিশ্বাস করবে না।

এর দিন কয়েক পরেই আমজাদ আলির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। হাটে।

তাকে বললাম, 'আলি, তোমার সঙ্গে দরকারি কথা আছে। একবার সময় করে দেখা করতে পারবে?'

আমজাদ আলি মোলায়েম করে উত্তর দিল, 'কোথায় দেখা করতে হবে বলুন মালেক!'

'আজ বিকেলে আমার ডেরায় এসো। একসঙ্গে চা খাওয়া যাবে।'

'ঠিক আছে সরকার, যাব।'

সূচীপত্রে যান

বিকালে চা জলখাবার খাওয়ার পর কথাটা পাড়লাম।

প্রথমে আমজাদ কিছু না জানার ভান করল। আমি অযথা ভয় পেয়েছি সে কথাও বলল, তারপর আমি চেপে ধরলাম।

'আমি একটি কাহিনি আব্বাজনের কাছে শুনেছিলাম। কিন্তু সেটা কতদূর সত্যি জানি না।'

'বেশ কী শুনেছ বলো।'

আমজাদ কাহিনি শুরু করল—

'যে মেয়েটি নাচে সে বেনারসের মুন্নাবাই। যেমন চমকদার চেহারা, তেমনই ময়ূরের মতন নাচে। তখন এ এলাকার নবাব ছিলেন মহিউদ্দিন। দোর্দণ্ড প্রতাপ। সকলের হাতে মাথা কাটেন। দিনের বেলা ঘোড়ার পিঠে চরকি ঘুরতেন, অন্ধকার নামলেই অন্য অবস্থা। শরাব চাই, বাইজি চাই— চারপাশে চাই মোসায়েবের দল।

মুন্নাবাইয়ের তখন খুব নাম। কিছুটা বয়স হয়েছে বটে, কিন্তু দেহে একটুও মেদের সঞ্চার হয়নি। বেতের মতন ছিপছিপে গড়ন।

তবে যেখানে-সেখানে মুজরা নেয় না। খুব রহিস আদমির কাছ থেকে ডাক না-এলে মুন্নাবাই ফিরিয়ে দেয়।

মহিউদ্দিনের খেয়াল হল মুন্নাবাইকে আনবেন। টাকা কোনো প্রশ্ন নয়, স্ফূর্তিটাই আসল।

মুন্নাবাইও মহিউদ্দিনের নাম শুনেছিল। তাঁর আভিজাত্য, প্রতিপত্তি, কৌলিন্য।

শুনে বলেছিল, এক রাতের বেশি থাকতে পারবে না। মহিউদ্দিন তাতেই রাজি। সুধা বেশি পান করা অনুচিত।

তখন ট্রেনের যুগ নয়। আসতেও বেশ সময় লাগত। কিছুটা বজরায়, বাকিটা পালকিতে। মহিউদ্দিন নিজে মুন্নাবাইকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে এলেন। বাইমহলে থাকতে দিলেন।

একটা রাতের ব্যাপার। পরের দিন সকালেই মুন্নাবাই ফিরে যাবে। ফৈজাবাদে মুজরা আছে।

রাত্রে নাচের ব্যবস্থা হল। সে এক এলাহি কাণ্ড!

মুন্নাবাইয়ের সঙ্গে সারেঙ্গিবাদক আর তবলচি এসেছে।

মুন্নাবাই ঘণ্টা দুয়েক নাচবে। রাত বারোটা থেকে দুটো।

মোসায়েবের দল দশটা থেকে আসরে এসে জমল। মহিউদ্দিন সায়েব এলেন বারোটা বাজবার ঠিক দশ মিনিট আগে।

বারোটায় মুন্নাবাই কুর্নিশ করে এসে দাঁড়াল। অনুমতি পেলেই নাচ শুরু করবে।

তখন মুন্নাবাইয়ের বয়সের অপরাহ্ন। কিন্তু কোথাও মাংস একটু কোঁচকায়নি। স্বর্ণাভবর্ণ একটুও তামাটে নয়। খোঁপা বাঁধা, চুল খুলে দিলে নিতম্ব স্পর্শ করত। দেখতে একেবারে তরুণী।

নাচ শুরু হল। অপূর্ব নাকি সেই নাচ! নাচ নয়— যেন নিবেদন। নিজেকে কলালক্ষ্মীর দরবারে নিবেদন করছে মুন্নাবাই।

মহিউদ্দিন সাবাস বলতেই মোসায়েবের দল সমস্বরে বলে উঠল, 'কেয়াবাত, কেয়াবাত!' সকলের আওয়াজ ছাপিয়ে একটি কিশোর কণ্ঠ শোনা গেল, 'বেহস্ত কা হুরি!'

মনে হল মুন্নাবাই যেন চমকে উঠল। ঘাড় ফিরিয়ে একবার কিশোরকে দেখবার চেষ্টা করল। বুঝি দেখলও। মুহূর্তের জন্য সারা মুখ আরক্ত হয়ে উঠল।

তারপর থেকেই নাচের জোর যেন কমে এল। দু-একবার ছন্দপতন ঘটল। বিরক্তিতে তবলচি ভ্রূ কোঁচকাল।

মুন্নাবাই সামলে নিল, কিন্তু পুরোপুরি নয়। বার বার কিশোরের দিকে দৃষ্টিপাত করতে লাগল। তারপর অদ্ভুত এক কাণ্ড করল। নাচতে নাচতে খোলা দরজা দিয়ে বাইরে বের হয়ে গেল উঠানে।

তারপর ঝুপ করে একটা শব্দ। ক্ষীণ আর্তনাদ বাতাসে মিশে গেল।

সূচীপত্রে যান

মহিউদ্দিন সাঙ্গোপাঙ্গা নিয়ে ছুটে বাইরে এলেন।

ঘন অন্ধকার। আলো জ্বালালেন। সেই আলোয় খুঁজতে খুঁজতে সবাই দেখল কুয়ার মধ্যে মুন্নাবাই পড়ে আছে। বহু কষ্টে তার দেহ ওপরে ওঠানো হল। প্রাণহীন দেহ। ঘাড়টা মটকে গিয়ে চাপ চাপ রক্ত জমে আছে। সারা মুখে যন্ত্রণার ছাপ!

সেই থেকে প্রতি অমাবস্যতেই দিন তিনেক মুন্নাবাইয়ের ঘুঙুরের শব্দ ভেসে আসে।

সামনের পেয়ারা গাছটায় রোজকার মতন প্যাঁচাটা এসে বসেছে। হঠাৎ সেটা ডেকে উঠল, হুম, হুম, হুম!

মেরুদণ্ড বেয়ে ভয়ের স্রোত বয়ে গেল। মনে হল এই পরিবেশে সাহস, যুক্তি সবকিছু নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আদিম সংস্কার, পুরোনো চিন্তাধারা মাথা তুলে দাঁড়াবার চেষ্টা করে।

লক্ষ করিনি, খাওয়া সেরে কখন চামেলি বউদি পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন।

মুকুল চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'অনেক রাত হয়েছে শুয়ে পড়ো। আবার প্রফেসর সামন্ত হয়তো ডাকতে আসবেন।'

আমি ব্যাকুলকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলাম, 'একটা কথা মুকুল বলো। ওই কিশোরটি মুন্নাবাইয়ের কে?'

'ছেলে, আমজাদ বলেছিল, ছেলেটি নাকি হারিয়ে গিয়েছিল। তারপর ভাসতে ভাসতে নানা ঘাটের জল খেয়ে মহিউদ্দিনের কাছে এসেছিল। কুসঙ্গে পড়ে ছেলেটির সার পদার্থ ছিল না।'

আবার প্রশ্ন করলাম, 'বোঝা যাচ্ছে মুন্নাবাই আত্মহত্যা করেছিল।'

'সেটাই সম্ভব। মার নাচের আসরে ছেলের বাহবা— এটা সহ্য করা তার মনে কঠিন হয়েছিল।'

আর কোনো কথা হল না। আমি শুতে চলে এলাম।

শুলাম বটে, কিন্তু ঘুম এল না। চোখ বন্ধ করলেই মনে হয় মুন্নাবাইয়ের নাচের আসর চলেছে। অপরূপ ছন্দে বাইজি নেচে চলেছে। তারপর একটা শব্দ, একটা আর্তনাদ, কিন্তু মুন্নাবাইয়ের অতৃপ্ত আত্মা এখনও ঘুরে বেড়াচ্ছে কীসের আশায়?

মাথার কাছে টর্চ আর লাঠি নিয়ে শুয়েছিলাম।

রাত্রে জেগেই ছিলাম। প্রফেসর সামন্ত ডাকতে আসবেন।

সাহস করে জানলা দিয়ে বাইরের অন্ধকারে চোখ বোলালাম। কয়েক বছর আগে মুকুল যে দৃশ্য দেখেছিল, তাও দেখব।

খুব বেলায় মুকুলের ডাকে ঘুম ভাঙল। তাড়াতাড়ি উঠে বসলাম। চারদিকে রোদে ভরে গেছে। মুকুল মুখ টিপে হাসল।

'কিহে, তোমার না জেগে থাকবার কথা।'

লজ্জা-জড়ানো কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলাম, 'প্রফেসর সামন্ত ডাকতে এসেছিলেন নাকি? আমি রাতে কিন্তু জেগে ছিলাম। ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছি।'

মুকুল মাথা নাড়ল, 'না আসেননি। উনি যে আসবেন না সেটা আমি জানতাম। অমাবস্যা থেকে তিনদিন ওই শব্দ শোনা যায়।'

দিন তিনেক কাটল। ইতিমধ্যে প্রফেসর সামন্ত চলে গিয়েছেন তাঁর বাড়িতে পূজা। পূজার সময় বাড়িতে যান।

সপ্তমীর দিন লনে চেয়ার পেতে চুপচাপ বসেছিলাম।

মুকুল আর চামেলি বউদি মৌভাণ্ডার গেছেন পূজা দেখতে। সব চেঞ্জাররাই নানা পূজামণ্ডপে চলে গেছে। তাই যেন খালি।

আমাকে মুকুল সঙ্গে যেতে বলেছিল। আমি রাজি হইনি।

পূজার হইচই, গোলমাল এড়াবার জন্যই কলকাতা ছেড়েছি। সেইজন্যই আওয়াজের মধ্যে যেতে আর ইচ্ছা করল না।

সূচীপত্রে যান

হঠাৎ ঝুপ করে চারিদিকে অন্ধকার হয়ে গেল। লোডশেডিং। ঘাটশিলায় নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার।

চুপচাপ বসে রইলাম। অন্ধকার সূচিভেদ্য।

লনের গাছপালাগুলোকে আলাদা করে চেনার উপায় রইল না।

ঝুন, ঝুন, ঝুন। আওয়াজটা কানে যেতেই চমকে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। মনে হল খুব কাছে মুন্নাবাইয়ের ঘুঙুরের একটানা শব্দ।

আশ্চর্য লাগল। অমাবস্যা পার হয়ে গেছে। এখন তো মুন্নাবাইয়ের নাচের আসর বসবার কথা না।

অস্বীকার করব না। সারা শরীর ভিজে গেছে। তালু শুকিয়ে কাঠ। চিৎকার করে কাউকে যে ডাকব এমন শক্তিও নেই।

অথচ ঘুঙুরের শব্দের বিরতি নেই। হঠাৎ মনে পড়ে গেল গেটে রমেশ রয়েছে। এ দেশের আদিবাসী ছোকরা। তার কাজ গেট পাহারা দেওয়া।

ছুটে গেটের দিকে চলে গেলাম। 'রমেশ, একটু এদিকে এসো!'

আমার নিজের কণ্ঠস্বর নিজের কানেই অদ্ভুত শোনাল। বিকৃত ভীত স্বর।

আমার অবস্থা দেখে রমেশও বোধ হয় একটু আশ্চর্য হয়ে থাকবে।

টর্চ আর লাঠি নিয়ে আমার পিছন পিছন এল।

তখনও অবিশ্রান্ত বেজে চলেছে, ঝুন, ঝুন, ঝুন। রমেশকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ওটা কীসের আওয়াজ বলোতো?'

কান পেতে একটু শুনে রমেশ হেসে উঠল, খুব জোরে।

'কী হল?'

'পোকার ডাক বাবু। আমাদের এখানে বলে মাতরু পোকা। পুজোর আগে আমদানি হয়, থাকবে লক্ষ্মীপূজা পর্যন্ত। এ পোকাটা নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। ওদিকের উঠানে, এই ঝোপঝাড়ে, মাঝে মাঝে সিঁড়ির তলায়। দেখবেন—'

রমেশ লাঠি নিয়ে এগিয়ে গেল। জানলার পাশে একটা কামিনী ফুলের ঝাড়। সেই গাছে বার কয়েক জোরে জোরে লাঠি ঠুকতেই আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেল।

রমেশ হেসে বলল, 'এমন মজার শব্দবাবু, ঠিক মনে হয় মেয়েছেলে ঘুঙুর বাজিয়ে চলেছে।'

আমি একটা কথাও বলতে পারলাম না। মুকুল সব জেনেশুনেই তাহলে অলৌকিক এক কাহিনির অবতারণা করেছে। অধ্যাপক সামন্তকেও সম্ভবত ব্যাপারটা বলেছে। চামেলি বৌদিরও ষড়যন্ত্রে অংশ ছিল।

নিজেকে খুব বোকা মনে হল। চুপচাপ বসে আলো জ্বলে ওঠার অপেক্ষা করতে লাগলাম। তা হলেই অন্ধকার কেটে যাবে।

সূচীপত্রে যান

টান

ভূত আছে কি নেই এ তর্ক বহুদিনের। ভগবানের অস্তিত্ব নিয়েও এ ধরনের তর্ক আদিম যুগ থেকে চলে আসছে। দুটো তর্কেরই আজও কোনোরকম নিষ্পত্তি হয়নি, আর হবে কিনা তাও বলা যায় না।

বিজ্ঞানের যুগে তোমরা হয়তো এসব মানতে চাইবে না এবং এটাই স্বাভাবিক।

অণুবীক্ষণ আর দূরবীক্ষণ যন্ত্র নিয়ে যা দেখা যায় না, তার অস্তিত্বই নেই— এই তোমাদের হচ্ছে মত।

ভূতের কথা তোমাদের মতো এতদিন আমিও বিশ্বাস করতাম না। অনেক জায়গায় ভূত দেখার আমন্ত্রণও পেয়েছি। পোড়ো বাড়িতে রাত কাটিয়েছি, ঘোর অমাবস্যায় শ্মশানে ঘোরাফেরা করেছি— কিছু কিছু চামচিকে আর শেয়াল ছাড়া আর কিছু নজরে পড়েনি।

ভূত সম্বন্ধে ঘোরতর অবিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলাম, এমন সময় এই ব্যাপারটা ঘটল, যা আজকে তোমাদের কাছে বলতে বসেছি।

ঠিক আমাদের পাশের বস্তিতে থাকে সমর রায়। ছেলেটি দেখতে যেমন সুন্দর, লেখাপড়াতেও তেমনই উৎসাহী। বি. এ. পরীক্ষা দেবার আগে মাঝে মাঝে আমার কাছে পড়তে আসত। সেই সময়ে তার বিদ্যাবুদ্ধির পরখ করার সুযোগ মিলেছিল। তা ছাড়া একেবারে পাশের বস্তিতে থাকত, কাজেই খুব ছোট্টবেলা থেকেই তাকে দেখেছি।

ইদানীং অনেক দিন সমরের সঙ্গে দেখা আর হয়নি। আমরা শুনেছিলাম পরীক্ষার পর বাইরে কোথায় বেড়াতে গেছে।

এক সন্ধ্যায় ঘরে বসে একটা বই পড়ছি। বাইরে ঝড়ের আভাস। জানলা, দরজার পর্দাগুলো দমকা বাতাসে উড়ছে; দু-এক ফোঁটা বৃষ্টি যেন গায়ে এসে পড়ল, কিন্তু বইটা এত ভালো লাগছিল যে, উঠে জানলাগুলো বন্ধ করতেও ইচ্ছে করছিল না।

এমন সময় হঠাৎ সশব্দে দরজাটা খুলে গেল। ভাবলাম ঝড়। চোখ ফিরিয়েই কিন্তু অবাক হলাম। সমর এসে দাঁড়িয়েছে উশকোখুশকো চুল, পাংশু মুখ।

'কী সমর, কবে ফিরলে?' বইটা মুড়ে প্রশ্ন করলাম।

সমর কৌচে আমার পাশে এসে বলল, 'এই একটু আগে। জামাকাপড় ছেড়েই আপনার কাছে চলে এসেছি। আপনাদের খবর ভালো তো?'

বললাম, 'হ্যাঁ ভালো, কিন্তু কি ব্যাপার? জরুরি কোনো কথা আছে নাকি?'

ওর হাবভাব দেখে আমার মনে হল সমরের বোধ হয় জরুরি কোনো কথা বলার আছে।

'আপনার সময় হবে কখন? আপনার সঙ্গে আমার কথা ছিল একটু।'

হাসলাম। বললাম, 'অফুরন্ত সময়। বলো কী তোমার কথা আছে বলার?'

'মৃত্যুর পরে মানুষ শেষ হয়ে যায় না, মাস্টারমশাই। ভূত বলুন, আত্মা বলুন, তারা আছে। মাঝে মাঝে তারা দেখা দেয় শুনেছি। আচ্ছা, এটা কি ঠিক?'

এ প্রশ্ন হাজার বার হাজার জায়গায় শুনেছি। বুঝলাম কোনো কারণে সমর খুব উত্তেজিত হয়েছে। অনেকেরই রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়। অন্ধকারে গাছপালা দেখে ভূত-প্রেত কল্পনা করে, কিংবা বদমাশ লোকের প্রতারণায় ভুলে মনে করে অশরীরী কিছু-একটা দেখেছে। সোজাসুজি উত্তর না-দিয়ে বললাম, 'কী বলতে চাইছ সেটাই তুমি সহজ করে বলো।'

সূচীপত্রে যান

সমর কোঁচার খুঁট দিয়ে মুখ আর কপাল মুছে নিল। তারপর একটু দম নিয়ে আবার বলতে আরম্ভ করল —

'লখনউতে আমার এক পিসি আছে জানেন বোধ হয়?'

'হ্যাঁ, তোমার কাছেই শুনেছি। তিনি কোনো এক স্কুলের শিক্ষিকা তাই না?'

সমর ঘাড় নাড়ল, 'পিসি বৈদ্যনাথ শিক্ষাসদনে পড়ান। তিনি অনেকদিন ধরে তাঁর কাছে আমাকে যেতে লিখেছেন, কিন্তু একটার-পর-একটা ঝঞ্ঝাটের পর ভাবলাম, এখন তো প্রচুর অবসর, এইবার ঘুরে আসা যাক কিছুদিন। তাই মাস খানেক আগে দেরাদুন এক্সপ্রেসে রওনা হয়ে গেলাম লখনউ।'

'তোমার বাবার কাছে শুনেছি।' আমি কৌচের ওপর পা দুটো তুলে ভালো করে বসলাম।

'আপনি শুনলে হাসবেন, এই জীবনে আমার প্রথম রেলযাত্রা। কাজেই কৌতূহলের অন্ত ছিল না। প্রত্যেক স্টেশনে ট্রেন থামলেই আমিও নেমে প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করতে আরম্ভ করি। গার্ডের হুইসেলের সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসে কামরায় উঠি। কিন্তু একটা স্টেশনে বিপদ ঘটল।'

আমি সোজা হয়ে বসলাম। বললাম, 'কি— ট্রেন ছেড়ে দিলে তো? তুমি আর সেই ট্রেনে উঠতে পারোনি নিশ্চয়ই!'

সমর আমার প্রশ্নের কোনো উত্তর না-দিয়ে বলতে লাগল, 'এক স্টেশনে নেমে এদিক-ওদিক বেড়াচ্ছি, হঠাৎ দেখলাম— একটি বছর আট-নয়েকের মেয়ে, বেশ ফুটফুটে চেহারা, কোঁকড়ানো চুল, পরনে নীল রঙের একটা ফ্রক। আমাকে হাত নেড়ে ডাকছে।

প্রথমে ভাবলাম, আমারই ভুল হয়েছে। মেয়েটি বোধ হয় অন্য কাউকে ডাকছে। এদিক-ওদিক চেয়ে দেখলাম, না অন্য কেউ তো ধারে-কাছে নেই। মেয়েটিকে বাঙালি বলেই মনে হল আমার। প্ল্যাটফর্মের ওপর বেশিরভাগই অন্য জাতের মানুষজনের জটলা। মেয়েটির সঙ্গে চোখাচোখি হতেই আবার সে হাতছানি দিয়ে ডাকল।

ভাবলাম বিদেশে মেয়েটি নিশ্চয় কোনো বিপদে পড়েছে। আমাকে স্বজাতি দেখে সাহায্য চাইছে।

মেয়েটির দিকে এগিয়ে গেলাম। মেয়েটি দাঁড়িয়ে ছিল, আমি এগোতেই সে চলতে শুরু করল স্টেশনের বিশ্রাম কামরার দিকে। বুঝতে পারলাম, সম্ভবত এই বিশ্রাম কামরায় ওদের কোনো আত্মীয় বা আত্মীয়া বিপদে পড়েছেন কিংবা হঠাৎ অসুস্থ হয়েছেন। কিন্তু না, বিশ্রামকক্ষের সামনে একটু দাঁড়িয়েই ঘাড় ফিরিয়ে আমাকে দেখে আবার হাত নেড়ে ডেকেই আবার এগিয়ে গেল।

ওধারে বকুল গাছ। অজস্র বকুল ঝরে পড়েছে পথের ওপর। পাশে স্টেশনের সীমানায় রেলিং, মেয়েটি সেখানে দাঁড়াল।

আমি জোরে জোরে হেঁটে মেয়েটির কাছে এগিয়ে গেলাম। আর ঠিক সেইসময়—'

আমি আর উৎকণ্ঠা চেপে রাখতে পারলাম না। জিজ্ঞেস করলাম, 'কী হল?'

'হুইসিল দিয়ে ট্রেন ছেড়ে দিল, এদিকে চেয়ে দেখি মেয়েটি উধাও! এক নিমেষে যেন মুছে গেল। আমি ট্রেনের দিকে ছুটলাম, কিন্তু ধরতে পারলাম না। দুরন্ত গতিতে ট্রেন যেন আমার চেষ্টাকে উপহাস করতে করতে বেরিয়ে গেল।'

এতক্ষণ পর আমি হাসলাম। 'এই তোমার ভৌতিক গল্প। মেয়েটি তোমায় বোকা বানিয়ে সরে পড়েছে। বয়স কম হলে হবে কী, মেয়েটি বেশ ওস্তাদ মনে হচ্ছে।'

সমর আমার হাসিতে যোগ দিল না, গম্ভীর গলায় বলল, 'আমার কাহিনি এখানে শেষ হয়নি মাস্টারমশাই।'

আমি একটু অপ্রস্তুত হলাম, বললাম, 'বেশ বলে যাও।'

'আমি স্টেশন মাস্টারের সঙ্গে দেখা করে ট্রেন ফেল করার কথা বললাম। তিনি পরের স্টেশনে ফোন করে দিলেন, যাতে তারা আমার বিছানা আর সুটকেশটা নামিয়ে রাখতে পারে। এর পরের ট্রেন রাত সাড়ে ন-টায়।

সূচীপত্রে যান

হাতে অঢেল সময়। সমস্ত বিশ্রাম কক্ষগুলো তন্নতন্ন করে খুঁজলাম। কয়েক জন দেহাতী যাত্রী বসে আছে। মেয়েটি কোথাও নেই। স্টেশনের বাইরে এসে কয়েকটা টাঙ্গাওয়ালাকে মেয়েটির কথা জিজ্ঞেস করলাম। তারা কেউ কিছু বলতে পারল না।

আশ্চর্য লাগল চোখের সামনে থেকে মেয়েটি কী করে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল! এমন সুন্দর দিনের আলোয় সে সরে যেতে পারে!

আশ্চর্য হবার আমার আরও বাকি ছিল। রাত সাড়ে সাতটা নাগাদ সারা স্টেশনে হইচই। সবাই খুব ব্যস্ত। গিয়ে খবর নিয়েই চমকে উঠলাম। দেরাদুন এক্সপ্রেসের সঙ্গে এক মালগাড়ির ভীষণ ধাক্কা লেগেছে। অনেক লোক আহত হয়েছে, মারা গেছে বেশ কয়েক জন।

আপাতত সব গাড়ি বন্ধ। দু-একটি রিলিফ ট্রেন সাহায্য নিয়ে ছোটাছুটি করছে। স্টেশন মাস্টারের কামরায় খুব ভিড়। অনেকেই আত্মীয়স্বজনের খবর নেবার জন্য ব্যাকুল। ভিড় কমতে খবর পেলাম, দেরাদুন এক্সপ্রেসের সামনের চারখানা বগি একেবারে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে। সামনের তিন নম্বর বগিতে আমার থাকার কথা। সেই মুহূর্তে নতুন করে আবার মেয়েটির কথা মনে এল। মেয়েটি যদি হাতছানি দিয়ে আমাকে ডেকে না-নিয়ে যেত তাহলে আমার কী অবস্থা হত ভেবেই শিউরে উঠলাম।

সেই রাতেই দুটো টেলিগ্রাম করলাম। একটা কলকাতার বাড়িতে, আর একটা লখনউতে, পিসির কাছে। লিখে দিলাম যে ভাগ্যক্রমে দুর্ঘটনার হাত থেকে আমি বেঁচে গেছি। পথে এক স্টেশনে আমি নেমে পড়েছিলাম।

লাইন ঠিক হতে দিন কয়েক লাগল। আবার একদিন লখনউ রওনা হলাম, পিসিকে খবর দিয়ে।

সারারাত সেই মেয়েটির কথা ভাবলাম। বিধাতার আশীর্বাদের মতো সেই মেয়েটি যেন আমার প্রাণরক্ষা করতেই এসেছিল। কাজ শেষ করে বোধ হয় মিলিয়ে গেল।

পরের দিন এগারোটা নাগাদ লখনউ পৌঁছোলাম। স্টেশনে পিসি এসেছিলেন। খুব ছোটোবেলায়— তাঁকে দেখেছিলাম, তবু চিনতে অসুবিধে হল না। পিসির চেহারা প্রায় একইরকম রয়েছে।

প্রণাম করতেই বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, "খবরের কাগজে ট্রেন দুর্ঘটনার খবর পেয়ে আমার যা অবস্থা হয়েছিল। কেবল মনে হচ্ছিল এর জন্যে আমিই দায়ী। আমি বার বার তোকে আসতে লিখেছিলাম। তারপর তোর টেলিগ্রামটা পেয়ে ধড়ে প্রাণ এল। কী ব্যাপার বল তো?"

সব ব্যাপারটা বললে পিসি হয়তো বিশ্বাস করতেন না। বিশেষ করে তিনি যখন বিজ্ঞান পড়ান। কাজেই মেয়েটির ব্যাপারটা বেমালুম চেপে গিয়ে বললাম, চা খেতে একটা স্টেশনে নেমেছিলাম, ট্রেন ছেড়ে দিল। ছুটে গিয়েও ট্রেন ধরতে পারলাম না।

পিসি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, "ভগবান বাঁচিয়েছেন তোকে, জন্ম জন্ম যেন তোর চা খাওয়ার নেশাটি থাকে।"

দু-জনে টাঙ্গায় উঠলাম। প্রায় আধঘণ্টার ওপর চলার পর একটি বাড়ির সামনে টাঙ্গা থামল। পিসির নির্দেশে।

পিসি নেমে চিৎকার করলেন, "সুন্দর, সুন্দর!"

একটি ছোকরা নেমে এল, আমার সুটকেশ আর বিছানা নিয়ে আবার ওপরে উঠে গেল। পিসির পিছন পিছন আমিও ওপরে উঠলাম।

মাঝারি সাইজের একটা ঘরের দিকে আঙুল দেখিয়ে পিসি বললেন, "এই ঘরটা তোর। যা, জামাকাপড় ছেড়ে নে। আমি জলখাবারের বন্দোবস্ত করি।"

শরীর খুবই ক্লান্ত ছিল। ঘরের মধ্যে ঢুকে একটা চেয়ারের ওপর নিজেকে ছেড়ে দিলাম।

এক কোণে একটা টেবিল, তার ওপর বাতিদান। একটা আলনা, ছোটো একটা খাট। দেয়ালে গোটা তিনেক ছবি। সামনের ছবিটার দিকে চাইতেই সমস্ত শরীর বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো কেঁপে উঠল। উঠে দাঁড়িয়ে

সূচীপত্রে যান

পড়লাম। মনে হল ভয়ের কালো ছায়া আমাকে আবৃত করার চেষ্টা করছে।

তাড়াতাড়ি বাইরে এসে ডাকলাম, "পিসি, পিসি...!"

পিসি বোধ হয় নীচের রান্নাঘরে ছিলেন। কোনো সাড়া পেলুম না, কিন্তু পিসিকে আমার একান্ত দরকার। আমি তাড়াতাড়ি সিঁড়ির মাঝ বরাবর নেমে আবার ডাকলাম, "পিসি ও পিসি!"

ততক্ষণে আমার ডাক পিসির কানে পৌঁছোল।

হন্তদন্ত হয়ে পিসি সিঁড়ির কাছে এসে বললেন, "কীরে, কী হয়েছে তোর?"

"একটু এঘরে এসো তো!"

আমি ছুটে ওপরের ঘরে এসে দাঁড়ালাম। হাঁপাতে হাঁপাতে পিসিও এলেন একটু পরে।

"কী হল রে তোর? শরীর খারাপ হয়নি তো? এত ঘামছিস কেন?"

জামার আস্তিন দিয়ে কপালের ঘামের বিন্দু মুছে বললাম, "না, শরীর আমার ঠিক আছে। কিন্তু এ ছবিটা কার?"

হাত দিয়ে সামনের ফোটোটা দেখালাম।

পিসি বললেন, "ওটা টুনুর ফোটো। আমার মেয়ে টুনু।"

"তোমার মেয়ে?"

"হ্যাঁ, তাকে দুই দেখিসনি। তোর জন্মাবার আগে টুনু মারা গেছে টাইফয়েডে। বোধ হয় বছর আটেক হয়েছিল বয়স।"

শেষদিকে পিসির কণ্ঠস্বর একটু গাঢ় হয়ে এল।

"কিন্তু—" ঠোঁটটা কামড়ে থেমে গেলাম।

"কিন্তু কীরে, কী বলবি বল?" পিসি বললেন।

"তুমি কি বিশ্বাস করবে পিসি? বিশ্বাস করবার কথা নয়!"

"কথাটা বল তবে তো বুঝব, বিশ্বাস করবার কথা কিনা!" পিসি আমার ভাবভঙ্গি দেখে রীতিমতো বিস্মিত হলেন।

"টুনুদির সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে পিসি।"

আমার কথা শেষ হবার আগে পিসি ধপাস করে চেয়ারে বসে পড়লেন। ভাবলেন, নির্ঘাৎ ছেলেটির মাথা খারাপ হয়েছে।

একটু একটু করে সব বললাম। যখন শেষ করলাম, পিসির চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়ছে। পিসি বিজ্ঞান পড়ান, কিন্তু একটি কথারও প্রতিবাদ করলেন না, কিছু অবিশ্বাস করলেন না, শুধু বললেন, "টুনুই তোর প্রাণ বাঁচিয়ে দিয়েছে!" '

এবার সমর আমার দিকে ঘুরে বসল।

'বলুন মাস্টারমশাই, কী করে এটা সম্ভব? মারা যাবার পরও কি আত্মার স্নেহ, দয়া, মায়ার টান থাকে? নিজের আত্মীয়দের বাঁচাবার জন্যে তারা কি মানুষের দেহ ধরে আবার ফিরে আসতে পারে মর্তলোকে?'

বাইরে ঝড়ের সঙ্গে প্রবল বৃষ্টি শুরু হয়েছে। আম গাছের একটা ডাল জানালার পাল্লায় মাথা ঠেকছে অনবরত। জলের ঝাপটায় ঘরের অনেকখানি ভিজে গিয়েছে।

সেইদিকে চেয়ে চুপ করে বসে রইলাম। কী উত্তর দেব সমরের প্রশ্নের?

চিরদিনের জন্যে হারিয়ে যাওয়া মানুষ নিজের লোককে বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্যে মায়া-মমতার টানে আবার কি পৃথিবীতে ফিরে আসে? তাও কি সম্ভব?...

সূচীপত্রে যান

ভূতুড়ে রাত

সভা শেষ হতে বেশ রাত হয়ে গেল। আমার যে বাড়িতে রাত্রে থাকা ঠিক হয়েছে সেটা শহরের বাইরে। ডাকবাংলোয়। কর্মকর্তাদের একজন মোটরে আমাকে পৌঁছে দিতে গেলেন। কিন্তু পথে বিপত্তি!

শহর ছাড়িয়ে একটু গিয়েই মোটর বিকল হল। আধঘণ্টা ধরে অনেক চেষ্টা করেও মোটর চালু করা গেল না।

ঘড়িতে রাত তখন এগারোটা দশ। কর্মকর্তা বললেন, 'মুশকিল হল দেখছি, এক কাজ করা যাক। সামনেই রাজা-বাহাদুরের বাড়ি। রাতটা সেখানেই কাটানো যাক।'

ফিকে জ্যোৎস্নায় বিরাট অট্টালিকার অস্পষ্ট কাঠামো দেখা গেল।

মস্ত বড়ো লোহার ফটক। কর্মকর্তা ফটকের এপার থেকে চীৎকার শুরু করলেন, 'দারোয়ান, দারোয়ান!'

অনেকক্ষণ ডাকার পর আধবুড়ো এক দারোয়ান এসে দাঁড়াল। কর্মকর্তাকে চিনতে পেরে সেলাম করল। 'নীচের দুটো ঘর খুলে দাও। মোটর খারাপ হয়ে গেছে। আমরা রাতটা এখানে কাটাব।'

দারোয়ান বিড় বিড় করে কী বলল, তারপর কোমরে বাঁধা চাবির গোছা থেকে চাবি বের করে দুটো ঘর খুলে দিল। একটা ঘরে আমি, আর একটায় কর্মকর্তা আর ড্রাইভার। ঘরের মধ্যে পা দিয়েই বুঝতে পারলাম ঘর রীতিমতো ঝাড়পোঁছ করা হয়। কোথাও একতিল ময়লা নেই। উঁচু খাট, তার উপর পরিষ্কার বিছানা, ঝালর দেওয়া দুটো বালিশ।

সারারাত বাতি জ্বেলে ঘুমানো অভ্যাস। অন্ধকারে একেবারেই ঘুম হয় না। কম পাওয়ারের নীলাভ বাতিটা জ্বেলে রাখলাম। শুয়ে শুয়ে এদিক-ওদিক দেখতে দেখতে চোখে পড়ল পায়ের দিকে একটা চেল রং-এর ছবি।

সিংহাসনের মতন কারুকার্য করা একটা চেয়ারে একজন প্রৌঢ় বসে। অঙ্গে জমকালো পোশাক, প্রকাণ্ড মুখ। বিরাট গোঁফ, রক্তাক্ত দুটি চোখ যেন জ্বল জ্বল করছে।

ইনিই সম্ভবত রাজাবাহাদুর, এই অট্টালিকার মালিক ছিলেন। বাইরে বৃষ্টির শব্দ। গাছের পাতায় পাতায় নূপুরের আওয়াজের মতন। একসময় ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

ঘট ঘট ঘট—

ঘুমের মধ্যে শব্দ কানে এল। প্রথমে মনে হল ঝড়ের বেগে জানলার পাল্লা কাঁপছে। তারপর মনে হল, কে যেন দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে।

এত রাত্রে কে দরজা ঠেলছে!

তবে কি কোনো কারণে কর্মকর্তা কিংবা ড্রাইভার ডাকছে। দু-হাতে চোখ রগড়ে উঠে বসলাম।

না। যেদিকে দরজা, শব্দটা সেদিক দিয়ে আসছে না। ফিরতেই সারা শরীর কেঁপে উঠল। আমি ভীরু এমন বদনাম কেউ দেবে না, কিন্তু চোখের সামনে এমন এক দৃশ্যকেই বা অস্বীকার করি কী করে!

ছবির ফ্রেমটুকু রয়েছে, রাজাবাহাদুর নেই!

ছবির ঠিক নীচে রাজাবাহাদুর বসে!

এক পোশাক, এক ভঙ্গী। নিশ্চল, নিথর, তবু হাতের মোষের সিং-এর ছড়িটা মেঝের উপর ঠুকছেন খট খট খট।

আমার মনে হল শরীরের সমস্ত রক্ত জমে বরফ হয়ে গিয়েছে! চীৎকার করার শক্তিও হারিয়ে ফেলেছি। চুপচাপ রইলাম।

সূচীপত্রে যান

বাইরে ঝড়ের গতি আরও উদ্দাম। হঠাৎ একসময় শব্দ করে দরজা খুলে গেল। হাওয়ার ঝলকের মধ্যে দীর্ঘকৃশ চেহারার একজন ঘরের মধ্যে এসে ঢুকল। এগিয়ে আসতেই দেখতে পেলাম লোকটার খালি গা, আর ময়লা ধুতি হাঁটুর ওপর তোলা। মাথায় মোটা টিকি। এদেশের চাষাভুষো লোক বলেই মনে হয়।

লোকটা রাজাবাহাদুরের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই ভ্রূকুটি ফুটে উঠল।

'কে?'

'আমি ঠাকুরপ্রসাদ।'

'ঠাকুরপ্রসাদ? এখানে এত রাত্রে কী দরকার?'

'আমার ছেলে শিউপ্রসাদ কই?'

'শিউপ্রসাদ, তা আমি কী করে জানব?'

'হ্যাঁ, তুমি জানো! তোমার লোক তাকে ধরে এনেছে। আমার খাজনা বাকি ছিল, দু-সাল ধরে দিতে পারছি না, তাই তোমার লোক আমার ছেলেকে ধরে এনেছে। বলো কোথায়?'

মনে হল রাজাবাহাদুর যেন একটু অস্বস্তি বোধ করলেন। একবার খোলা দরজার দিকে দেখলেন, এই আশায় যদি তাঁর কোনো পাইক, এ ঘরে এসে পড়ে। কিন্তু না, কেউ এল না। এই গভীর রাতে, ঝড়বৃষ্টির মধ্যে সবাই বোধ হয় নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাচ্ছে। কেউ এল না দেখে রাজাবাহাদুর বললেন, 'আমি তোমার ছেলের কথা জানি না। তুমি যেতে পারো।'

'যাবার জন্য আমি আসিনি।'

ঠাকুরপ্রসাদের গলায় যেন সিংহ গর্জনের সুর।

'তার মানে?'

'তার মানে?'

আমি প্রথমে ভাবলাম, বুঝি বিদ্যুৎ চমকাল! না বিদ্যুৎ নয়, ঠাকুরপ্রসাদ কোমর থেকে ধুতির আড়ালে লুকানো প্রকাণ্ড একটা ভোজালি বের করল।

'এ কী!' রাজাবাহাদুর আর্তকণ্ঠে চীৎকার করে উঠলেন।

'শিউপ্রসাদকে আমার চাই, নইলে তোমাকে প্রাণে বাঁচতে দেব না! বলো শিউপ্রসাদ কোথায়?'

'চোরা কুঠুরিতে।'

বলতে বলতে রাজাবাহাদুর উঠে দাঁড়ালেন। উঠে দাঁড়িয়েই দেয়ালে ফোটোর পিছনে হাত দিয়ে কী একটা টিপলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঘড় ঘড় করে শব্দ।

রাজাবাহাদুর সেইদিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন, 'ওই যে চোরা কুঠুরি। ওইখানে তোমার ছেলে আছে।'

ঠাকুরপ্রসাদ যেভাবে নেমে গেল, মনে হল যেন সিঁড়ি আছে। একটু পরেই একটা আর্তনাদ শোনা গেল। ঠাকুরপ্রসাদ উপরে উঠে এল। তার কোলে মরা ছেলে। 'শিউপ্রসাদ, শিউপ্রসাদ বাপ আমার!' তার কান্নার শব্দে আমার বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল। মরা ছেলেকে মেঝের ওপর নামিয়ে রেখে ঠাকুরপ্রসাদ সোজা হয়ে রাজাবাহাদুরের মুখোমুখি দাঁড়াল।

বজ্র গর্জনে বলল, 'আর নয়, তোমার অত্যাচার অনেক সহ্য করেছি। এবার প্রতিশোধ নেব!' যে ভোজালিটা কোমরে গুঁজে রেখেছিল, সেটা সে আবার টেনে বের করল।

আমি ভয় পেলাম। এখনই আমার চোখের সামনে একটা খুনোখুনি হয়ে যাবে ভেবে চীৎকার করে উঠলাম।

কী আশ্চর্য, গলা দিয়ে একটু স্বর বের হল না। রাজাবাহাদুর চেঁচালেন, 'রামলোচন, পিয়ারীলাল!' ঠাকুরপ্রসাদ জোরে হেসে হা-হা-হা, 'কেউ আসবে না। সবাই যাত্রা শুনতে গেছে। সেই খবর পেয়েই আমি

সূচীপত্রে যান

এসেছি। ভগবানের নাম স্মরণ করো।' তারপর কী হয়ে গেল! আমার চারিদিকে ধোঁয়ার রূপ। সেই ধোঁয়ার মধ্যে রাজাবাহাদুর আর ঠাকুরপ্রসাদ হারিয়ে গেল।

ঘুম যখন ভাঙল তখন সবে ভোর হচ্ছে। কাচের জানলা দিয়ে সূর্যের প্রথম কিরণ এসে বিছানার ওপর পড়েছে। বিছানা থেকে উঠেই ফোটোর দিকে দেখলাম রাজাবাহাদুরের প্রকাণ্ড মূর্তি। নেমে ফোটোর পিছনে হাত দিয়ে দেখলাম। চোরাকুঠুরি খোলার কোনো বোতাম দেখতে পেলাম না। মেঝে নিরীক্ষণ করে দেখলাম। কোথাও কোনো ফাটল নেই। তাহলে সবই আমার মনের ভুল কিংবা স্বপ্নে সবকিছু দেখেছি। দরজা খুলে বাইরে এলাম। গেটের কাছে দারোয়ান বসে। তার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই সে উঠে সেলাম করল। তাকে সোজাসুজি প্রশ্ন করলাম, 'আচ্ছা এখানে চোরাকুঠুরিটা কোথায়?'

দারোয়ান চমকে উঠল, 'চোরাকুঠুরি!'

'হ্যাঁ যেখানে রাজাবাহাদুর প্রজাদের ধরে এনে রাখতেন?'

'আপনাকে এ সব কে বলল বাবুজি?'

'যেই বলুক। কথাটা সত্যি কি না তুমি বলো না?'

দারোয়ান চাপা গলায় বলল, 'আমি কিছু জানি না বাবুজি। বাবার কাছে শুনেছি, যে ঘরে আপনি শুয়েছিলেন সেখানে চোরাকুঠুরি ছিল। মেঝেটা ফাঁক হয়ে নেমে যাবার রাস্তাও ছিল। রাজাবাহাদুর মরে যাবার পর তার ছেলে বিলাত থেকে ফিরে এসে মেঝে গেঁথে চোরাকুঠুরি বন্ধ করে দিয়েছিলেন।'

'রাজাবাহাদুরের ছেলে কোথায় থাকেন?'

'কলকাতায়। মাঝে মাঝে দশ-বারো দিনের জন্য এখানে আসেন।'

'আচ্ছা আর একটা কথা—'

'বলুন বাবুজি।'

'রাজাবাহাদুর কীভাবে মারা গেছেন?'

দারোয়ান তখনই কোনো উত্তর দিল না। একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে রইল।

'কী হল বলো?'

দারোয়ান প্রায় কেঁদে ফেলল। 'আমি কিছু জানি না বাবুজি। আমার বাবার কাছে শুনেছি, তিনি এক প্রজার হাতে খুন হয়েছিলেন। যে প্রজার নাম ঠাকুরপ্রসাদ।'

দারোয়ান উত্তর দেবার আগেই কর্মকর্তার গলা কানে এল।

'চলুন মুখ-হাত ধুয়ে আমরা বেরিয়ে পড়ি। সকালে কলিকাতা ফেরার একটা ট্রেন আছে।'

তারপর অনেক বছর কেটে গেছে, কিন্তু সে রাত্রের সে দৃশ্যের কথা আমি ভুলতে পারিনি। এখনও মাঝরাতে ঘুম ভেঙে চমকে জেগে উঠি। রাজাবাহাদুরের চীৎকার কানে আসে। রামলোচন, পিয়ারীলাল! সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরপ্রসাদের উৎকট হাসি। কেউ নেই কেউ আসবে না!

ঠাকুরপ্রসাদের পায়ের কাছে মরা ছেলে, হাতে উদ্যত ভোজালি। সে রাতে নিছক স্বপ্ন দেখেছি— একথা মন মানতে চায় না। অতীতের একটা ঘটনা চোখের সামনে ঘটেছিল, এ বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু কী করে এটা সম্ভব হল?

এর উত্তর আমার জানা নেই।

সূচীপত্রে যান

ভূত নেই?

আমি তোমাদের আগে বলেছি, এখনও বলছি, ভূত আর ভগবান নিয়ে তর্কের আজও শেষ হয়নি। যতদিন মানুষের মনে অনুসন্ধিৎসা থাকবে, ততদিন এ বিতর্কের শেষও হবে না।

এ বিষয়ে পৃথিবীর বিদ্বান এবং সাধারণ লোক দুটো মত পোষণ করেন। কেউ বলেন, বিজ্ঞান ভূতের অস্তিত্ব মানে না, কিন্তু বিজ্ঞান কি শেষ কথা? আমাদের সব প্রশ্নের উত্তর বিজ্ঞান দিতে পারে? আবার কেউ বলেন, ভূত নিশ্চয় আছে।

এমন ঘটনা তোমাদের মধ্যে অনেকেই শুনেছ, কিংবা দেখেছ, খ্যাতনামা ডাক্তাররা যে মুমূর্ষু রোগীকে দিনের-পর-দিন চিকিৎসা করেও সারাতে পারে না, এক সামান্য ফকির রোগীর গায়ে হাত বুলিয়ে, কিংবা তার মাথায় একটা রুদ্রাক্ষ ছুঁইয়ে তাকে সম্পূর্ণ নিরাময় করে তুলেছে।

এতে বোঝা যায়, আমাদের লৌকিক জগতের বাইরে আর একটা জগৎ আছে, যেটা ঠিক বিজ্ঞানের নিয়মে চলে না।

তোমরা পরজন্ম সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছ।

সংবাদপত্রেও নিশ্চয় পড়েছ, জাতিস্মর নিয়ে কত আলোচনা হচ্ছে।

সুদূর রাজস্থানে মরুর মধ্য দিয়ে উটের পিঠে চেপে বাপের সঙ্গে ছোটো সাত বছরের ছেলে চলেছে।

হঠাৎ একটা গ্রামের কাছে একটা কুটিরের দিকে হাত দেখিয়ে ছেলে বাপকে বলল—

'ওই দ্যাখো বাবা, ওই আমার বাড়ি। ওখানে আমার আত্মীয়স্বজন সবাই আছে।'

বাপ প্রথমে কড়া ধমক দিল ছেলেকে, কিন্তু তাকে নিরস্ত করা গেল না। তার মুখে এক কথা—

'ওখানে আমার বুড়ো বাপ রয়েছে, বউ চন্দ্রা রয়েছে, ছোটো ভাই এক ভোর বেলা পিছন থেকে ধাক্কা দিয়ে আমাকে কুয়োর মধ্যে ফেলে দেয়। তুমি চলোই-না ওখানে।'

কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে বাপ সেই কুটিরের সামনে গেল।

দাওয়ার ওপর এক বৃদ্ধ হাঁপাচ্ছে। একটি বউ জল তুলছে কুয়ো থেকে।

ছেলেটি উট থেকে নেমে হনহন করে বৃদ্ধের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

'বাবা, আমি কেশোপ্রসাদ। তোমার বড়ো ছেলে।'

দু-চোখের ওপর কোঁচকানো মাংসের স্তর নেমেছে। দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ।

বৃদ্ধ ঝুঁকে পড়ে দেখে বলল, 'দিল্লাগি করতে এসেছ! আমার ছেলে আজ আট বছর মারা গেছে। ভোর বেলা কূয়ো থেকে জল তুলতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে গিয়েছিল কুয়োর মধ্যে।'

ছেলেটি বলল, 'না, পা পিছলে যায়নি। মাধোপ্রসাদ তাকে ঠেলে দিয়েছিল। তার মতলব ছিল আমি না থাকলে বজরার খেত, বাড়িঘর সবই সে পাবে।'

যে বউটি জল তুলছিল, সে ছেলেটির কথায় আকৃষ্ট হয়ে কাছে এসে দাঁড়াল।

তার দিকে চোখ পড়তেই ছেলেটি চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে চন্দ্রা, আমি কেশোপ্রসাদ, তোমার মরদ।'

চন্দ্রার বয়স বছর ত্রিশের কম নয়। সে সাত বছরের স্বামীকে দেখে হেসে ফেলল। চোখের কোণে একটু জলও দেখা গেল।

বলল, 'পাগল কোথাকার!'

ছেলেটির বর্তমান বাপ একটু পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল। এবার সে এগিয়ে এসে বলল, 'কী ঝামেলা করছিস? দেরি হয়ে যাচ্ছে, চল।'

সূচীপত্রে যান

ছেলেটি যাবার কোনো লক্ষণই দেখাল না। দাওয়ার ওপর বসে পড়ে বলতে লাগল—

কোন ঘরে সে শুত, সে ঘরে কী আসবাব আছে, বজরার খেতের পরিমাণ কত, বাপের দু-বার সাংঘাতিক অসুখ করেছিল, বিকানির থেকে সেই-ই হাকিম নিয়ে এসেছিল।

আরও অনেক কথা সে বলল।

সে কোন গাঁয়ে বিয়ে করেছিল। চন্দ্রার বাপের নাম কী। এমনকী বিয়ে করে বউকে নিয়ে যখন ফিরছিল, তখন মাঝপথে তুমুল বালির ঝড় উঠেছিল। সে আর চন্দ্রা সারা দেহ আবৃত করে উটের পেটের নীচে আশ্রয় নিয়ে নিজেদের বাঁচিয়েছিল।

চন্দ্রা আর চন্দ্রার শ্বশুর তো অবাক!

সাত বছরের ছেলে এত সব কথা জানল কী করে?

এবার ছেলেটি জিজ্ঞাসা করল, 'মাধোপ্রসাদ তো আর নেই?'

'না, তাকে খেতের মধ্যে সাপে কামড়েছে। তুই যাবার এক বছরের মধ্যেই।'

ছেলেটি যাবার মুখেই বাধা।

চন্দ্রা তাকে জড়িয়ে ধরে ভেউ ভেউ করে কান্না।

সে তাকে ছেড়ে দেবে না।

ছেলেটি বলল, 'আমার নবজন্ম হয়েছে। নতুন আমির ওপর তোমাদের কোনো দাবি নেই। আমার বাবা আছে, মা আছে, দাদারা আছে। সে সংসারে ফিরে যেতেই হবে। এই নিয়ম।'

ছেলেটি বাপের সঙ্গে আবার উটের পিঠে চাপল।

তবে মাঝে মাঝে সে পুরানো সংসারেও আসত।

এই ছেলেটি জাতিস্মর।

আগের জন্মের কথা তার সব মনে আছে।

বিজ্ঞান এর কী ব্যাখ্যা দেবে?

খবর পেয়ে বিখ্যাত এক গবেষক ছেলেটির কাছে গিয়েছিলেন। তাকে নানাভাবে পরীক্ষা করেছিলেন।

শেষে এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে, এর মধ্যে কোনো কারচুপি নেই। ছেলেটির সত্যিই আগের জন্মের সব কথা মনে আছে।

এইরকম জাতিস্মরের কাহিনি ইদানীং অনেক শোনা যায়।

শুধু ভারতবর্ষে নয়, পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও।

ঠিক এমনিভাবে ভূতের কাহিনিও সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে।

আজ তোমাদের এমনই এক ভূতের কাহিনি শোনাচ্ছি।

এ কাহিনির সঙ্গে আমি কিছুটা জড়িত, কাজেই এটা যে নির্ভেজাল সত্যি কাহিনি এ বিষয়ে তোমাদের কাছে আমি হলফ করে বলতে পারি।

আমার একজন খুব নিকট আত্মীয়া, নাম আরতি বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ. বি. এড কিন্তু ওকালতি করে না। বেসরকারি অফিসের আইন বিভাগের উচ্চপদস্থ অফিসার।

থাকত পাইকপাড়ায়। এক বান্ধবীর সঙ্গে একটি ফ্ল্যাট নিয়ে।

বান্ধবীটি এক স্কুলের শিক্ষিকা।

জীবন দু-জনের বেশ ভালোই কাটছিল। ছুটির দিন সিনেমা, কিংবা আরও অনেক বান্ধবী মিলে বনভোজন অথবা গড়ের মাঠে প্রদর্শনী দেখতে যাওয়া।

হঠাৎ আরতির বিয়ে ঠিক হল।

পাত্রও উচ্চশিক্ষিত। এক যন্ত্রপাতির কারখানার আধা মালিক।

আরতি আমার কাছে এসে দাঁড়াল।

সূচীপত্রে যান

'আপনি তো অনেক কিছুর সন্ধান রাখেন। আমাকে একটা বাড়ি খুঁজে দিন।'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি, কিনবে?'

'না, না, ভাড়া নেব। খুব বড়ো দরকার নেই। দু-জনের থাকবার মতন। একটু যেন ভালো এলাকায় হয়, আর দক্ষিণ কলকাতায় দেখবেন, কারণ ওর কারখানাটা কালীঘাটে।'

আমি নিজে থাকি বালিগঞ্জে। একেবারে লেকের কাছে।

পরদিন থেকেই বাড়ি খোঁজা শুরু করে দিলাম। শুধু নিজে নয়, গোটা দুয়েক দালালকেও লাগিয়ে দিলাম।

অনেক বাড়ির সন্ধান এল। কিছু নিজে, কিছু আরতিকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি দেখতে লাগলাম।

আরতি ভারি খুঁতখুঁতে মেয়ে। কোনো বাড়িই তার পছন্দ হল না। কোনো-না-কোনো কারণে সব নাকচ করে দিল।

তিন মাস ঘোরাঘুরির পর কালীঘাট অঞ্চলে এক বাড়ির সন্ধান মিলল।

পার্কের সামনে প্রায় নতুন বাড়ি। সদ্য রং করা হয়েছে। খান তিনেক কামরা। বারান্দা, বাথরুম, আবার ওরই মধ্যে এক ফালি উঠানও আছে।

সেই অনুপাতে ভাড়াও খুব বেশি নয়। দু-শো কুড়ি।

বাড়ির মালিক পাশের বাড়িতেই থাকেন।

এ বাড়ি আরতির পছন্দ হয়ে গেল।

শুধু আরতির নয়, আরতির স্বামী আশিসেরও।

আর দেরি না-করে সেদিনই দু-মাসের ভাড়া আগাম দেওয়া হল।

মাস খানেক পর আরতির বাসায় বেড়াতে গিয়ে খুব ভালো লাগল।

নতুন আসবাবপত্র দিয়ে চমৎকার সাজিয়েছে।

উঠানের পাশে সারি সারি টব।

দেশি ফুল বেল, জুঁই যেমন আছে, তেমনি বিদেশি ফুল ডালিয়া, পাপি, হলিহকও রয়েছে।

এমন বাসা খুঁজে দেবার জন্য আরতি আশিস দু-জনেই আমাকে বার বার ধন্যবাদ দিল।

এরপর অনেক দিন আর আরতির সঙ্গে দেখা হয়নি।

অফিসের কাজে দিল্লি যেতে হয়েছিল, সেখানে মাস তিনেক কাটিয়ে কানপুর। সেখানেও এক মাসের ওপর লেগে গেল।

কলকাতা ফিরলাম প্রায় পাঁচ মাস পর।

এক ছুটির দিনে বন্ধুবান্ধব নিয়ে গল্প করছি, আরতি এসে ঢুকল।

প্রথম নজরেই মনে হল, তার চেহারা একটু যেন ম্লান।

আরতি ভিতরে চলে গেল।

বন্ধুরা বিদায় হতে আমিও ভিতরে গেলাম।

দেখলাম, আরতি চুপচাপ সোফার ওপর বসে আছে।

আমাকে দেখে বলল, 'আপনার সঙ্গে কথা আছে।'

'কী বলো? শরীর খারাপ নাকি? চেহারাটা কেমন দেখাচ্ছে।'

আরতি মুখ তুলে বলল, 'রাত্রে একেবারে ঘুম হচ্ছে না।'

'সে কী? ডাক্তার দেখাও, নইলে শক্ত অসুখে পড়ে যাবে।'

'ডাক্তার কিছু করতে পারবে না।'

'তার মানে?'

'মানে, বাড়িটা ভালো নয়।'

'সে কী, স্যাঁতসেঁতে বা অন্ধকার এমন তো নয়। রোদ বাতাস প্রচুর।'

সূচীপত্রে যান

'সে সব কিছু নয়, অন্য ভয় আছে।'

'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

আরতি কিছুক্ষণ কী ভাবল, তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'ও বাড়িতে আমরা দু-জন ছাড়াও অন্য একজন আছে।'

'অন্য একজন আছে?'

'হ্যাঁ, তাকে মাঝে মাঝে গভীর রাতে দেখা যায়।'

অন্য লোক হলে কথাটা হেসে উড়িয়ে দিত। শুনতেই চাইত না।

কিন্তু আমি মৃত্যুর পরে আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী। আমার স্থির ধারণা, যারা অতৃপ্ত কামনা-বাসনা নিয়ে এ পৃথিবী ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়, তারা আবার ফিরে আসে। কখনো বায়বীয় মূর্তি, কখনো মানুষের রূপ ধরে ফেলা-যাওয়া সংসারের মাঝখানে ঘুরে বেড়ায়।

'কী ব্যাপার খুলে বলোতো।'

'বলছি।'

আরতি কোলের উপর রাখা ভ্যানটি ব্যাগটা পাশে নামিয়ে রাখল। সহজ হয়ে বসে বলতে লাগল—

মাস দুয়েক আগে হঠাৎ খুটখাট শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। মনে হল বাইরের ঘরে যেন কার পায়ের আওয়াজ।

আশিস পাশেই শুয়েছিল। তার ঘুমের বহর তো জানোই। বুকের ওপর দিয়ে এক ব্যাটালিয়ন সৈন্য চলে গেলেও তার ঘুম ভাঙবে না।

কাজেই তাকে ডাকার চেষ্টা না-করে নিজেই উঠে পড়লাম।

ভীতু এ বদনাম কেউ দিতে পারবে না। বরং সবাই জানে আমি রীতিমতো সাহসী।

প্রথমে জানলা দিয়ে দেখলাম। কিছু দেখা গেল না। কিন্তু খুটখাট শব্দ ঠিক চলতে লাগল। মনে হল, খড়ম পায়ে কে যেন পায়চারি করছে!

অথচ কোনো লোককে দেখা গেল না।

রাতে মাংস রান্না হয়েছিল। হাড়ের টুকরো রান্নাঘরে প্লেটের ওপর পড়েছিল। খুব সম্ভবত ইঁদুর সেই হাড়ের টুকরো বাইরের ঘরে নিয়ে এসেছে।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আবার বিছানায় এসে শুয়ে পড়লাম।

তখনই ঘুম এল না। একবার ঘুম ভেঙে গেলে চট করে ঘুম আমার আসে না। এপাশ-ওপাশ করতে লাগলাম। পাশের লোকটি অকাতরে নিদ্রা যাচ্ছে। নাক দিয়ে বিচিত্র ধ্বনি বের হচ্ছে।

ঘরে হালকা সবুজ রঙের একটা বাতি জ্বলছিল। অন্ধকারে আমি ঘুমাতে পারি না। এ আমার ছেলেবেলার অভ্যাস। হঠাৎ দেখলাম দীর্ঘ একটা ছায়া আলোকে আড়াল করে এ ঘর থেকে অন্য ঘরে চলে গেল।

চমকে উঠে বসলাম।

আশিসকে ডেকে বললাম, 'এই ওঠো ওঠো, ঘরের মধ্যে কে ঢুকেছে!'

আশ্চর্য মানুষ! চোখ খুলল না। পাশ ফিরতে ফিরতে বলল, 'ফ্লিট দিয়ে দাও।'

ছায়াটা সরে সরে বাইরের দেয়ালের সঙ্গে মিশে গেল। আর দেখা গেল না।

আমি তখন বিছানার ওপর উঠে বসেছি। মনকে বোঝালাম, এ শুধু চোখের ভুল। তা না হলে, ছায়া দেখা গেল, অথচ মানুষটাকে দেখা গেল না, তা কি হতে পারে?

ভূতের কথা ভাবতেও পারিনি, কারণ ভূত আছে এমন অদ্ভুত কথা আমি কোনোদিনই বিশ্বাস করি না।'

আমি খুব মনোযোগ দিয়ে আরতির কথা শুনছিলাম।

এবার বললাম, 'তারপর?'

সূচীপত্রে যান

'তার পর দিন সব স্বাভাবিক। কোনো গোলমাল নেই। সে রাত্রে ভয় পেয়েছিলাম ভেবেই হাসি পেত। একেবারে ছেলেমানুষি কাণ্ড!

আশিস কারখানার কাজে দিন চারেকের জন্য জামসেদপুরে গিয়েছিল। বাড়িতে আমি একলা।

মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল।

এবারে একেবারে স্পষ্ট দেখলাম।

দীর্ঘ একহারা চেহারা। খালি গা। কাঁধের ওপর ধবধবে সাদা উপবীত। কোঁচাটা ভাঁজ করে সামনে গোঁজা। মাথায় পাকা চুল। দুটি চোখ জবাফুলের মতন লাল। গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ির মধ্যে দিয়ে উঁচু চোয়াল দেখা যাচ্ছে।

লোকটির ঊর্ধ্ব দৃষ্টি। হাতে শক্ত একটা দড়ি। ওপর দিকে কী যেন খুঁজছে!

সেই মুহূর্তে শরীরের সব রক্ত জমে হিম শীর্ত হয়ে গেল! দু-হাতে বুকটা চেপে ধরেও দ্রুত স্পন্দন কমাতে পারলাম না। মনে হল, তখনই হার্টফেল করবে।

বিকৃতকণ্ঠে বললাম, 'কে, কে ওখানে?'

লোকটি ওপর থেকে দৃষ্টি নামিয়ে আমার দিকে দেখল।

জ্বলন্ত দৃষ্টি— পলকহীন!

সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল!

তখনই মনে হল লোকটা এ জগতের কেউ নয়। অশরীরী আত্মা। আস্তে আস্তে লোকটা পাশের ঘরে ঢুকে গেল।

আমি খাট থেকে নামলাম, কিন্তু তার পিছনে যাবার সাহস হল না।'

এই কথাগুলো বলবার সময়ে দেখলাম আরতির মুখ-চোখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

আমি বললাম, 'এরকম যখন ব্যাপার, তখন না হয় ও বাড়ি ছেড়ে দাও। অন্য কোথাও বাড়ি খুঁজি।'

আরতি উত্তর দিল, 'তাতেই তো মুশকিল! আপনি বোধ হয় লক্ষ করেননি, বাড়ির দেয়াল ভেঙে চুরে আমি দুটো ঘর বানিয়েছি। বাইরেটা চুনকাম করেছি, ভিতরে রং দিয়েছি, গ্যাস বসাবার জন্য রান্নাঘরেও অনেক বদল করেছি। অবশ্য এসব বাড়িওয়ালার মত নিয়েই করেছি। ভাড়া থেকে মাসে মাসে কিছু করে টাকা কেটে রাখছি। সে টাকা শোধ হতে বছর দুয়েক লাগবে। তার আগে বাড়ি ছেড়ে দিলে আমার অনেক টাকা লোকসান হয়ে যাবে।'

একটু ভেবে আমি বললাম, 'ঠিক আছে, আমি একবার তোমার বাড়িওয়ালার সঙ্গে দেখা করব। তিনি কী বলেন, শুনি।'

দিন দুয়েকের মধ্যেই বাড়িওয়ালার কাছে গিয়ে হাজির হলাম।

ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ, বিপুলকায়। কলকাতায় কিছু বাড়ি আছে, কাঠের ব্যাবসা।

একটা ইজিচেয়ারে বসেছিল। আমাকে দেখে ওঠবার চেষ্টা করল, পারল না।

'কী খবর? আমার কাছে হঠাৎ?'

আরতির কাছে শোনা সব কিছু বললাম। শেষকালে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ঠিক করে বলুন তো? ও বাড়িটার কোনো দোষ আছে?'

'দোষ মানে?'

'মানে, কেউ ওবাড়িতে অপঘাতে মারা গিয়েছিল? আগের কোনো ভাড়াটে?'

বাড়িওয়ালা মাথা নাড়ল, 'না মশাই, এর আগে মাত্র দু-ঘর ভাড়াটে ছিল। অপঘাত তো দূরের কথা, এমনই মৃত্যু কারও হয়নি। তা ছাড়া এই বিজ্ঞানের যুগে মানুষ যখন পায়চারি করার জন্য চাঁদে যাচ্ছে, তখন কি সব ভূত-প্রেতের কাহিনি আমদানি করছেন?'

সূচীপত্রে যান

তর্ক করলাম না। অনেক বিষয় আছে তর্ক করে বোঝানো যায় না। স্থূল উদাহরণ দেওয়া সেখানে সম্ভব নয়।

চলে এলাম।

তারপর মাস দুয়েক আরতির কোনো খবর নেই।

আমিও নিশ্চিন্ত। যাক, অপদেবতার উপদ্রব আর নেই। সব শান্ত।

কিন্তু আমার ধারণা ভুল প্রমাণ করে একদিন সকালে আশিস এল।

কোটরগত চোখ, বিবর্ণ মুখ, ঘোলাটে দৃষ্টি।

বললাম, 'কি হে শরীর খারাপ নাকি? আরতি কেমন আছে?'

আমার কথার উত্তর না-দিয়ে আশিস অস্পষ্ট গলায় বলল, 'একটু জল দিন।'

জল শুধু খেল না, মুখ-চোখে দিল। তারপর বলল, 'আরতিকে টালিগঞ্জে তার দিদির বাড়ি দিয়ে এসেছি। কালীঘাটের বাড়িতে আর আমাদের থাকা চলবে না!'

'কেন, কী হল?'

'আরতির কাছে তো আপনি কিছু কিছু শুনেছেন। আমি কিন্তু এ পর্যন্ত কিছু দেখিনি। কোনো শব্দও শুনিনি। সেইজন্য এতদিন আমি আরতিকে ঠাট্টা করতাম। তা ছাড়া ভূত, আত্মা এসবে আমার কোনোদিনই কোনো বিশ্বাস নেই।

কাল একটা কাজে হাওড়ায় আটকে পড়েছিলাম। বাস বন্ধ। ট্যাক্সিও পাই না। কিছুটা হেঁটে তারপর ট্রামে বাড়ি পৌঁছোতে প্রায় বারোটা হয়ে গিয়েছিল।

আরতি খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছিল।

যাক, আরতিকে খাবার সাজাতে বলে আমি হাত-মুখ ধোবার জন্য বাথরুমে ঢুকে পড়লাম।

নীচু হয়ে বেসিনে মুখ ধুয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতেই মাথায় ঠক করে কী-একটা লাগল। বাথরুমে আবার কে কী রাখল!

একটু কমজোর বাতি। কিন্তু সেই বাতিতেই দেখতে কোনো অসুবিধা হল না।

ঠান্ডা একটা বরফের স্রোত আমার মেরুদণ্ড বেয়ে নেমে গেল!

বাথরুমটা অ্যাসবেস্টসের ছাউনি দেওয়া। আগে টালির ছাদ ছিল, আমরাই খরচ করে অ্যাসবেসটস দিয়ে নিয়েছিলাম। ওপরে দুটো কাঠের কড়ি।

একটা কড়িতে দেহটা ঝুলছে!

গলায় দড়ির ফাঁস। মাথাটা একদিকে কাত হয়ে পড়েছে। দুটো চোখ আধবোজা। জিভটা অনেকখানি বের হয়ে গেছে। বোধ হয় জিভের ওপর দাঁতের চাপ পড়েছিল, তাই জিভ কেটে রক্তের ফোঁটা ঝরে পড়েছে। কিছুটা দেহের ওপর, কিছুটা মেঝেতে। পরনে আধময়লা, ধুতি, কাঁধে পৈতে।

মাথা উঁচু করার সময় ঝুলন্ত দেহের একটা পা আমার মাথায় ঠেকে গিয়েছিল।

আমি সবকিছু ভুলে "আরতি" বলে চেঁচিয়ে উঠেছিলাম।

আরতি আমার অপেক্ষায় খাবার টেবিলে বসেছিল। আমার চিৎকারে ছুটে এসে বাথরুমের দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিল। প্রথমে সে সঠিক কিছু বুঝতে পারেনি। তারপর ওপর দিকে চোখ যেতেই "ও মাগো বলে" মেঝের ওপর ছিটকে পড়ে অজ্ঞান।

আরতির মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে কোনোরকমে জ্ঞান ফিরিয়ে আনলাম। তারপর বাকি রাতটা দু-জনে বাইরের ঘরে বসে কাটালাম।

ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে প্রথমে ট্রামে উঠে আরতিকে নিয়ে যখন তার দিদির বাড়ি এলাম, তখন জ্বরে আরতির গা পুড়ে যাচ্ছে। দুটো চোখ করমচার মতন লাল।'

আমি চুপ করে সব শুনলাম।

সূচীপত্রে যান

আশিসের কথা শেষ হতে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আরতি এখন কেমন আছে?'

'খুব ভালো নয়। বিকারের ঘোরে মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে উঠছে, ''ওই লোকটা, ওই লোকটাই তো ঘুরে বেড়াচ্ছিল দড়ি হাতে। আমি এখানে থাকব না। আমাকে অন্য কোথাও নিয়ে চলো''।'

অবশ্য আরতির জন্য খুব চিন্তা নেই। ভয়টা কেটে গেলেই ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু সবকিছু নিজের চোখে দেখবার দারুণ ইচ্ছা হল।

এমন তো নয়, একসময় দরজা খোলা পেয়ে বাইরের কোনো লোক বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ে আত্মহত্যা করেছে? সে হয়তো আত্মহত্যা করবার নির্জন একটা জায়গা খুঁজছিল।

তাই আশিসকে বললাম, 'চলো একবার নিজের চোখে দেখে আসি। তা ছাড়া, তোমরা ব্যাপারটাকে ভৌতিক ভাবছ, তা তো নাও হতে পারে। পুলিশে খবর দেওয়াও তোমাদের একটা কর্তব্য। তারা এসে মৃতদেহের ভার নেবে।'

আশিস আমার সঙ্গে চলল।

তালা খুলে ভিতরে ঢুকলাম।

বাথরুমের মধ্যে গিয়ে অবাক হয়ে গেলাম। কোথাও কিছু নেই, সব পরিষ্কার।

আশিসকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কই হে? কোথায় তোমার ঝুলন্ত দেহ? রক্তের একটি ফোঁটাও তো কোথাও দেখছি না।'

আশিস রীতিমতো অপ্রস্তুত।

'সব চোখের ভুল, বুঝলে?'

আশিস মাথা নাড়ল।

'কিন্তু দু-জনেই ভুল দেখলাম?'

'ওরকম হয়। একজনের ভয়, আর একজনের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে তাকেও এক ধরনের কাল্পনিক দৃশ্য দেখায়। তুমিই দেখ-না, কাল রাতে তুমি যদি সত্যিই ওরকম একটা দৃশ্য দেখে থাক, তাহলে আজ কোথাও কিছু নেই, তা কি হতে পারে? এইখানটাই তো দেখেছিলে?'

মুখ তুলে ওপরের দিকে দেখেই আমি থেমে গেলাম।

'কী আশ্চর্য, এটা তো আগে দেখিনি!'

কড়ির সঙ্গে একটা মোটা দড়ি বাঁধা। দড়িটা ফাঁসের আকারে ঝুলছে!

অস্বীকার করব না, আমার হাত-পা বেশ ঠান্ডা হয়ে গেল। বুকের দাপাদাপির জেরে ভয় হল, স্পন্দন থেমে না-যায়।

এ দড়ির ফাঁস তো প্রথম বার দেখিনি! আরও অবাক কাণ্ড, দড়ির ফাঁসটা অল্প অল্প দুলছে, অথচ কোথাও বাতাস নেই। বাইরে বাতাস থাকলেও বাথরুমে বাতাস ঢোকবার কোনো সুযোগ নেই।

আশিসের সঙ্গে বেরিয়ে এলাম।

এটা যে ভৌতিক ব্যাপার নয়, কোনো মানুষের কারসাজি তা হওয়াও অসম্ভব নয়। কোনো যুক্তিতর্ক বিস্তার করেও সমাধান করতে পারলাম না।

আরতিরা আর ও বাড়িতে ফিরে যায়নি। ভবানীপুরে একটা বাড়ি ঠিক করে উঠে গিয়েছিল। আর্থিক লোকসান সত্ত্বেও।

এ ঘটনার প্রায় মাস তিনেক পর এক বিকেলে কালীঘাট পার্ক দিয়ে যাচ্ছি, হঠাৎ আরতির বাড়িওয়ালার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। একটা বেঞ্চে বসে আছে।

আমি তার পাশে বসে পড়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'মশাই, সত্যি কথা বলুন তো, বাড়িটার কী রহস্য? আমার আত্মীয়াটি তো থাকতে পারল না, পালাল।'

প্রথমে কিছুতেই বলবে না। অবশেষে আমার পীড়াপীড়িতে বলল—

সূচীপত্রে যান

'এক বুড়ো ভদ্রলোক ওই বাড়িতে আত্মহত্যা করেছিল। তা প্রায় বছর দশেক আগে। পেটে শূলবেদনা ছিল। বাড়ির সবাই নিমন্ত্রণ খেতে বাইরে গিয়েছিল, তখন বাথরুমে বুড়ো গলায় দড়ি দেয়। তারপর থেকে যে ভাড়াটে আসে, তারাই ভয় পায়। বেশিদিন থাকতে পারে না।'

আমি বললাম, 'গলায় পিণ্ডদানের ব্যবস্থা করেননি কেন?'

'করার চেষ্টা করেছি মশাই, অনেক বার করেছি। প্রত্যেক বার এক-একটা বিপদ! বুড়োর আত্মীয়রা গয়া গিয়েছিল পিণ্ড দিতে, তিনদিন ধরে দারুণ ঝড়বৃষ্টি। ধর্মশালা থেকে বের হতেই পারল না।

আমি নিজে একবার গিয়েছিলাম। ট্রেন থেকে স্টেশনে নামতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে একমাস হাসপাতালে শয্যাগত।

পুরোহিত দিয়ে শান্তিস্বস্ত্যয়নের আয়োজন করার চেষ্টা করেছিলাম। সেখানেও বিপত্তি।

পুরোহিত আসনে বসবার সঙ্গে সঙ্গে ছাদ ভেঙে একটা চাঙড় তার মাথায় পড়ল। পুরোহিত জ্ঞান হারিয়ে মেঝের ওপর লুটিয়ে পড়ল।

ব্যস, তারপর থেকে আর কোনো পুরোহিতই আসতে রাজি হল না। কী করি বলুন তো?'

এর উত্তর আমার জানা ছিল না। কাজেই সেদিন বাড়িওয়ালার প্রশ্নের কোনো উত্তর দিতে পারিনি।

একটা কথা শুধু মনে হয়েছে, পৃথিবীর সব অবিশ্বাসী মানুষদের জড় করে চিৎকার করে বলি, যাঁরা মনে করেন, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সবকিছু শেষ হয়ে যায়, প্রেতযোনি বলে কিছু নেই, তাঁরা কালীঘাট অঞ্চলের এই বাড়িটায় রাত কাটিয়ে যান। বাড়িটা এখনও খালি।

ঠিকানা আমার কাছ থেকে সংগ্রহ করে নিয়ে যাবেন। অবশ্য আমি, ভালো-মন্দ হয়ে গেলে কোনোকিছুর জন্য দায়ী থাকব না। এই মর্মে আমাকে একটা লিখিত চুক্তিপত্র দিতে হবে।

সূচীপত্রে যান

সুরের মায়া

এই আমার এক অদ্ভুত শখ। নেশাও বলা যায়। শহরের মধ্যে যখন যেখানে নিলাম হয়, আমি ঠিক গিয়ে হাজির হই। যারা নিলাম হাঁকে, তাদের অনেকের সঙ্গে আমার মুখ চেনা হয়ে গেছে। আমার যেতে দেরি হলে তারা অপেক্ষা করে, নিলাম শুরু করে না।

বিশেষত ল্যাজারামের দোকানে প্রতি সেলে আমি গিয়ে হাজির হই। টুকিটাকি জিনিস কিনি। এর মধ্যে অনেকগুলোই দরকারে লাগে না। আমার কম করে আটটা সৌখিন ছড়ি হয়েছে, ফুলকাটা আখরোট কাঠের বাক্স গোটা ছয়েক, চারখানা পুরোনো আমলের চেয়ার, একটা নাকি রবার্ট ক্লাইভ ব্যবহার করতেন।

অনেক সময় ঠকেছি। রাজা রামমোহনের লেখার টেবিল বলে চড়া দামে আমাকে যেটা গছানো হয়েছিল, পরে জানতে পারলাম সেটা নিতান্ত সাধারণ টেবিল। রামমোহনের আমলে তার জন্মই হয়নি।

ঠকেও আমার চেতনা হয়নি। নিলামের বিজ্ঞাপন দেখে দেখে ঠিক গিয়ে হাজির হতাম। এইরকম এক নিলামে, বোধ হয় ল্যাজারামেরই, একটা ভালো জিনিস হাতে এল। ছোট্ট কটেজ পিয়ানো। বার্নিশ ম্লান হয়ে গেছে, কিন্তু তাতে আভিজাত্যের হানি হয়নি।

নিলামওয়ালা বলল, এ পিয়ানো এ দেশের নয়। সমুদ্রের ওপার থেকে এসেছে। রাজপরিবারের কে একজন এর মালিক ছিল, তারপর অবস্থা খারাপ হওয়াতে বিক্রি করে দিয়েছে। তারপর হাত বদলাতে বদলাতে কলকাতা শহরে এসে পিয়ানো হাজির হয়েছে।

মাত্র সাত-শো টাকায় এ জিনিস কিনতে পেরেছি শুনে বাদ্যরসিক বন্ধুবান্ধবেরা অবাক।

পরিচিত একজনকে দেখালাম। সে বলল, অনেকদিন ব্যবহার করা হয়নি। ভালো জিনিস। একটু টিউনিং করে নিতে হবে।

বসবার আর শোবার ঘরে জায়গা ছিল না। পিয়ানোটা পাশের ছোটো একটা ঘরে রেখে দিলাম। ঠিক করলাম, একজন মাস্টার রেখে সপ্তাহে দু-দিন পিয়ানো বাজানো শিখব।

ঈশ্বরের অসীম করুণা। গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য কোনো চিন্তা ছিল না। বাবা যখন মারা গেলেন, তখন বালিগঞ্জের এই বসতবাড়ি ছাড়া কলকাতায় তাঁর আরও তিনখানা বাড়ি ছিল। যা থেকে মাসিক আয় সাড়ে তিন হাজার। ব্যাঙ্কে ছ-লাখ টাকা, এ ছাড়া কোম্পানির কাগজ, শেয়ারে প্রায় চার লাখ। কাজেই আমার কোনো চিন্তাই ছিল না।

মা মারা গেছে অনেক আগে। ভাই-বোনের ঝামেলা নেই। আমি মা-বাপের একমাত্র সন্তান।

অবসর সময়ে সাহিত্য করি। সাহিত্য অর্থে গল্প উপন্যাস রচনা নয়। ভারি ভারি প্রবন্ধ লিখি। বেশিরভাগ প্রত্নতত্ত্বকে কেন্দ্র করে।

ভারতবর্ষের কোথাও মাটি খুঁড়ে পুরাকালের কোনো নিদর্শন পাওয়া গেছে শুনলেই ছুটে সেখানে চলে যাই।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হতাশ হই। দুটো সরা কিংবা হাঁড়ির ভাঙা টুকরো, তাই নিয়েই পণ্ডিতদের মধ্যে প্রায় হাতাহাতি শুরু হয়ে যায়। পালবংশের না সেনবংশের, তাই নিয়ে চুলোচুলি।

আর এক শখ এই নিলামে জিনিস কেনা। এর মধ্যেও অবশ্য প্রত্নতত্ত্বের পাগলামি আছে।

পিয়ানোটা যে রাত্রে দিয়ে গেল, সে রাত্রে শরীরটা একটু খারাপ ছিল। অল্প জ্বর হয়েছিল। সেইসঙ্গে সর্বাঙ্গে ব্যথা। তাড়াতাড়ি খেয়ে শুয়ে পড়েছিলাম।

সূচীপত্রে যান

একটু তন্দ্রার ভাব এসেছিল। সেই তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থাতেই শুনলাম, পাশের ঘরে পিয়ানো বেজে চলেছে, টুং টুং টুং।

কোনো শিক্ষিত হাতের ছোঁয়া নয়, কে যেন এলোপাথাড়ি একটার পর একটা পর্দা ছুঁয়ে চলেছে।

এরকম ধৃষ্টতা একজনের দ্বারাই সম্ভব। আর কেউ সাহস করবে না। আমার ভৃত্য নটবর। নিবাস কাঁথি। খুব ছেলেবেলায় তার বাপের সঙ্গে আসত। বাবা কাজ ছাড়বার সময় নটবরকে দিয়ে গেছে।

নটবর আমার খাস চাকর। আমার সবকিছু দেখাশোনা করে। তিনতলায় অন্য কোনো চাকরের ওঠবার হুকুম নেই।

নটবর বিশ্বাসী। নিঃসন্দেহে কাজের লোক। কিন্তু তার ধারণা, সে বাড়ির লোক। আমার যেকোনো জিনিসে সে নির্বিচারে হাত দেয়। ধমক দিলে দিন কয়েক কিছু করে না, তারপর যে কে সেই।

ও নিশ্চয় নটরাজের কাজ। নতুন আনা পিয়ানোর ওপর শিক্ষানবিশী করছে।

কিছুক্ষণের পর অসহ্য লাগল। বিছানা ছেড়ে চটিজোড়া পায়ে গলিয়ে নিলাম। একটু এগোতেই শব্দ থেমে গেল। আমার ওঠার আওয়াজ পেয়ে নটবর পালিয়েছে। ভোর রাতের দিকেও একবার যেন পিয়ানোর বাজনা শুনলাম। ঘুমের ঘোরে ঠিক বুঝতে পারলাম না। একটু শব্দ হয়েই থেমে গেল।

দিনের বেলা একেবারে চুপচাপ। রাত্রে মাঝে মাঝে টুং টুং করে বেজে ওঠে। নটবর নয়। মাঝরাতে ঘুম ছেড়ে উঠে পিয়ানো বাজাবে, নটবরের এমন শখ আর সাহস কোনোটাই নেই। পরে একটু ভেবে বুঝতে পারলাম, এ নিশ্চয় ইঁদুরের কারসাজি। পাশের ঘরটায় নানা ধরনের জিনিসপত্র ঠাসবোঝাই থাকাতে ইঁদুর আর আরশোলার দৌরাত্ম হয়েছে। বেশ বড়ো সাইজের ইঁদুর। তারই দু-একটা রিডের ওপর দৌড়োদৌড়ি করলে, এ ধরনের বাজনা হওয়া সম্ভব।

কোনো আমল দিলাম না।

কিন্তু একদিন আমল দিতে হল। বাইরে গিয়েছিলাম। দরজায় তালা দিয়ে। দরজা খুলতে গিয়েই থেমে গেলাম। ভেতরে পিয়ানো বাজছে। আগের মতো এলোমেলো বাজনা নয়, রীতিমতো শিক্ষিত হাত। কোনো গৎ বাজাচ্ছে।

আমার কোনো বন্ধু হয়তো বাজাচ্ছে। কিন্তু বন্ধু ঘরে ঢুকবে কী করে?

দরজা খুলতেই বাজনা থেমে গেল।

প্রথমেই পিয়ানোর ঘরে এসে দাঁড়ালাম। কোথাও কেউ নেই। শুধু পিয়ানোর ডালা খোলা। ঠিক যেন কেউ বাজাচ্ছিল, আমার ঘরে ঢোকার শব্দ পেয়ে উঠে গেছে। তাড়াতাড়িতে ডালাটা বন্ধ করতে ভুলে গেছে।

এই প্রথম অনুভব করলাম মেরুদণ্ড বেয়ে ভয়ের একটা শীতল শিহরণ! অপ্রাকৃতিক কিছু-একটার অস্তিত্ব প্রথম বুঝতে পারলাম।

এতদিন মনকে বুঝিয়েছিলাম ইঁদুরের উৎপাত, কিন্তু আজকের ঘটনা কী বলে বোঝাব?

অবশ্য আমি খুব দুর্বলচিত্ত নই। এ পৃথিবীতে জীবজগতের পাশাপাশি অশরীরী আত্মারাও বাস করে, এমন অর্বাচিন চিন্তা আমি করি না। এরকম মূঢ় বিশ্বাসও আমার নেই। বরং বন্ধুবান্ধবদের ভৌতিক তত্ত্ব আমি অবহেলায় উড়িয়ে দিই।

পিয়ানোর ব্যাপারটা ভৌতিক কিংবা অপ্রাকৃত ঘটনা ছাড়া আর কী?

দিন দুয়েক কিছু হল না।

তারপর আমি ভাবলাম, পিয়ানোটা যখন কিনলাম, তখন বাজানোটা একটু শিখি।

খুঁজে খুঁজে এক মাস্টার জোগাড় হল। পেয়ে গেলাম। আলবার্ট পেরেরা। গ্রিন ভ্যালি হোটেলে পিয়ানো বাজায়। ঠিক হল দু-শো টাকা নেবে সপ্তাহে দু-দিন শেখাবে। বুধ আর শনি। বিকেল বেলা।

তার আগে পিয়ানোটা টিউন করিয়ে নিলাম। যে লোকটা টিউন করতে এসেছল, সে বলল, 'খুব ভালো পিয়ানো সায়েব। এ জিনিস আর পাওয়া যায় না।'

সূচীপত্রে যান

রীতিমতো উৎসাহের সঙ্গে শিখতে শুরু করলাম।

যতক্ষণ পেরেরা থাকে, কোনো অসুবিধা হয় না। কিন্তু পেরেরা চলে যাবার পর আমি পিয়ানো বাজাতে গেলেই অসুবিধা আরম্ভ হয়।

পিয়ানোর সামনে টুলে বসতে গিয়েই চমকে উঠি। মনে হয় কে যেন আগে থেকে টুলে বসেছিল। আমি বসতে যেতেই সরে যাবার চেষ্টা করল। আমি বেশ একটা নরম দেহের আভাস পেলাম। ঠিক মনে হল, যেন কার কোলের ওপর বসে পড়েছি। তারপর রিডের ওপর আঙুল চালাতে গিয়েও এক বিপত্তি। আরেকটা নরম আঙুলের সঙ্গে ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে যাচ্ছে!

নিজেকে বোঝালাম। এ শুধু মনের ভুল। পিয়ানো সম্বন্ধে অলৌকিক একটা ভয় মনকে অধিকার করে আছে। এসব তারই প্রতিক্রিয়া।

কিছুদিন পর এ অস্বস্তিও কেটে গেল। সব স্বাভাবিক হয়ে গেল।

কিন্তু ওই দিন পনেরো। তারপর পেরেরা আসা বন্ধ করল।

প্রথমে ভেবেছিলাম অসুস্থ; খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম, না, পেরেরা ঠিক হোটেলে পিয়ানো বাজাচ্ছে। তবে কি তার দক্ষিণা মনঃপূত নয়? কিন্তু পেরেরাই দু-শো টাকা চেয়েছিল। আমি তাতে রাজি হয়েছি।

ঠিক করলাম, পেরেরার বাড়িতে গিয়েই দেখা করব।

পেরেরা পার্ক সার্কাস অঞ্চলে থাকে। তার বাড়িতে আমি আগেও গিয়েছি।

পেরেরা বাড়িতেই ছিল। আমাকে দেখে সে একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল।

'কী ব্যাপার, আপনি ক-দিন যাচ্ছেন না? অথচ শরীর নিশ্চয় অসুস্থ নয়, কারণ হোটেলে ঠিক বাজাচ্ছেন।'

তার বাইরের ঘরে গিয়ে বসলাম।

পেরেরা কফি আনল। কফিতে চুমুক দিতে দিতে তার কাহিনি শুনলাম।

'আপনি আমার কথা বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না। এই বিজ্ঞানের যুগে এমন একটা কাহিনি কাউকে বিশ্বাস করানোও মুশকিল।'

পেরেরা একটু দম নিল; তারপর আবার বলতে আরম্ভ করল, 'আপনাকে পিয়ানো শেখানোর পর বাড়ি ফিরে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়। স্বপ্ন মনে হয় বটে; কিন্তু আমি জানি, সপ্তাহে দু-দিন ঠিক একরকম স্বপ্ন কেউ দেখে না। আপনি জানেন আমি নেশা-ভাং করি। রোজই ডিনারের আগে মদ আমার চাই, কিন্তু মদ তো আমি নতুন খাচ্ছি না। আমার দশ-বারো বছরের অভ্যাস। এর আগে তো আমি কোনোদিন এসব দেখিনি।'

পেরেরার গৌরচন্দ্রিকার ধরন দেখে মনে হল, আসল বক্তব্যে সে আসতে দ্বিধা করেছে। পাছে তার বক্তব্য আমার বিশ্বাসযোগ্য না হয়।

তাই আমি বললাম, 'আমার সময় কম। আসল ব্যাপারটা কী বলে ফেলুন।'

পেরেরা শুরু করল, 'আপনি বোধ হয় জানেন না, আমি বহু ঘাটের জল খাওয়া লোক। গায়ে জোরও যেমন আছে, মনে সাহসও তেমনই। কিন্তু আপনাকে পিয়ানো শেখানোর ব্যাপারে আমি একটু গোলমালে পড়েছি। পাছে আপনি ভয় পান তাই আমি কিছু বলিনি। যখনই পিয়ানোর রিডে হাত চালাতাম, আর একটা অদৃশ্য হাতের সঙ্গে যেন হাত ঠেকে যেত। নরম হাত, কোনো স্ত্রীলোকের বলেই মনে হত।

আপনাকে যখন পিয়ানো শেখাতে যেতাম, যিশুর দিব্যি, পেটে একফোঁটা এ্যালকোহল থাকত না। কাজেই এমন হবার কথা নয়। কিন্তু এই স্বপ্ন আমাকে বিচলিত করেছে।

হঠাৎ খাটটা দুলে উঠল। আমি প্রথমে ভাবলাম ভূমিকম্প। না, শোবার ঘরের আর তো কিছু দুলছে না। রাস্তার আলোর কিছুটা ঘরে এসে পড়েছে। সেই আলোকে দেখলাম, বাতিটা তারে ঠিক ঝুলছে। একটুও দুলছে না।

পায়ের দিকে চোখ পড়তেই শরীরের রক্ত হিম হয়ে গেল। পরিষ্কার দেখলাম, একটা কবন্ধ! মানে মাথা নেই। অঙ্গে দামি মখমলের পোশাক। অনেক দূর থেকে ফোনের তারের মধ্যে দিয়ে যেমন স্বর ভেসে আসে,

সূচীপত্রে যান

তেমনই স্বরে কে বলল, "যদি প্রাণের মায়া থাকে, ও পিয়ানোতে হাত দিবি না। ও আমার পিয়ানো। তাতে আর কারও স্পর্শ আমি সহ্য করব না।"

তবু সাহস করে বললাম, "কোন পিয়ানো?"

খাটটা আবার নড়ে উঠল। তীক্ষ্ন হল কণ্ঠস্বর, "কোন পিয়ানো জানিস না? বাজাবার সময় আমি অনেক বার বাধা দিয়েছি। ভালো চাস তো ও পিয়ানোয় একদম হাত দিবি না!"

পরের দিন সকালে উঠে রাতের স্বপ্নটাকে বিশেষ আমল দিইনি। অবশ্য এখন বুঝতে পারছি, ওটা আদৌ স্বপ্ন নয়।

ভাবলাম, নির্ঘাৎ সুরার প্রভাব।

তারপরের দিন আপনার ওখানে যাবার কথা। সেজেগুজে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছি বাসের আশায়। হঠাৎ কালো একটা মোটর সামনে দিয়ে নক্ষত্রবেগে যাবার সময় আমার সারা পোশাকে কাদা ছিটিয়ে গেল। একেবারে আপাদমস্তক।

মেজাজ খিঁচড়ে গেল। বাড়ি ফিরে এলাম। স্নান সেরে আর যাবার ইচ্ছা হল না। ভাবলাম, ফোনে পরের দিন আপনাকে জানিয়ে বিকালে যাব।

রাত্রে সেই এক ব্যাপার। খাট কেঁপে উঠল। বাতি জ্বালিয়ে রেখেছিলাম। আচমকা বাতি নিভে গেল। পায়ের কাছে সেই কবন্ধ মূর্তি! এবারে রাগে যেন একেবারে ফেটে পড়ল; "কী আমার কথা কানে গেল না। আবার তুই পিয়ানোয় হাত দিয়েছিলি? বলেছি, ও পিয়ানোতে আর কারও স্পর্শ সহ্য করব না। মুখে রক্ত উঠে মরবি!"

কথার সঙ্গে সঙ্গে কবন্ধমূর্তিটা বিরাট হয়ে ছাদ স্পর্শ করল।

আমি বেশ বুঝতে পারলাম, স্বপ্ন নয়, সবকিছু আমি জেগে জেগে দেখছি। বুকের মধ্যে তীব্র একটা যন্ত্রণা অনুভব করলাম। বুকে ঝোলানো ক্রস ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করলাম, আর নয়, আর এই সর্বনেশে পিয়ানোর ধারে-কাছে যাব না। আপনি আমাকে মাপ করুন, আপনি অন্য কোনো শিক্ষক খুঁজে নিন।'

পেরেরার বাড়ি থেকে যখন বের হলাম, তখন মনের অবস্থা অবর্ণনীয়। অতিন্দ্রীয় জগৎ সম্বন্ধে আমার কোনো ধারণাই ছিল না। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু ভয়ের একটা কালো ছায়া মনকে আচ্ছন্ন করে রইল।

পিয়ানোটা যে স্বাভাবিক নয়, তা তো আমি বুঝতে পেরেছি। আমার কথা পেরেরাকে আর বলিনি।

কিন্তু পেরেরার কাহিনি শোনবার পর আমার আর পিয়ানোর কাছে যেতে সাহস হল না। মনে মনে ঠিক করলাম পিয়ানোটা আবার ল্যাজারামের দোকানে ফেরত দিয়ে আসব। ওইখানে দিয়ে কাউকে বিক্রি করে দিক।

এর মধ্যে আবার এক কাণ্ড ঘটল।

দুপুর থেকে কালো মেঘ সারা আকাশ ছেয়ে গিয়েছিল। ঘন অন্ধকার দু-হাত দূরের লোক দেখার উপায় নেই।

বিকেল হবার সঙ্গে সঙ্গে তুমুল বর্ষণ আরম্ভ হল। বাজের শব্দে কান পাতা দুষ্কর। বিদ্যুতের তীব্র ঝিলিক। একটু বাইরে বের হবার দরকার ছিল। হল না। চুপচাপ বন্ধ জানলার কাছে চেয়ার পেতে প্রকৃতির তাণ্ডব নাচ দেখতে লাগলাম। হঠাৎ বৃষ্টি আর বাজের শব্দ ছাপিয়ে পিয়ানোর শব্দ!

বেশ শিক্ষিত হাতের বাজনা। বিদেশি কোনো গান বাজাচ্ছে।

পা টিপে টিপে উঠে পড়লাম। কী করে বাজাচ্ছে একবার দেখতে হবে।

এ ঘরে বাতি জ্বালানো ছিল। এ ঘরের আলো পিয়ানোর ঘরে পড়ে। কাজেই দেখবার অসুবিধা নেই।

জানলার কাছে গিয়েই থেমে গেলাম। সমস্ত শরীর শিউরে উঠল। মাথার চুল হল সজারুর কাঁটার মতন। মনে হল, বুকের ধুকধুক শব্দটা এখনই বুঝি থেমে যাবে।

সূচীপত্রে যান

কোনো মানুষ নেই। শুধু পিয়ানোর রিডের ওপর ধবধবে সাদা দুটি হাত এদিক থেকে ওদিকে যাচ্ছে। সরু চাঁপার কলির মতন আঙুলের ছোঁয়ায় চমৎকার ঝংকার উঠছে। মণিবন্ধ পর্যন্ত দুটি হাত। নিঃসন্দেহে সে দুটি হাত স্ত্রীলোকের। মণিবন্ধ থেকে টপটপ করে রক্তের ফোঁটা মেঝের ওপর পড়ে পড়ছে!

যখন জ্ঞান হল, দেখলাম বিছানায় শুয়ে আছি। একপাশে ডাক্তার, অন্যপাশে ভৃত্য নটবর।

ডাক্তার বলল, 'কাছেই বাজ পড়েছিল; সেই শব্দে আপনি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। দিন সাতেক সম্পূর্ণ বিশ্রাম। বিছানা ছেড়ে উঠবেন না।'

চুপ করে সব শুনে গেলাম। জানি আসল কথা বললে কেউ বিশ্বাস করবে না।

সেরে উঠেই ল্যাজারামের ওখানে চলে গেলাম।

ম্যানেজার প্রিন্টোর সঙ্গে আমার অনেকদিনের জানাশোনা। তাকে বললাম, 'আচ্ছা, যে পিয়ানোটা নিলামে আমি কিনেছিলাম, সেটা কার কাছ থেকে আপনারা পেয়েছিলেন?'

'কেন বলুন তো?'

'এমনিই জিজ্ঞাসা করছি।'

দাঁড়ান দেখে বলছি।

পিন্টো বিরাট খাতা খুলে কিছুক্ষণ দেখল; তারপর বলল, 'আমাদের এখানে নিলামের জন্য দিয়েছেন মিসেস ক্রিস্টোফার। সার্কাস রেঞ্জে বাসা।'

ঠিকানা লিখে নিলাম।

'কী ব্যাপার বলুন তো? পিয়ানোর মধ্যে কিছু পেয়েছেন?'

'কী পাব?'

'টাকাকড়ি কিছু। আমি ভাবলাম বুঝি মালিককে ফেরত দেবেন।'

'না, না, সেসব কিছু নয়। পিয়ানো সম্বন্ধে দু-একটা কথা জিজ্ঞাসা করবার আছে। আচ্ছা ধন্যবাদ।'

খুঁজে খুঁজে ঠিক গিয়ে হাজির হলাম মিসেস ক্রিস্টোফারের বাড়ি।

আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, এ রহস্যভেদ করবই।

মিসেস ক্রিস্টোফার প্রথমে কিছুতেই বলতে চায় না। অনেক অনুরোধ উপরোধের পর বলল, 'পিয়ানোটা আমার বোনের। বোন বিলেতে থাকত। পিয়ানোতে অদ্ভুত দখল ছিল। বোন মারা গেলে পিয়ানোটা আমি এখানে নিয়ে আসি।'

'আপনি বিক্রি করে দিলেন কেন?'

কিছুক্ষণ নীরব মিসেস ক্রিস্টোফার।

'আমাদের মধ্যে লুকোচুরি করে লাভ নেই; আপনি পিয়ানোটা কেন নিজের কাছে রাখতে চাননি আমি জানি। খুবই স্বাভাবিক; বোনের স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে পিয়ানোটার দাম আপনার কাছে অনেক। কিন্তু ওই পিয়ানোতে আপনার বোনের আত্মা ভর করে আছে। তিনি কাউকে পিয়ানো ছুঁতে দেন না। তাইতো?'

আবিষ্টের মতো মিসেস ক্রিস্টোফার আস্তে আস্তে ঘাড় নাড়ল, 'হ্যাঁ।'

'আপনার বোন কীভাবে মারা গিয়েছিলেন?'

মিসেস ক্রিস্টোফার উঠে গিয়ে সোরাই থেকে জল গড়িয়ে খেল। পুরো এক গ্লাস। তারপর বাইরের দিকে চোখ ফিরিয়ে আস্তে আস্তে বলল, 'আমার বোন লিজা বেঁচে নেই। বিলেতে বোমায় মারা গেছে। গত যুদ্ধের সময়। যখন বোমা পড়ছিল, লিজা তখন পিয়ানোতে তন্ময়। আমিও সেইসময় ওখানে ছিলাম। সাইরেন বাজার সঙ্গে সঙ্গে আমরা সেন্টারে যাই। লিজার খেয়ালই নেই।

কিছুক্ষণ পরে অল ক্লিয়ার হতে বাড়িতে ফিরে দেখি, লিজার শরীর বোমার আঘাতে ছিন্নবিচ্ছিন্ন। শুধু দুটো হাত পিয়ানোর ওপর।

সূচীপত্রে যান

লড়াই থামতে আমি চাকরি নিয়ে এদেশে ফিরি। চাকরি আমার ছিলই, আমি শিক্ষকতার একটা কোর্স শেষ করার জন্য বিলেত গিয়েছিলাম। পিয়ানোটা সঙ্গে নিয়ে আসি।

তারপর প্রতি রাত্রে পিয়ানোর টুং টাং কানে আসে। উঠে গিয়ে দেখি কোথাও কিছু নেই। এক ঝড়ের রাতে পিয়ানোর জোর আওয়াজ হতে দেখলাম, লিজার দুটো হাত রিডের ওপর চঞ্চল। মনে হল, বোমার আওয়াজের সঙ্গে রাগের শব্দের মিল আছে বলেই বোধ হয় দুর্যোগের রাতে লিজার ছিন্ন হাত দেখা যায়। তারপর পিয়ানোটা নিলামে দিয়ে দিই।'

চলে এলাম। আমার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছি। অতীন্দ্রিয় জগতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সব দ্বিধার অবসান।

সূচীপত্রে যান

প্রতিহিংসা

এ কাহিনি এতদিন কাউকে বলিনি। জানতাম বড়োদের বলে লাভ নেই, তারা একটি বর্ণও বিশ্বাস করবে না। সবকিছু তারা যুক্তির কষ্টিপাথরে যাচাই করতে চাই।

কিন্তু পৃথিবীতে এমন অনেক ঘটনা আছে, সেগুলো যুক্তি নির্ভর নয়। তাদের ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। তাই আমরা বলি অলৌকিক ঘটনা। কারণ পৃথিবীতে সচরাচর যা ঘটে, ঘটতে পারে, সেই মাপকাঠিতে এ কাহিনি বিচার চলে না।

এমন এক অলৌকিক ঘটনা আমার জীবনে ঘটেছিল। কাজকর্মের অবকাশে সে কাহিনি মনে পড়লে এখনও চমকে উঠি। মাঝরাতে স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে দেখি মাঝে মাঝে তারই ছায়া। ঘুম ভেঙে বিছানার উপর উঠে বসি। রাতটুকু আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে কাটাতে হয়।

আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগেকার কথা।

আমি তখন লোচনপুর হাইস্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্র। এক ইতিহাস ছাড়া অন্য সব বিষয়গুলোর মোটামুটি ভালোই ছিলাম, অঙ্কে বিশেষ ভালো, অনেক চেষ্টা করেও ইতিহাসের সাল তারিখগুলো কিছুতেই কণ্ঠস্থ করতে পারতাম না। মোঘল আর পাঠান বাদশাহের নামগুলো গোলমাল হয়ে যেত। সতীদাহ প্রথা বোধ হয় বেন্টিঙ্ক না ডালহৌসি কার অক্ষয় কীর্তি, সেটা মাথা চুলকে চুল উঠিয়ে ফেললেও মনে রাখতে পারতাম না। ফলে ইতিহাসের পরীক্ষার দিন আমার অবস্থা রীতিমতো সঙ্গীন হয়ে দাঁড়াত। বাড়ি থেকে স্কুল যাওয়ার পথে যতগুলো মন্দির পড়ত, সবগুলোতে মাথা ঠেকাতাম। রাস্তার দু-পাশের বড়ো সাইজের পাথরের নুড়িও বাদ দিতাম না।

আমার সঙ্গে পড়ত পশুপতি সামন্ত। ইয়া জাঁদরেল চেহারা। অমাবস্যাকেও হার মানানো গায়ের রং। ছেলেবেলায় মা-বাবা দুজনেই মারা গিয়েছিল। থাকত দূর সম্পর্কের এক পিসির কাছে। সেখানে তার লাঞ্ছনা-গঞ্জনা অন্ত ছিল না।

এই পশুপতি অন্যসব বিষয়ে জুত করতে পারত না, কিন্তু ইতিহাসে একেবারে নাম-করা ছাত্র। ইতিহাসের শিক্ষক নিবারণবাবু পর্যন্ত তাঁর ভক্তর তারিফ না-করে পারতেন না। আমরা যখন এক পানিপথের যুদ্ধেই আধমরা হবার উপক্রম হয়েছি, তখন পশুপতি সমস্ত প্রশ্নপত্রের উত্তর দিয়ে পরীক্ষার হল থেকে বেরিয়ে যেত।

কিন্তু অঙ্কে পশুপতি সামন্তের অবস্থা কাহিল। সোজা সোজা অঙ্কগুলো কষতেও সে হিমসিম খেয়ে যেত। একটা বানর চর্বি মাখানো বাঁশে ঘণ্টায় দু-ফিট উঠছে আর নামছে এক ফিট, বাইশ ফিট বাঁশে উঠতে তার কত দেরি হবে। এমন একটা নিরীহ প্রশ্নে পশুপতি মুখটা এমন করে বসে থাকত, মনে হত তার অবস্থা ওই বানরবর্গর চেয়েও মারাত্মক। গরমের ছুটিতে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত পশুপতি অঙ্কের পর অঙ্ক কষে গেছে, গোটাদুয়েক খাতা শেষ, তাতেও বিশেষ সুবিধা করতে পারত না। বেচারী নিজেই বলত, আমার দ্বারা হবে না ভাই। অঙ্কটা কিছুতেই আমার মাথায় ঢুকবে না।

আমাদের আমলে প্রাইভেট টিউটর রাখার এত রেওয়াজ ছিল না। তবু আমরা পশুপতিকে বলেছিলাম, একটা ভালো দেখে অঙ্কের মাস্টার বাড়িতে রেখে দে বরং।

পশুপতি কোনো উত্তর দেয়নি। ছলছল চোখে আমাদের দিকে চেয়েছিল। তার মনের ব্যথাটা বুঝতে আমাদের অসুবিধা হয়নি। পিসি কোনোরকমে বাড়িতে ঠাঁই দিয়েছে। দু-বেলা দু-মুঠো ভাত আর সাধারণ জামা কাপড়ের বদলে তাকে দিয়ে রাজ্যের কাজ করিয়ে নেয়। ছুটির দিন আমরা দেখেছি, পশুপতি বসে

সূচীপত্রে যান

বসে বেড়া বাঁধছে। এরপর প্রাইভেট টিউটরের বাড়তি খরচের কথা বললে পিসি তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়েই দেবে।

মনে মনে আমি কিন্তু পশুপতিকে হিংসে করতাম। কারণ যে ইতিহাসের লবণাক্ত সমুদ্রের আমি হাবুডুবু খাই, কূল পাই না, সেই ইতিহাসের যে তারিখগুলো আমার কাছে হুলের শামিল সেইসব সন তারিখগুলো পশুপতি এমনভাবে আওড়ে যায় যেন অতি সাধারণ ব্যাপার।

আর একটা কারণও ছিল। আমি আশা করেছিলাম পশুপতি আমায় অনুরোধ করবে। আমি অঙ্কে ভালো, মাঝে মাঝে তাকে যাতে অঙ্কের ব্যাপারে সাহায্য করতে পারি। কিন্তু পশুপতি এ বিষয়ে কোনোদিন একটি কথাও বলেনি, অনুরোধ তো দূরের কথা!

আমরা ক্লাসে সবশুদ্ধ আটচল্লিশ জন ছেলে। তার মধ্যে টেস্টে পাশ করলাম চল্লিশ জন। পশুপতিও একজন। অঙ্কে সে পাশ করেনি, কিন্তু হেডমাস্টারের হাতে-পায়ে ধরে ফাইনালে বসার অনুমতি পেল। প্রতিশ্রুতি দিল, মাঝখানের সময়টা সব ছেড়ে শুধু অঙ্ক করবে।

আমার অবস্থা ঠিক বিপরীত। ইতিহাসে ফেল করলাম না বটে, তবে কোনোরকমে কান ঘেঁষে বেরিয়ে গেলাম। একেবারে টলমলে অবস্থা। আমিও ঠিক করলাম, ছুটির বেশি সময়টুকু ইতিহাসেই নিয়োজিত করব।

প্রবেশিকা পরীক্ষা হত শহরে। বিবিগঞ্জে। আমাদের গ্রাম থেকে চার মাইল দূরে। বাবার এক আলাপী উকিল ছিল সেই শহরে, আমি পরীক্ষার আগের দিন সেখানে গিয়ে উঠলাম। ক্লাসের অন্য ছেলেরা কে কোথায় উঠেছিল খোঁজ রাখিনি। তখন খোঁজ রাখার মতো মনের অবস্থাও নয়।

পরীক্ষার হলে সকলের সঙ্গে দেখা হল। ইংরেজি, বাংলা দুটো পরীক্ষা নির্বিবাদে শেষ হল, পশুপতির সিট পড়েছে ঠিক আমার সিটের পিছনে।

তৃতীয় দিন অঙ্ক। হলে ঢোকবার মুখেই পশুপতির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। একেবারে সামনাসামনি। কপালে আধুলি সাইজের টিপ। পকেট বোঝায় ফুল আর বেলপাতা। এতরকম অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়েও পশুপতি মুখে নির্ভীক ভাব ফোটাতে পারেনি। দুটি চোখে বিষণ্ণ বিপদের ছায়া।

পরীক্ষা আরম্ভ হল। চারটি অঙ্ক শেষ করে পাঁচ নম্বর অঙ্কটি শুরু করেছি, হঠাৎ চেয়ারটি নড়ে উঠল।

পিছনে পশুপতি। ভাবলাম পা সরাতে গিয়ে চেয়ারে হয়তো লেগে গিয়েছে। আবার পরীক্ষার খাতায় মনোনিবেশ করলাম।

আবার নড়ে উঠল চেয়ার। আড়চোখে পিছনে দেখতেই কানে ফিসফিস করে শব্দ হল।

'অঙ্কগুলো দেখা না। আমি একটাও পারছি না।'

গোটা তিনেক গার্ড অবশ্য এধার-ওধারে ছিলেন। তাঁরা খুব কড়া এমন মনে হল না। দুজন তো হাতে খোলা বই নিয়ে পায়চারি করছেন। ছাত্রদের দিকে নয়, তাঁদের নজর বইয়ের পাতায়। আর একজন একেবারে কোণের দিকে দাঁড়িয়ে আছেন।

আমি যদি একপাশে একটু সরে বসি আমার খাতা দেখে অঙ্কগুলো টুকে নিতে পশুপতির কোনো অসুবিধা হবে না। সব টোকবার দরকার নেই। গোটা চার-পাঁচ অঙ্ক টুকে নিলেই যথেষ্ট। পাশ নম্বর হয়ে যাবে। কিন্তু আমি নিজেই শরীরটা দিয়ে খাতাটা আরও ঢেকে বসলাম। যাতে কোনোদিকে কোনো ফাঁক না থাকে। পশুপতি আমার কষা একটা অঙ্কও দেখতে না পায়।

মনকে বোঝালাম দুর্নীতির প্রশ্রয় দেওয়া কিছুতেই উচিত নয়। ধরা পড়লে দুজনেরই সর্বনাশ।

অবশ্য এসব নীতিকথার অন্তরালে আমার মনের হিংসেটাই প্রকট হয়ে উঠেছিল। পশুপতি আমার পিছনে, কাজেই ইতিহাসের দিন তার কাছ থেকে বিশেষ সাহায্য পাব এমন ভরসা কম। তা ছাড়া নিতান্ত বেখাপ্পা প্রশ্ন যদি না-আসে, তাহলে ইতিহাস হয়তো কোনোরকমে আমি পাশ করে যেতে পারি। কিন্তু পশুপতির খেদোক্তি শুনে মনে হচ্ছে, একটা অঙ্কও শেষ পর্যন্ত ঠিক করতে পারেনি।

আরও কয়েক বার চেয়ারটা নড়ে উঠল, পশুপতির করুণ অনুনয়ের সুর কানে এল। আমি অনড় অটল।

সূচীপত্রে যান

দেখলাম সময় শেষ হবার আধঘণ্টা আগে পশুপতি অঙ্কের খাতা জমা দিয়ে টলতে টলতে বাইরে চলে এল।

পরের দিন ইতিহাস। আমার অগ্নিপরীক্ষার দিন। তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে ইতিহাসের বইগুলো নিয়ে বসলাম। দরকার হলে অনেক রাত অবধি পড়ব। মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন।

কিন্তু যখন পড়তে লাগলাম মনে হল বিশেষ সুবিধা করতে পারছি না। মোগল সম্রাটদের ছুঁচালো দাড়িগুলো যেন সর্বাঙ্গে ফুটতে লাগল। আগে বাবর না আকবর কিছুতেই মনে করে উঠতে পারলাম না! দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেল হর্ষবর্ধনের বাপের নাম গোবর্ধন।

ফরাসিদের পীঠস্থান ফরাসডাঙা পটলডাঙার কাছে কিনা সেটা নিয়েও চিন্তিত হয়ে পড়লাম।

আসল কথা, একে ইতিহাসের জ্ঞান খুব গভীর নয়, তার ওপর আসন্ন বিপদের উত্তেজনা সব মিলে যেটুকু এত কষ্ট করে এতদিন ধরে কণ্ঠস্থ করেছিলাম সব বেমালুম ওলোটপালোট করে দিল।

সর্বনাশ, একেবারে মাথায় হাত দিয়ে বসলাম।

হঠাৎ খুট করে শব্দ! দরজার দিকে চেয়েই চমকে উঠলাম।

চৌকাঠের ওপর পশুপতি। সেই কপালে সিঁদুরের ফোঁটা, পকেট ভরতি ফুল, বেলপাতা।

'এ কীরে তুই?'

'চলে এলাম। একটা গোপনীয় খবর আছে।'

'গোপনীয় খবর?' প্রশ্ন করতে গিয়ে মনে পড়ে গেল রাত ন-টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে উকিলবাবুদের গেট বন্ধ হয়ে যায়। বাইরে থেকে লোক ঢোকার কোনো উপায় নেই।

'তুই ঢুকলি কী করে?'

'গেটের কাছে চাকর দাঁড়িয়েছিল একটা, তাকে তোর কথা বলতে গেট খুলে দিল।' কথা বলতে বলতে পশুপতি এগিয়ে এসে আমার তক্তপোশের ওপর বসল।

'আমার তো এ শহরে চেনাজানা কেউ নেই। আমি এখানে এক চায়ের দোকানের পিছনে চারপাই পেতে আশ্রয় নিয়েছি। একটু আগে সেখানে দুজন শিক্ষক এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন সম্ভবত আমাদের ইতিহাসের প্রশ্নপত্র করেছেন। চায়ের দোকানে বসে তাঁরা সেই বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন। আমি পার্টিশনের আড়াল থেকে বসে বসে শুনেছি।'

'বলিস কী?' আমি উত্তেজনায়, আনন্দে টান হয়ে বসলাম।

'আমি প্রশ্নগুলো বলছি তুই লিখে নে। তোর কথাই আগে মনে পড়ল। তা ছাড়া তোকে এ-বাড়িতে ঢুকতে দেখেছি। তোর অস্তানা চিনি, তাই ছুটে আগে তোর কাছেই এলাম।'

পশুপতির এত কথা কানে গেল না। আমি কাগজ পেনসিল নিয়ে একেবারে তৈরি। হাতে সময় কম। প্রশ্নগুলো জানতে পারলে সারারাত ধরে একবার চেষ্টা করব।

'লেখ, অশোকের রাজ্যপ্রণালী, আকবর ও আওরঙ্গজেবের তুলনামূলক সমালোচনা, মোগল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ, শিবাজীর সাম্রাজ্য বিস্তার কাহিনি, লর্ড কর্নওয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত— এই কটাই আমি শুনতে পেয়েছি।' পশুপতি বলল।

'যথেষ্ট, যথেষ্ট,' উৎসাহে আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, 'এই ক-টা ঠিকমতো লিখতে পারলেই হয়ে যাবে।' পাশ করার ভাবনা গেল। হয়তো ভালো নম্বরও পেয়ে যেতে পারি।

এতক্ষণ পরে পশুপতির জন্য আমার মায়া হল। বেচারীকে কয়েকটা অঙ্ক দেখালেই হত। ইতিহাসের প্রশ্ন জানতে পেরে ছুটে আগে তো আমার কাছেই এসেছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'অঙ্ক কেমন হল?'

স্পষ্ট দেখতে পেলাম পশুপতির মুখে বিষণ্ণ একটা ছায়া নামল। একটু যেন বিমর্ষ ভাব।

সূচীপত্রে যান

অন্যদিকে চেয়ে বলল, 'ওই একরকম। যা হয়ে গেছে তার কথা আর ভাবছি না। পিছন দিকে দেখলে নিজের বড়ো ক্ষতি হয়। আমি চলি। তুই পড়।'

পশুপতি বেরিয়ে গেল। প্রায় সারা রাতই পড়ালাম। ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। উঠতে দেরি হয়ে গেল। কোনোরকমে স্নান সেরে, দুটি মুখে দিয়ে ছুটতে ছুটতে হলে যখন গিয়ে পৌঁছোলাম, তখন পরীক্ষা শুরু হতে আর মিনিট দুয়েক।

বেশ খুশি হয়েই প্রশ্নপত্রটা টেনে নিলাম। তারপর অনেকক্ষণ আর চোখের সামনে কিছু দেখতে পেলাম না। পুঞ্জীভূত ধোঁয়া কখনো গাঢ়, কখনো একটু তরল!

সারা প্রশ্নপত্রে অশোকের নাম নেই। বাবর আর আকবরের তুলনার বদলে সাজাহানের সৌন্দর্যপ্রিয়তার প্রশ্ন রয়েছে। মোগল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ নয়, মারাঠা রাজ্যের পতনের কারণ নির্ণয় করতে দেওয়া হয়েছে। শিবাজীর জীবনী কোথাও নেই, তার পরিবর্তে হায়দার আলীর উত্থানের কাহিনি।

মোটকথা পশুপতির বলা একটি প্রশ্নও আসেনি।

কিছুক্ষণ পর গোটা প্রশ্নপত্রটাই চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল। বুঝতে পারলাম দু-চোখ জলে ভরে এসেছে।

এমন করেই বুঝি পশুপতি আমার উপর প্রতিশোধ নিল।

কিন্তু বিস্মিত হবার আমার আরও একটু বাকি ছিল।

ঘণ্টা বাজতে কোনোরকমে খাতাটা জমা দিয়ে বাইরে চলে এলাম। একটু দাঁড়ালাম যদি পশুপতির সঙ্গে দেখা হয়!

পশুপতিকে দেখতে পেলাম না, রাজীব এসে সামনে দাঁড়াল। আমাদের হেডমাস্টারের ছেলে।

'ব্যাপারটা শুনেছ?'

'কী ব্যাপার?'

'পশুপতি কাল পরীক্ষার হল থেকে বেরিয়ে রেলের তলায় মাথা দিয়েছে।'

সমস্ত শরীরটা কেঁপে উঠল। জড়ানো কণ্ঠে বললাম, 'কে বললে?'

'বাবাকে খবর পাঠানো হয়েছিল। বাবা পশুপতির পিসিকে নিয়ে আজ সকালে এসে পৌঁছেছেন। বাবার কাছেই শুনলাম কোমর থেকে একেবারে দু-খণ্ড হয়ে গেছে।'

'কটার সময় হয়েছে এটা?'

'আকন্দপুর এক্সপ্রেস এখান দিয়ে ছ-টা তিরিশে যায়, সেই সময়েই।'

'কিন্তু ও যে—' কথাটা বলতে গিয়েই থেমে গেলাম। যে পশুপতি সাড়ে ছ-টায় শেষ হয়ে গিয়েছে সে রাত সাড়ে ন-টায় বহাল তবিয়তে আমার ঘরে গিয়ে আমাকে ইতিহাসের একগাদা প্রশ্ন বলে এসেছে। এমন আজগুবি কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। বরং আমাকেই মাতাল সাব্যস্ত করবে।

মাথা নীচু করে আস্তে আস্তে সরে এলাম।

শেষ মুহূর্তে হলে ঢুকেছিলাম, সারাক্ষণ উত্তেজিত অবস্থা, কাজেই পিছনের সিটে পশুপতি এসেছে কিনা সেটা আদৌ লক্ষ করিনি।

কিন্তু একটা কথা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারলাম না।

মৃত্যুর পরেও কি পরলোকগত আত্মার বিদ্বেষ, প্রতিহিংসার প্রবৃত্তি থাকে? তা যদি নাই থাকবে, তবে পশুপতি ওভাবে প্রতিশোধ নিতে কেন আবার আমার কাছে এসে দাঁড়াবে!

সূচীপত্রে যান

মৃত্যুর পরে

পরীক্ষা শেষ। অঢেল অবসর। কী করে সময় কাটাব তাই ভাবছি।

সিনেমার নেশা আমার বিশেষ নেই। খেলা দেখবার শখ একটু আছে। তবে আজকাল খেলা দেখা মানে মারপিট দেখা। শুধু মারপিট দেখাই নয়, মার খাওয়াও। পুলিশ মাঝে মাঝে ঘোড়া ছুটিয়ে দেয়। শিক্ষিত ঘোড়া ঠিক পা চালায় মানুষের তলপেট লক্ষ করে। প্রায়ই মনে হয় খেলোয়াড়দের বদলে যদি এইরকম এগারোটা ঘোড়াকে নামিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে বোধ হয় খেলাটা সত্যিই জমে। গোলের কাছে এরকম লুকোচুরি না-করে, জালে বল আটকানোর আসল চেষ্টা হয়।

এইরকম যখন মনের অবস্থা, সারা দিন গল্পের বই পড়ে কাটাচ্ছি, গল্প আর ভালো লাগছে না, তখন এক কাজ ঘাড়ে এসে চাপল।

এর আগে অবশ্য পাড়ার সরকারি কাকা একটা কাজের ভার দিয়েছিলেন, 'হ্যাঁরে সতে, রকে বসে বসে সময় নষ্ট করছিস কেন? খবরের কাগজও পড়িস না?'

কথাটা বুঝতে পারলাম না।

আমতা আমতা করে বললাম, 'খবরের কাগজ? হ্যাঁ, পড়ি তো।'

'ছাই পড়িস!' সরকারি কাকা মুখে অদ্ভুত ভঙ্গি করলেন, 'পড়িসনি, ছেলেরা পরীক্ষার পর সব গাঁয়ে গিয়ে সেখানকার লোকদের অক্ষরপরিচয় করাচ্ছে। এতে দেশের কত উপকার হয় বল তো?'

এবারে কোনো উত্তর দিলাম না।

এ ব্যাপারে আমার নিজের খুব তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে।

একবার পরীক্ষার পর ঠিক করলাম অশিক্ষিতদের জ্ঞানদান করব। হাতের কাছে ঘরামি হারাধনকে পেয়ে গেলাম। সেইসময় বাড়ির চুনকাম হচ্ছিল। হারাধনকে বললাম, 'হারাধন, তোমার তো ভারি কষ্ট।'

হারাধন মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, 'খুব কষ্ট দাদাবাবু। কী করে জানতে পারলে? চুলকানিতে সারা গা ভরে গেছে।'

'আহা, সে কষ্ট বলছি না। এই যে লেখাপড়া জানো না, এর জন্য কষ্ট হয় না?'

'কষ্ট? তা একটু একটু হয়। লোকে ঠকায়।'

'তাই তো বলছি, রোজ রাত্রে আমি তোমাকে পড়াব।'

হারাধন যে খুব খুশি হল না, সেটা তার মুখ দেখেই বোঝা গেল। অবশ্য প্রথম পড়তে বসতে সবাই এইরকম গররাজি হয়।

সে রাতেই প্রথম ভাগ নিয়ে বসলাম। হারাধন মুখ-হাত ধুয়ে এসে বসল। স্বরবর্ণ পার হলাম কোনোরকমে, আটকাল 'ঞ'-তে গিয়ে। হারধন 'ঞ' বলতে পারল না। বলল, মিও।

আমি চটে উঠতে বলল, 'ওসব বেড়ালের ডাক পারব না দাদাবাবু। ওটা তুমি বাদ দাও।'

'ঞ'-র বিশেষ সার্থকতা নেই। ওটা বাদই দিলাম।

এরপর আটকালে 'দ'য়ে। 'দ' বলতেই হারাধন হেসে কুটিপাটি। 'একবার মিত্তিরবাবুদের বাড়ি রং করার সময় মচা ভেঙে একেবারে রাস্তার ওপর পড়েছিলাম। সবাই বলেছিল, আমি হাড়গোড় ভাঙা ''দ'' হয়ে গেছি। বাঁচবার আশা ছিল না দাদাবাবু। ওই ''দ''টাও বাদ দাও। আমার সেদিনের চেহারাটা মনে পড়ে যায়।'

এবার আমি বাদ দিতে রাজি হলাম না।

হারাধন হঠাৎ বলল, 'ওটা কী গো দাদাবাবু?'

সূচীপত্রে যান

আমি দেয়ালের দিকে চোখ ফেরালাম, 'কোনটা?'

'ওই যে একটা ফাটল। এইবেলা মোরামত না করলে দেয়াল যে ভেঙে চৌচির হয়ে যাবে!'

চিন্তিত হলাম। 'তাহলে কী করা যায়?'

হারাধন অভয় দিল, 'কোনো ভয় নেই। বাড়িতে বালি, চুন, তো রয়েইছে। আমি তোমাকে শিখিয়ে দেব। তুমি আমাকে লেখাপড়া শেখালে, আমি শেখাব বাড়ি মেরামত।'

পাড়ার পার্ট শেষ হল।

কর্ণিক হাতে আমি মিস্ত্রিগিরির প্রথম পাঠ নিলাম। মাস খানেক পরে দেয়াল ভেঙে বালির প্রলেপ। রাতে ঠিক থাকে, সকাল হলেই চুল-সরু ফাটল দেখা যায়। আশা ছেড়ে দিলাম আমি।

হারাধন বলল, 'আপনার মশলা মেশানো ঠিক হয়নি দাদাবাবু।'

সেই থেকে শিক্ষাদানের ব্যাপারে আমি রীতিমতো শঙ্কিত।

'জানিস, বিদেশে ছেলেরা কীভাবে ছুটি কাটায়?' সরকারি কাকার কথায় বর্তমানে ফিরে আসি। ব্যাপারটা জানা ছিল না, তাই সরকারি কাকার কথায় মাথা নাড়লাম।

'হুঁ।' নাক দিয়ে সরকারি কাকা ঘোড়ার মতন একটা শব্দ করে বললেন, 'ভালো খবর জানবি কী করে? কোথায় কী সিনেমা হচ্ছে কণ্ঠস্থ। শোন বলি—'

সরকারি কাকা একেবারে পাশে বসে পড়লেন। তারপর শুরু করলেন, 'বড়োদিনের সময় ছেলেমেয়েরা সব পোস্টফিসে ঢুকে পড়ে। এইসময় রাশি রাশি উপহারের পার্সেল যাওয়া-আসা করে। বড়োদিনের উপহার। কাজও খুব বেড়ে যায়।'

সরকারি কাকার আরও অমৃত উপদেশ বিতরণ করার ইচ্ছা হয়তো ছিল, কিন্তু পারলেন না, পাড়ার রামদুলাল ঘোষালকে দেখতে পেলেন। ভদ্রলোক বাজার থেকে ফিরছিলেন। সরকারি কাকা রোয়াক থেকে ঝাঁপিয়ে রাস্তায় পড়লেন, 'এই যে রামদা, নস্যি হবে এক টিপ?'

সরকারি কাকার হাত থেকে পরিত্রাণ পেলাম, কিন্তু চিন্তা থেকে নিষ্কৃতি নয়। সত্যিই তো, এই দীর্ঘ সময় কাটাই কী করে?

আশ্চর্যভাবে কাজ জুটে গেল।

পাশের বাড়ির রেবতীমেসোমশাই এসে দাঁড়ালেন। অমায়িক ভদ্রলোক। মানুষের দায়ে-বিপদে বুক দিয়ে এসে পড়েন। যেমন ভদ্রলোক তেমন তাঁর স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে নেই। বসে বসে পত্রিকার পাতা ওলটাচ্ছিলাম। বাবা আর মা দুজনেই ছিলেন। বাবার হাতে চায়ের কাপ। মার হাতে সেলাই। রেবতীবাবু ঢুকলেন টেলিগ্রাম হাতে করে।

বাবা বললেন, 'কী ব্যাপার!'

রেবতীবাবু ভগ্নকণ্ঠে উত্তর দিলেন, 'বড়ো বিপদে পড়েছি!'

'কী হল?'

'দেশে আমার ভাই থাকে জানেন তো। সেই ভাইয়ের খুব অসুখ, খবর এসেছে।'

'তাই নাকি?'

'এর আগের চিঠিতে অসুখের সব বিবরণ ছিল। আমি এখানকার এক বড়ো ডাক্তারের সঙ্গে আলোচনা করে ওষুধপত্র কিনেছি। ভেবেছিলাম নিজেই নিয়ে যাব, কিন্তু কাল থেকে বাতের ব্যথাটা দারুণ বেড়েছে। চলা-ফেরাই করতে পাচ্ছি না।'

লক্ষ করলাম রেবতীবাবুর হাতে মোটা লাঠি। কথাবার্তার ফাঁকে ফাঁকে মুখটা বিকৃত করছেন।

আমরা আশপাশের সবাই জানতাম, মাঝে মাঝে রেবতীবাবু বাতে একেবারে পঙ্গু হয়ে যান। তাঁর অসহ্য কাতরানি আমরা বাড়ি থেকেই শুনতে পাই।

সূচীপত্রে যান

'কী করি বুঝতে পারছি না!'

হঠাৎ বাবার নজর আমার দিকে পড়ল। বললেন, 'এক কাজ করলে হয়।'

'কী?'

'সতু তো বসে আছে, সে যেতে পারে।'

রেবতীবাবু কৃতার্থ হয়ে গেলেন, 'তাহলে তো কথাই নেই। সতু পারবে তো যেতে? অচেনা জায়গা।'

আত্মসম্মানে লাগল। বললাম, 'এ আর শক্ত কাজ কী?'

'তাহলে আর দেরি করো না। কাল সকালেই রওনা হয়ে পড়ো। আমার সঙ্গে এসো, আমি সব বুঝিয়ে দিচ্ছি।' কথা শেষ করেই রেবতীবাবু লাঠিতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে আমিও।

আমরা একতলায় থাকি, কাজেই সিঁড়ি ভাঙার হাঙ্গামা নেই। কিন্তু এটুকু পথ চলতে রেবতীবাবু যেরকম সময় নিলেন, তাতেই বুঝতে পারলাম বাতটা রীতিমতো বেড়েছে।

বাড়িতে এসে রেবতীবাবু বললেন, 'কাল বেলা দশটা পনেরোতে গাড়ি। হাওড়া স্টেশন। দু-নম্বর প্ল্যাটফর্ম। থার্ড ক্লাসে ভাড়া ন-টাকা কুড়ি পয়সা। ট্রেন মজিদপুর পৌঁছাবে সন্ধ্যা ছ-টায়। স্টেশনে গাদা গাদা সাইকেল-রিকশা। রিকশায় বড়োজোর মিনিট পঁচিশ, কী আধ ঘণ্টা। ভাড়া নেবে এক টাকা। এই নাও টাকা। পঞ্চাশ টাকা দিলাম। বিদেশ বিভুঁয়ে সঙ্গে বাড়তি টাকা থাকা ভালো। আর ওই ওষুধের ব্যাগ।'

রেবতীবাবু চামড়ার ছোটো একটা সুটকেস এগিয়ে দিলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'অসুবিধা হবে?'

হেসে বললাম, 'আপনি যেমন চমৎকারভাবে বুঝিয়ে দিলেন তাতে মোটেই অসুবিধা হবার কথা নয়।'

'আমার ভাইয়ের নাম অদিতি। অদিতি ভটচাজ। গাঁয়ের স্কুলের হেডমাস্টার। সবাই এক ডাকে চেনে। তুমি রিকশাওয়ালাকে হেডমাস্টারের বাড়ি যাব বললেই হবে।'

পরের দিন ন-টা বাজতেই ট্যাক্সি এসে হাজির। রেবতীবাবু সে ব্যবস্থাও করে রেখেছেন। আমি ট্যাক্সিতে উঠতে রেবতীবাবু লাঠিতে ভর দিয়ে পাশে দাঁড়ালেন। আমি অনুযোগের সুরে বললাম, 'আপনি আবার কষ্ট করে এলেন কেন?'

'কষ্ট আর কী! তা ছাড়া তুমি আমার জন্য এতটা করছ, আমি এটুকু করব না? তুমি বউমাকে বলো, শরীরের এই অবস্থার জন্য আমার যাওয়া সম্ভব হল না। কিছু যেন মনে না করে। সুটকেসের মধ্যে একটা কাগজে ওষুধ সেবনের সব বিধি লেখা আছে। কখন কোন ইনজেকশন দিতে হবে, তাও। গায়ের প্রফুল্ল ডাক্তারই দেখাশোনা করে। তাকে দেখালেই হবে।'

যতক্ষণ ট্যাক্সি দেখা গেল, পিছন ফিরে দেখলাম, রেবতীবাবু লাঠি হাতে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন।

ট্যাক্সি যখন হাওড়ায় পৌঁছাল, তখন সাড়ে ন-টা। ট্রেন ছাড়তে তখনও অনেক দেরি। টিকিট কেটে উঠে পড়লাম।

বিশেষ ভিড় নেই। অন্তত তখনও পর্যন্ত হয়নি। বেশিরভাগই চাষাভুষো লোক। সঙ্গে বিরাট বস্তা।

একেবারে কোণের দিকে জানলার পাশে বসলাম।

মালপত্র বলতে আমার কিছুই নেই। ওষুধের সুটকেস আর কাঁধের পোঁটলায় কাপড়চোপড়।

বিছানা আনিনি। রেবতীবাবু বারণ করে দিয়েছিলেন, 'কোনো দরকার নেই। একজনের শোবার ব্যবস্থা ঠিক হয়ে যাবে।'

বসে বসে ভাবতে লাগলাম। এর আগে কোনোদিন গ্রামে যাইনি। আমার আত্মীয়স্বজন সবাই শহরের লোক। গ্রাম সম্বন্ধে আমার একটা মোহ ছিল বই কী! পদ্মফুল-ফোটা পুকুর, ঝোপঝাড়ে জোনাকির মেলা, ধান খেত, পাখির কাকলি।

কিন্তু মজিদপুরে হয়তো এসব দেখার অবকাশ হবে না। অসুখের বাড়ি। গৃহস্বামীর কঠিন অসুখ। এমন অবস্থায় গ্রামে বেড়ানো সম্ভব নয়। রোগীর কাছে বসে থাকতে হবে।

ট্রেন ছাড়ল।

সূচীপত্রে যান

দু-দিকের শহরে চিহ্ন দ্রুত মুছে গেল। তার পরিবর্তে পানাঢাকা ডোবা, বাঁশঝাড়, কুঁড়ে ঘর।

মাঝে মাঝে ট্রেন থামছে। লোক যে অনুপাতে উঠছে, সে অনুপাতে নামছে না।

কামরার ভিতর দারুণ হট্টগোল। কে বুঝি আর একজনের পোঁটলা নিয়ে নেমে গেছে।

রোদ বাড়ছে। ঘুমের ভাব আসছে।

এক ভাঁড় চা খেয়ে নিলাম।

যখন আবার চোখ খুললাম, তখন রোদের তেজ কমে এসেছে। কামরাটা অনেকটা খালি। বহুলোক ইতিমধ্যে নেমে গেছে।

বিকাল। হাতের ঘড়ি দেখলাম। পাঁচটা পাঁচ। আর ঘণ্টা খানেক, তারপরই মজিদপুর পৌঁছাব। হঠাৎ মনে পড়ে গেল, সাত সকালে খেয়ে বেরিয়েছি। মাঝখানে শুধু এক ভাঁড় চা খেয়েছি। অসুখের বাড়ি, খাবার মিলবে কিনা কে জানে!

ট্রেন প্ল্যাটফর্মে থেমেছে। স্টেশনের নাম শক্তিনগর। স্টেশনের চেহারা দেখে মনে হচ্ছে, ট্রেন কিছুক্ষণ থামবে! ট্রে হাতে একটা বয় যাচ্ছিল। তাকে ডেকে চা, টোস্ট আর ডিমের অর্ডার দিলাম।

খাওয়া শেষ হতেই ট্রেন ছাড়ল।

যখন মজিদপুর পৌঁছালাম, তখন বেশ অন্ধকার। ছ-টার সময় এত অন্ধকার হবার কথা নয়, কিন্তু আকাশে কালো মেঘের সমারোহ। স্টেশন দেখে মাথায় হাত দিয়ে পড়লাম। নীচু খোয়া-ওঠা প্ল্যাটফর্ম। টিমটিম করছে তেলের বাটি। গোটা দুয়েক চাষি নামল। নেমেই তারা অন্ধকারে মিশে গেল।

নেমে পড়লাম। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, দু-একবার মেঘ ডাকল।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে এদিক-ওদিক দেখলাম। একটা সাইকেল-রিকশা কোথাও নেই। ভাবলাম, স্টেশন মাস্টারের কাছে একবার জিজ্ঞাসা করি।

ফিরে এলাম। টিকিট ঘরের সামনে বড়ো তালা ঝুলছে। ইতিমধ্যে ট্রেনও ছেড়ে দিয়েছে। গেটের কাছে টিকিট চেকারেরও দেখা পাইনি। স্টেশনের বাইরে বিদ্যুতের আলোয় দেখলাম, তিনটে রাস্তা তিনদিকে গিয়েছে। রাস্তা মানে অসমতল গ্রাম্য পথ। দারুণ সমস্যা। দুর্যোগপূর্ণ রাতে কোন রাস্তা ধরে এগোব?

সাইকেল-রিকশার সন্ধানে এদিক-ওদিক দেখছি, হঠাৎ পিছনে মোটা গলার আওয়াজ, 'সাইকেল-রিকশা পাবেন না, সব নবীন মাইতির ওখানে গেছে।'

চমকে উঠলাম। ঘাড় ফিরিয়ে দেখি, আধা অন্ধকারে দীর্ঘাকৃতি একটি ভদ্রলোক। পরনে ধুতি পাঞ্জাবি। ভদ্রলোক কি আমার সঙ্গেই ট্রেন থেকে নেমেছেন। এতক্ষণ তাহলে কোথায় ছিলেন?

জিজ্ঞাসা করলাম, 'নবীন মাইতির ওখানে?'

'হ্যাঁ, নবীন মাইতির ছেলের বিয়ে। বরযাত্রীদের জন্য তিরিশখানা সাইকেল-রিকশা ভাড়া করেছে। সম্পন্ন জোতদার। পয়সার তো আর অভাব নেই। তা আপনি যাবেন কতদূর?'

'অদিতি ভটচাজের বাড়ি।'

'হেডমাস্টারমশাইয়ের বাড়ি? তাঁর তো খুব অসুখ চলেছে। দিন দশেক যমে মানুষে টানাটানি।'

'হ্যাঁ শুনেছি। আমি কলকাতা থেকে তাঁর ভাইয়ের কাছ থেকে ওষুধ নিয়ে এসেছি। আমার একটু তাড়াতাড়ি পৌঁছানো দরকার। কী করে যাই বলুন তো?'

'পায়ে হাঁটা ছাড়া তো উপায় নেই। গোরুর গাড়িও আজকাল পাওয়া যায় না।'

'কতটা পথ হবে?'

'তা মাইল তিনেক। আমিও ওদিকে যাব। যাবেন তো চলুন, রওনা হওয়া যাক। দেরি করে লাভ কী? আকাশের অবস্থা ভালো নয়।'

অগত্যা। আমি মালকোঁচা মেরে নিলাম। কাঁধে ব্যাগ, হাতে ওষুধের বাক্স।

এত সরু রাস্তা, পাশাপাশি দুজনের যাবার উপায় নেই। ভদ্রলোক আগে, আমি পিছনে।

সূচীপত্রে যান

বিদ্যুতের আলোয় পথ চলা।

একদিকে বাঁশঝাড়। বাতাসে বাঁশগুলো দুলছে, ক্যাঁচকোঁচ শব্দ করছে। আর একদিকে ডোবা! একটু পা ফসকালেই বিপদ।

কিছুটা পথ চলার পর ভদ্রলোককে আর দেখতে পেলাম না। অন্ধকারে যেন মিলিয়ে গেছেন।

ভয় হল। আতঙ্ক মেশানো কণ্ঠে বললাম, 'কই, কোথায় আপনি?' পিছন থেকে শব্দ হল, 'এই যে পিছনে।'

আশ্চর্য, ভদ্রলোক সামনে থেকে পিছনে গেলেন কী করে? এই সংকীর্ণ রাস্তায় পাশ কাটিয়ে তো যাওয়াও সম্ভব নয়!

কৈফিয়ত স্বরূপই ভদ্রলোক বললেন, 'গাছের আড়ালে বিড়ি ধরাবার চেষ্টা করছি, হাওয়ার জন্য কিছুতেই পারছি না।'

দাঁড়িয়ে পড়ে পিছন দিকে দেখলাম। একটা গাছের আড়ালে ভদ্রলোক হাত ঢাকা দিয়ে দেশলাই জ্বালাবার চেষ্টা করছেন।

একবার, দু-বার, তিনবার। তিনবারের চেষ্টায় দেশলাই জ্বলল।

সেই আলোতেই ভদ্রলোকের মুখ দেখলাম। কপালে একটা দাগ। খুব ছোটো ছোটো চুল। তীক্ষ্ন দুটি চোখ। সাধারণ গ্রাম্য চেহারা।

'আপনার এসব চলে?'

মাথা নাড়লাম, তারপরেই মনে পড়ে গেল, অন্ধকারে আমার মাথা নাড়া ভদ্রলোকের দৃষ্টিগোচর হবার কথা নয়। তাই মুখে বললাম, 'না, ওসব আমার চলে না।'

'কি করেন? পড়াশোনা?'

'হ্যাঁ, এবার হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা দিয়েছি।'

ভদ্রলোক হাসলেন, 'আজকাল তো ছেলেরা লোয়ার সেকেন্ডারি দেবার আগেই ধূমপান করতে শিখে যায়, আপনি তাহলে ভালো ছেলের দলে।'

কথাটা হঠাৎ মনে পড়ে গেল। জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি কি এই ট্রেন থেকে নামলেন?'

'না, না। আমি মাঝে মাঝে স্টেশনে বেড়াতে আসি। আজও এসেছিলাম।'

এতক্ষণ পর্যন্ত শুধু মেঘের ডাক আর বিদ্যুতের চমক ছিল। এবার বৃষ্টি শুরু হল। খুব জোরে নয়, কিন্তু আমাদের বিব্রত করার পক্ষে যথেষ্ট।

রাস্তা রীতিমতো পিছল হয়ে উঠল। পায়ের জুতো খুলে হাতে নিলাম ভদ্রলোকের নির্দেশে।

পথের যেন আর শেষ নেই!

অতিষ্ঠ হয়ে ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলুম, 'আর কত দূর? শুনেছিলাম অদিতিবাবুর বাড়ি স্টেশন থেকে খুব দূরে নয়।'

'মাইল তিনেক। এমন আর দূর কী! দুর্যোগের মধ্যে দিয়ে চলেছি কিনা, তাই পথ বেশি মনে হচ্ছে। আমি জলার ভিতর দিয়ে চলে যেতে পারি, কিন্তু আপনি শহরের ছেলে। আপনার অসুবিধা হবে।'

খালি পায়ে বেশ কষ্ট হতে লাগল।

ঝড়ে দু-একটা বাঁশ রাস্তার ওপর কাত হয়ে পড়েছে। বাঁশের কাঁটা পায়ে ফুটছে। যন্ত্রণায় দু-একবার চেঁচিয়ে উঠলাম।

'কী হল?' ভদ্রলোক অনেক দূর থেকে জিজ্ঞাসা করলেন।

'পায়ে বাঁশের কাঁটা ফুটছে।'

'বাড়ি পৌঁছে চুন দিয়ে দেবেন, নইলে বড্ড ব্যথা করবে।' চুপচাপ আরও আধঘণ্টা কাটল।

বৃষ্টি কম, কিন্তু লোকালয়ের ইশারা নেই। দু-দিকে জঙ্গল আর মজা পুকুর।

সূচীপত্রে যান

'অদিতিবাবু কেমন আছেন জানেন?' আমি জিজ্ঞেস করি।

ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে পড়লেন। আমি কাছাকাছি যেতে বললেন, 'সকালে বিশেষ ভালো ছিলেন না। প্রফুল্ল ডাক্তার তো আশা ছেড়েই দিয়েছিল। দুপুরে অবস্থা একটু ভালো হয়েছিল। তবে খুব আশাপ্রদ নয়, বুঝলেন?'

বুঝলাম। মনে মনে ভাবলাম, ওষুধপত্র নিয়ে যেন সময়ে পৌঁছাতে পারি।

আরও দ্রুত চলতে লাগলাম।

কিন্তু বাধা। বিরাট একটা পাকুড় গাছ পথরোধ করে পড়ে রয়েছে। পার হয়ে যাওয়াই দুষ্কর! বললাম, 'সর্বনাশ! কী হবে?'

ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন। নীচু হয়ে দেখে বললেন, 'ডালপালা সরাতে হবে, এ ছাড়া উপায় নেই।'

'অন্ধকারে ডালপালা সমেত এই গাছ সরানো সোজা কথা?'

'আপনি একটু সরে যান তো।'

সভয়ে সরে গেলাম।

ভদ্রলোক মোটা একটা ডাল ধরে টানতে টানতে রাস্তার পাশে রাখলেন।

চেহারা দেখে বোঝবার উপায় নেই। শরীরে অসীম শক্তি। বললেন, 'চলে আসুন এবারে। গাঁয়ের ছেলে, মাখনছানা দিয়ে তৈরি দেহ নয়। রীতিমতো ডনবৈঠক দিয়েছি বহুদিন। সাঁতার কেটে ফুলাই নদী এপার-ওপার করেছি।'

আর কোনো বাধা নয়।

দুর্যোগ কেটে ফিকে জ্যোৎস্না দেখা গেল। দু-একটা বাতিও নজরে পড়ল। গ্রামের সীমানায় এসে গেছি।

বাঁশের একটা সাঁকো। সেটা পার হতেই ভদ্রলোক বললেন, 'এবার দুজনে দু-দিকে। আপনার আমার পথ এক নয়। আমি বাঁ-দিকে যাব, আপনি ডানদিকে।'

'আমি অদিতিবাবুর বাড়ি চিনব কী করে?'

'চেনবার অসুবিধা হবে না। উঠানে অনেক লোক দেখবেন। হেডমাস্টারকে গাঁয়ের সবাই ভালোবাসে কিনা।'

'আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।'

আমার কথা শেষ হবার আগেই ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন। একেবারে মুখোমুখি। দীর্ঘ চেহারা, রক্তাভ দুটি চোখ, বিসৃদশ দাঁতের সার। ভদ্রলোক মোটেই সুদর্শন নন।

বাড়িটা বেশি দূরে নয়। দু-তিনখানা বাড়ি পরেই। উঠানে দাওয়ায় গোটা তিনেক হ্যারিকেন।

বেশ কয়েক জন লোক চলাফেরা করছে।

আমি উঠানে গিয়ে দাঁড়াতেই একজন ফিরে দেখল, 'কে?'

'আমি কলকাতা থেকে আসছি।'

'কলকাতা থেকে?'

'হ্যাঁ, অদিতিবাবুর দাদা রেবতীবাবুর কাছ থেকে। বাতে শয্যাশায়ী বলে তিনি নিজে আসতে পারলেন না, আমার হাত দিয়ে ওষুধ পাঠিয়েছেন।'

'ওষুধ!'

বাড়ির মধ্যে থেকে চাপা কান্নার আওয়াজ ভেসে এল।

'সেই এলেন, যদি আর একটু আগে আসতেন। আজ সন্ধ্যায় সব শেষ হয়ে গেছে!' বিষণ্ণকণ্ঠে লোকটি বলল, 'আসুন এখানে।'

দাওয়ার দিকে এগিয়ে গেলাম।

বাঁশের খাটিয়ায় অদিতি ভটচাজ শুয়ে আছেন।

সূচীপত্রে যান

তাঁর পায়ের ওপর মাথা রেখে একটি স্ত্রীলোক ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

মৃতদেহের দিকে চোখ ফিরিয়েই চমকে উঠলাম। মেরুদণ্ড বেয়ে শীতল শিহরণ। এ কি সম্ভব!

যে ভদ্রলোক স্টেশন থেকে আমার পথপ্রদর্শক হয়ে এলেন, এ বাড়ির নির্দেশ দিলেন, তাঁর চেহারার সঙ্গে অদ্ভুত মিল! একেবারে অভিন্ন!

অদিতি ভটচাজও চোখ চেয়ে রয়েছেন। অবিকল এক— রক্তাভ চোখ, অসমতল দাঁতের সার, ছোটো ছোটো চুল।

পরলোকযাত্রী কি আমাকে পথ দেখিয়ে এখানে নিয়ে এলেন?

কিন্তু কেন? তিনি তো জানতেন, আমার ওষুধের বাক্স কোনো প্রয়োজনে লাগবে না।

জানি না। এর উত্তর এত বছরেও আমার জানা সম্ভব হয়নি।

সূচীপত্রে যান

ফাঁসির আসামি

এ কাহিনি কাউকে কোনোদিন বলিনি। জানি, বললেও কেউ বিশ্বাস করবে না।

আমার নিজেরই মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় ব্যাপারটা আদৌ ঘটেছিল কিনা। যখন হাতে কোনো কাজ থাকে না, বারান্দায় বেতের চেয়ার পেতে চুপচাপ বসে বসে কলকাতার ঘনায়মান সন্ধ্যার দিকে চেয়ে থাকি। রাস্তার যানবাহনের শব্দ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসে, তখন সব ঘটনাটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

অনেক বছর আগের কথা।

আমি তখন ম্যান্ডেলে জেলের ডেপুটি সুপার। ম্যান্ডেলের উত্তর বর্মার প্রধান শহর। ম্যান্ডেলেকে বাংলায় লেখা হয় মান্দালয়।

সেই জেলে একবার এক দুর্ধর্ষ আসামি এসেছিল। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ— সামান্য দশটা টাকার জন্য সে ভাইকে ছোরা দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেছিল।

লোকটার নাম পে মঙ। বয়স খুব বেশি নয়। বছর বাইশ-তেইশ। বাপ ছিল না। দু-ভাই ঠাকুরদার কাছে মানুষ। পে মঙ স্কুলের ধার দিয়ে যেত না। কেবল লুকিয়ে পরের পুকুরে ছিপ ফেলা, পরের গাছের ফলপাকুড় পাড়া, সিনেমা দেখে দেখে বেড়ানো— এইসব করত।

পে মঙের ছোটো ভাই ঠিক তার বিপরীত। লেখাপড়া তো করতই। অবসর সময়ে ঠাকুরদার চাষবাসের সাহায্য করত। সপ্তাহে সপ্তাহে তরিতরকারি হাটে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করত।

এইভাবে সে কিছু পয়সাকড়ি জমিয়েও ছিল।

একদিন পে মঙ ভাইকে বলল, 'দশটা টাকা ধার দিবি, শহরে যাব। রেলভাড়া আর হোটেল খরচ লাগবে। তোকে টাকা আমি একমাসের মধ্যে শোধ করে দেব।'

ভাই দাদাকে খুব ভালোই চেনে। এর আগে কয়েক বার সে টাকা ধার দিয়েছিল, সেটাই ফেরত পায়নি।

আর দাদা ফেরতই বা দেবে কোথা থেকে! তার এক পয়সা তো উপার্জন নেই। তাই বলল, 'আমার কাছে পয়সা নেই। থাকলেও দিতাম না।'

এই নিয়ে কথা কাটাকাটি, গালাগালি তারপর মারামারিও শুরু হয়ে গেল। পাড়ার লোক এসে দুজনকে ছাড়িয়ে দিল।

দুজনেই দুজনকে শাসাল, দেখে নেব।

পে মঙের ভাই সব কিছু ভুলে নিজের কাজে মেতে গেল। পে মঙ ভুলল না। তক্কে তক্কে রইল।

একদিন ভোরে পে মঙের ভাই হাটে চলেছে। মাথার ঝুড়িতে শাকসবজি, ফলপাকুড়। পে মঙ পিছু নিল।

নির্জন রাস্তা। অত ভোরে বিশেষ লোক চলাচল নেই। হাটের জিনিস নিয়ে গোরুর গাড়ির সার আগের রাতে চলে গেছে।

মাঝামাঝি রাস্তায় পে মঙ পিছন থেকে ভাইয়ের গলা চেপে ধরল। 'এইবার কে তোকে বাঁচাবে! দে, সঙ্গে যা টাকাকড়ি আছে।'

আচমকা আক্রমণে ভাইয়ের মাথা থেকে ঝুড়িটা ছিটকে রাস্তার ওপর পড়ে গিয়েছিল। সে ফিরে দাঁড়িয়ে ছাড়াবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পারেনি।

পে মঙ কোমর থেকে ছোরা বের করে বাইয়ের বুকে বার তিনেক বসিয়ে দিয়েছিল।

রক্তে তার গেঞ্জি আর লুঙ্গি লাল হয়ে গিয়েছিল।

ভাইয়ের পকেট থেকে টাকা সাতেক বের করে নিয়ে পালাতে গিয়েই থামতে হয়েছিল।

সূচীপত্রে যান

পুলিশের দারোগা একেবারে সামনে।

একটা খুনের তদারক সেরে পাশের গাঁ থেকে দারোগা পুলিশ সঙ্গে নিয়ে সাইকেলে ফিরছিল, পে মঙকে একেবারে হাতে-নাতে ধরে ফেলল। এই হচ্ছে পুলিশের কাহিনি।

তারপর হাজত, হাজত থেকে কোর্ট, কোর্ট থেকে জেল।

পে মঙকে বাঁচাবার জন্য তার ঠাকুরদা অনেক চেষ্টা করেছিল। একটা নাতি তো গেছেই, আর একজনকে যদি বাঁচাতে পারে। বাঘা বাঘা উকিল দিয়েছিল।

কিছু হয়নি।

জেলা কোর্ট ফাঁসির হুকুম দিল। হাইকোর্ট সে হুকুম বহাল রাখল।

পে মঙ যখন ম্যান্ডেলে জেলে এল, তখন সে বিলাতে রাজার কাছে প্রাণদণ্ডের আদেশ মুকুব করার আবেদন করেছে।

পে মঙ বরাবর বলে এসেছে ভাইকে সে মারেনি। ভাইয়ের সঙ্গে গালিগালাজ ধস্তাধস্তি হয়েছে বটে, কিন্তু মেরেছে অন্য লোক। পাশের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে মেরে পালিয়েছে।

পে মঙকেও মারত কিন্তু দারোগা এসে পড়ায় পারেনি।

পে মঙের এ-কাহিনি ধোপে টেকেনি।

প্রমাণ হয়েছে, এ ছোরা তার। দারোগা নিজের চোখে দেখেছে পে মঙ ভাইয়ের বুকে বার বার তিনবার ছোরা বিঁধিয়ে দিয়েছে।

দারোগার সঙ্গে পে মঙের কোনো শত্রুতা নেই যে তার বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা বলবে।

আমি যখন পে মঙের সেল-এ যেতাম তখনও তার এক কথা।

'হুজুর বাঁচান, আমার বিনাদোষে ফাঁসি হবে! মরতে আমার বড়ো ভয় হুজুর। কীই-বা আমার বয়স। আমি বাঁচতে চাই!'

আমি তাকে কোনো আশ্বাস দিতে পারতাম না। কেবল বলতাম, 'আজ বিকালে ফুঙ্গি (বৌদ্ধ পুরোহিত) আসবেন, তাঁর কাছে তোমার যা বলবার বলো।'

ফুঙ্গি এলেই পে মঙ খেপে উঠত। কোনো ধর্মের কথা সে শুনতে চাইত না। চিৎকার করে বলত, 'আমাকে বিনাদোষে যারা ফাঁসি দেবে, তাদের আমি ছাড়ব না। আমি শয়তানের কাছে রক্ত বিক্রি করে যাব। আমার আত্মা প্রতিশোধ নেবে।'

পে মঙের কথা শুনে শুনে আমার নিজেরই মাঝে মাঝে কেমন সন্দেহ হত। সত্যিই হয়তো পে মঙ দোষী নয়। বিচারেও তো কত সময়ে ভুল হয়!

কিন্তু ডেপুটি জেলার হিসেবে আমার কিছু করার নেই।

বিলাত থেকে অর্ডার এল। আবেদন মঞ্জুর হয়নি।

তার মানে ফাঁসি ছাড়া পথ নেই।

খবরটা পে মঙকে জানিয়ে দেওয়া হল।

কিছুক্ষণ গরাদ ধরে আমার দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে হঠাৎ একটা অব্যক্ত আর্তনাদ করে মেঝের ওপর লুটিয়ে পড়ল।

ভয় পেয়ে গেলাম। অনেক দুর্ধর্ষ আসামিও ফাঁসির হুকুম শুনে জ্ঞানহারা হয়ে যায়। কিংবা রীতিমতো অসুস্থ।

ফাঁসির আসামিদের খুব সাবধানে রাখা হয়। যাতে তারা আইনকে ফাঁকি দিয়ে আত্মহত্যা না করতে পারে!

তাদের সেলের চার দেয়াল খড় দিয়ে নরম করে দেওয়া হয়, যাতে আসামি দেয়ালে মাথা ঠুকে না মরতে পারে। রোজ ডাক্তার এসে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে। খাওয়াদাওয়ার খুব তরিবৎ।

খবর শোনার পর থেকে পে মঙ একেবারে বদলে গেল।

সূচীপত্রে যান

চুপচাপ বসে থাকে। দিন-রাত বিড়বিড় করে কী বলে! ফুঙ্গি কাছে এলে তাকে গালিগালাজ করে তাড়িয়ে দেয়। ওয়ার্ডারকে বলে, 'আমি খুন করিনি, তবু এরা আমাকে ফাঁসি দিচ্ছে। আমি কাউকে ছাড়ব না। সবাইকে দেখে নেব।'

ঠিকমতো খাওয়াদাওয়া সত্ত্বেও তার চেহারা শীর্ণ হয়ে যেতে লাগল।

বোঝা গেল, এটা হচ্ছে মানসিক চিন্তায়।

অবশেষে সেইদিন এল।

জেলার সাহেব ছুটিতে, কাজেই দায়িত্ব আমার ওপর।

একজন ম্যাজিস্ট্রেট থাকবে, একজন ডাক্তার আর আমি।

ভোর পাঁচটা দশে ফাঁসি।

সাড়ে চারটে থেকে আমরা তৈরি।

আসামিকে স্নান করিয়ে আনা হল। ফুঙ্গি ধর্মের বাণী উচ্চারণ করল। কোনো গোলমাল নয়, চুপচাপ শুনল।

গোলমাল বাধল ফাঁসির মঞ্চে নিয়ে যাবার সময়।

কিছুতেই যাবে না। পাগলের মতন চিৎকার।

'তোমরা একজন নিরীহ লোককে ফাঁসি দিচ্ছ! ফয়া (ভগবান) তোমাদের ক্ষমা করবেন না! নির্বংশ হবে তোমরা! কুষ্ঠরোগে মারা যাবে!'

টেনে হিঁচড়ে তাকে নিয়ে যাওয়া হল।

ঠিক সময়ে কাজ শেষ।

কালো কাপড়ে ঢাকা দেহটা থরথর করে কেঁপে উঠেই নিস্পন্দ হয়ে গেল চিরদিনের জন্য। একটা মানুষের আকুতি, প্রতিরোধ সব শেষ হয়ে গেল।

এর দিনদুয়েক পরেই ব্যাপারটা ঘটল।

রাত তখন বারোটা হবে। একটু আগে পড়া শেষ করে সব শুয়েছি। দরজায় প্রচণ্ড করাঘাত।

জেলের মধ্যে আমাদের সব সময়ে সন্ত্রস্ত হয়ে বাস করতে হয়। অঘটন একটা ঘটলেই হল।

দরজা খুলে দেখি রাতের ওয়ার্ডার।

দুটো চোখ বিস্ফারিত। উত্তেজনায় প্রশস্ত বুক ওঠা-নামা করছে। শীতের রাত কিন্তু সারা মুখ ঘর্মাক্ত।

'কী হল?'

'হুজুর পে মঙ!'

'কে?'

'পে মঙ হুজুর! যার ফাঁসি হয়ে গেল!'

ধমক দিয়ে উঠলাম, 'কি নেশা-ভাঙ করেছ নাকি? মাঝরাত্তিরে আজেবাজে কথা বলছ। তোমাকে জরিমানা করব।'

'বিশ্বাস করুন হুজুর, আমি একলা নই, অন্য কয়েদিরাও দেখেছে।'

বেরিয়ে পড়লাম। দেখে আসি কী রহস্য।

গিয়ে দেখলাম পে মঙের সেলের আশেপাশের কয়েদিরা সব গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

আমি যেতেই চেঁচামেচি শুরু হল।

'হুজুর, পে মঙ!'

অনেক কষ্টে তাদের থামিয়ে আসল কথাটা শুনলাম।

কোনো এক কয়েদির প্রথম চোখে পড়ে। চাঁদের আলোয় চারদিক পরিষ্কার। কোথাও একটু অন্ধকার নেই। একটা চাপা গোঙানি কানে যেতেই কয়েদিটা পে মঙের সেলের দিকে তাকিয়েই চমকে উঠেছিল।

কালো কাপড়ে ঢাকা একটা মূর্তি শূন্যে ঝুলছে। ঠিক ফাঁসিকাঠ থেকে যেমন ঝোলে।

সূচীপত্রে যান

একজনের চিৎকারে অন্য সবাই উঠে পড়ে। সকলেরই চোখের সামনে এক দৃশ্য। তাদের হল্লায় রাতের ওয়ার্ডার এসে হাজির। সেলের সামনে এগিয়ে গিয়েই সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। কালো কাপড়ে ঢাকা মূর্তিটা মৃত্যুযন্ত্রণায় থরথর করে কাঁপছে! আর সে অপেক্ষা করেনি। প্রাণপণে ছুটে আমার দরজায় ধাক্কা দিয়েছে।

সেলের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। সেল ফাঁকা। কোথাও কিছু নেই।

চাঁদের আলো থাকা সত্ত্বেও হাতের টর্চটা সেলের এদিকে-ওদিকে ফেললাম। কড়িকাঠেও।

সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

ঘুরে দাঁড়িয়ে জোর ধমক দিলাম। 'মরা মানুষ আবার ফিরে আসে নাকি? যত সব বাজে ঝামেলা। যাও সব শুয়ে পড়ো।'

ওয়ার্ডারকে কড়া করে বকলাম। 'ফের এরকম ছেলেমানুষি ব্যাপার করলে চাকরি নিয়ে টানাটানি হবে।'

সবে তন্দ্রা এসেছিল এমনই সময়ে উটকো ঝামেলায় মেজাজ রুক্ষ হয়ে গেল। জানি না, আবার কখন ঘুম আসবে।

দ্রুতপায়ে নিজের কোয়ার্টারে ফিরে এলাম। একলাই থাকি। তখনও বিয়ে করিনি।

দরজা খুলে ভিতরে ঢুকেই শরীরের রক্ত হিম হয়ে গেল।

বাইরের ঘরে বাতি জ্বালানোই ছিল। এই ঘর দিয়েই আমাকে শোবার ঘরে যেতে হবে। বাইরের ঘরটা অফিসঘর। কোণের দিকে একটা টুলের ওপর পে মঙ বসে!

বিস্ফারিত দুটি চোখ। মনে হল, চোখের মণি দুটো বুঝি বের হয়ে আসবে। জিভটা ঝুলছে। গলায় লাল দাগ, ফাঁসির দড়ির।

আমি ভীত এমন অপবাদ শত্রুও দিতে পারে না, কিন্তু মুহূর্তের জন্য আমার মনে হল বুকের হৃদস্পন্দন আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে উঠেছে। সমস্ত শরীর কাঁপছে ঠকঠক করে। তালু শুকিয়ে কাঠ।

একটু জল পেলে হত। ঠান্ডা এক গ্লাস জল।

'কে?' ভয়ার্ত গলায় প্রশ্ন করলাম।

'আমি পে মঙ হুজুর। বড়ো কষ্ট পাচ্ছি। বড়ো যন্ত্রণা। তাই আপনার কাছে এসেছি।'

খুব সাবধানে দেয়াল ধরে আস্তে আস্তে এপাশের চেয়ারের ওপর বসে পড়লাম। দাঁড়িয়ে থাকার আর শক্তিও ছিল না।

এ তো চোখের ভুল নয়। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, পে মঙ আমার সামনে বসে রয়েছে। মাত্র হাত চারেক দূরে। ফাঁসির পরের অবস্থা।

মৃদুকণ্ঠে বললাম, 'আমার কাছে কী দরকার?'

বুঝতে পারলাম কণ্ঠস্বর আমার আয়ত্তের মধ্যে নয়।

'আপনার কাছে ছাড়া আর কার কাছে আসব হুজুর। যা-কিছু বলার আপনার কাছেই তো বলতে এসেছি।'

'কী বলবার আছে বলো?'

'আমি নির্দোষ হুজুর। এ খুন আমি করিনি।'

'এখন আর এসব কথা বলে লাভ কী? তোমার তো যা হবার হয়ে গেছে।'

'আছে হুজুর। পরকাল আছে, সেখানে আমি শান্তি পাচ্ছি না।'

কী উত্তর দেব। চুপ করে রইলাম।

পে মঙই বলতে লাগল—

'সেদিন ভাইকে খুন করতে আমি চাইনি হুজুর। পিছন থেকে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার টাকাপয়সা কেড়ে নিতে চেয়েছিলাম। ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম তার ওপর। দুজনে রাস্তার ওপর যখন গড়াগড়ি খাচ্ছি তখন পাশের ঝোপ থেকে একজন লাফিয়ে বের হল। আমি ওপরে ছিলাম। আমার কোমর থেকে ছোরাটা বের

সূচীপত্রে যান

করে আমার ভাইয়ের বুকে বার কয়েক বসিয়ে দিল। আমাকেও হয়তো মারত, কিন্তু দারোগার সাইকেল দেখতে পেয়ে আবার ঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। আমি পয়সার জন্যই যদি খুন করব হুজুর, তাহলে পুলিশ আমার কাছ থেকে কি কোনো পয়সা উদ্ধার করতে পেরেছিল?'

স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর নয়। শ্বাসনালীতে চাপ পড়লে যেমন ফ্যাঁসফেঁসে শব্দ হয়, ঠিক তেমনই আওয়াজ।

কথার সঙ্গে সঙ্গে জিভ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়তে লাগল মেঝের ওপর।

'ঠিক আছে, আমি তোমার কথা বিশ্বাস করলাম।'

পে মঙের বীভৎস রক্তাক্ত মুখে হাসি ফুটে উঠল।

'করলেন তো হুজুর, তাতেই আমার শান্তি। দারোগাকে বলেছি, কোর্টে বলেছি, কেউ বিশ্বাস করেনি হুজুর। আপনার ওপরওয়ালা জেলারও নয়। তাই আমার এই অবস্থা। আমার মোটে তেইশ বছর বয়স হুজুর, এর মধ্যেই সব শেষ হয়ে গেল।'

কতক্ষণ এ কাহিনি চলবে জানি না।

দূরে জেলের ঘড়িতে ঢং করে একটা বাজল।

বাইরে রাতের ওয়ার্ডারের ভারী জুতোর শব্দ ভেসে আসছে— মস, মস, মস।

এবারে পে মঙ দাঁড়িয়ে উঠল। 'যাচ্ছি হুজুর, তবে যারা আমার এ অবস্থার জন্য দায়ী তাদের আমি ছাড়ব না।'

বুকটা দুপদুপ করে উঠল।

তার চরম অবস্থার জন্য পে মঙ কি আমাকেও দায়ী করছে। আমার ওপরও প্রতিশোধ নেবে?

বেশ বুঝতে পারলাম, ঘাড়, পিঠ ঘামে একেবারে ভিজে গেছে।

রুমাল বের করে ঘাম মুছব, সে শক্তিও যেন হারিয়ে ফেলেছি।

হঠাৎ ঘরের মধ্যে কনকনে ঠান্ডা হাওয়া। বাইরে বরফ পড়লে যেমন হয়। সমস্ত শরীর কেঁপে উঠল। কুণ্ডলি পাকানো ধোঁয়া। ধোঁয়াটা সরে যেতেই দেখলাম পে মঙ নেই। চেয়ার খালি।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালাম।

বাকি রাতটুকু আর ঘুম হল না। এপাশ-ওপাশ করলাম; চোখ বন্ধ করলেই পে মঙের বীভৎস, রক্তাক্ত মূর্তি ভেসে ওঠে।

ভোরে উঠে চোখে-মুখে জল দিয়ে নিজেকে বোঝালাম।

সবই মিথ্যা। নিজের মনের ভয়টাই বাইরে তার প্রতিবিম্ব ফেলেছে। পে মঙের দেহ তো গতকালই কবর দেওয়া হয়েছে। সে ফিরে আসবে কী করে!

কয়েদিদের ভীতি আমার মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল।

বারান্দায় চা নিয়ে বসলাম।

খবরের কাগজটা দিয়ে গিয়েছিল।

খবরের কাগজের প্রথম পাতার ওপর চোখ বুলিয়েই চমকে উঠলাম।

'জেলা জজ বেকার নিহত। গত রাত্রে শয়নকক্ষে বেকারকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। তাঁর কণ্ঠনালী ছিন্ন। আশ্চর্যের বিষয়, বাড়ির কোনো জিনিসপত্র চুরি যায় নাই। পুলিশ এই রহস্যজনক হত্যাকাণ্ডের কিনারা করিতে সর্বশক্তি নিয়োজিত করিয়াছে।'

মিস্টার বেকারের এজলাসে পে মঙের বিচার হয়েছিল।

গতকাল রাত্রেই তো পে মঙ প্রতিশোধ নেবার কথা বলে গিয়েছিল। ব্যাপারটা কেমন গোলমাল হয়ে গেল।

তবে কি পে মঙের প্রেতাত্মা সত্যিই এসেছিল আমার কাছে?

তা কি সম্ভব!

সূচীপত্রে যান

খবরের কাগজ হাতে করেই বাইরের ঘরে এলাম।
সব স্বাভাবিক। পে মঙ এসেছিল, তার কোনো চিহ্ন কোথাও নেই।
কোণের এই টুলেই তো সে বসেছিল।
মেঝের দিকে চোখ পড়তেই আঁতকে উঠলাম।
লাল রক্তের কয়েক ফোঁটা রক্ত জমে কালো হয়ে গেছে!
পে মঙের জিভ থেকে এই রক্ত ঝরেছিল।
ফাঁসির পর এরকম রক্ত তো বের হয়।

সূচীপত্রে যান

আগন্তুক

বাইরে প্রবল বৃষ্টি। এ বৃষ্টি হঠাৎ থামবে এমন আশা কম। ঘরের মধ্যে আমরা তিনজন। সমীর, পলাশ আর আমি। পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে। হাতে কোনো কাজ নেই। আড্ডা দিয়েও সবাই ক্লান্ত।

বর্ষার বিকালে খবরের কাগজের ওপর তেল-নুন-মাখা মুড়ি তেলেভাজা দিয়ে চিবোতে চিবোতে গল্প চলেছে। প্রথমে ক্রিকেটের গল্প, তারপর ফুটবল, কিছুক্ষণ সিনেমার কথা, শেষকালে এই আবহাওয়ার উপযুক্ত কাহিনি শুরু হল, ভূতের গল্প।

সমীর বলল, 'ভূত আলবত আছে। পৃথিবীর বড়ো বড়ো লোক ভূতের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন।'

পলাশ মুখ-চোখের অদ্ভুত ভঙ্গি করে বলল, 'আছে বই কী! আছে তোদের মতন নিষ্ক্রিয় লোকদের মগজে। ভূতের জন্মস্থান ভয়ের এলাকায়।'

দুজনে আমাকে সাক্ষী মানল।

বিপদে পড়লাম। খুব সাহসী এমন অপবাদ কেউ দেবে না। ভূত অবশ্য দেখিনি, কিন্তু ভূত নেই একথা জোর গলায় বলি কী করে!

সারাক্ষণ দিনের আলো থাকবে না। একসময়ে অন্ধকার হবে। চারদিক থেকে নানারকম শব্দ শোনা যাবে। তখন?

কাজেই কোনো পক্ষ সমর্থন না-করে বললাম, 'কী জানি ভাই, বলতে পারব না। ভবিষ্যৎ নিয়ে এত চিন্তা করছি যে, ভূতের কথা ভাববার সময় পাইনি।'

সমীর হাত গুটিয়ে টান হয়ে চেয়ারে বসল। বলল, 'ভূত আছে কিনা শোন। আমাদের রাঁচিতে একটা বাড়ি আছে জানিস তো। আমি সেখানে অনেক দিন ছিলাম।'

পলাশ এমন সুযোগ ছাড়ল না। সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'তুই যে রাঁচি ফেরত, সেটা তোর হালচালেই মালুম হয়।'

সমীর খেপে লাল।

আমি বহুকষ্টে দুজনকে থামালাম। সমীরকে বললাম, 'নাও, তোমার গল্প চালাও।'

সমীর তবু ক্ষুণ্ণ। 'গল্প?'

নিজেকে সংশোধন করে বললাম, 'না হে, গল্প নয়, সত্য ঘটনা বলো।'

সমীর শুরু করল, 'রাঁচির বাড়িতে ভূতের উপদ্রব। আমরা খেতে বসেছি, হঠাৎ ভাতের ওপর মাটির গুঁড়ো পড়ল, ডালের বাটি নিজের থেকেই কাত হয়ে গেল, হাত বাড়াতে দুধের বাটি সরে যেতে লাগল। অন্যসময় কিছু নয়, সব স্বাভাবিক। যত গোলমাল কেবল খাবার সময়। আমার ঠাকুরদা তখন বেঁচে। তিনি বললেন, ''এ নিশ্চয় অতৃপ্ত আত্মার ব্যাপার। গয়ায় পিণ্ড দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে''।'

তাই স্থির হল। আমার এক কাকা রেলে চাকরি করতেন। তাঁকেই বলা হল পিণ্ড দিয়ে আসতে।

কিন্তু গয়াতে পিণ্ড দিতে গিয়েই এক বিপত্তি।

সমীরের বরাত। ভূতের গল্প কিছুতেই বেচারি শেষ করতে পারছে না।

এই অবধি বলেই তাকে থামতে হল।

বাইরে থেকে দারুণ একটা গোঙানির শব্দ আসছে। একটানা, থামবার লক্ষণ নেই।

এই গোঙানির মধ্যে গল্প বলা অসম্ভব।

সূচীপত্রে যান

আমরা তিনজনেই বাইরে এসে দাঁড়ালাম। এক ফালি রোয়াক। বৃষ্টির জলে ভিজে গেছে। তারই এক কোণে একটি মানুষ।

মানুষ না বলে কঙ্কাল বলাই সমীচীন। খালি গা। প্রত্যেকটি হাড় গোনা যায়। মাথা ন্যাড়া। পরনে জরাজীর্ণ ফুলপ্যান্ট, হাঁটুর ওপর গোটানো। শুধু কোমরবন্ধের বাহাদুরি আছে। লাল, প্রায় নতুন একটা টাই কোমরে বাঁধা।

লোকটা ঠান্ডায় ঠক ঠক করে কাঁপছে আর দাঁতের ফাঁক দিয়ে গোঙানি বের হচ্ছে।

এ-দৃশ্য দেখে সকলেরই দয়া হল।

আমিই বললাম, 'এই তুমি ভিতরে এসো। এই বৃষ্টিতে ভিজলে নিমোনিয়া হবে।'

লোকটা কিছুক্ষণ একদৃষ্টে আমাদের দিকে দেখল। আমার কথাগুলো যেন বুঝতেই পারল না।

এবার সমীর চেঁচিয়ে বলল, 'উঠে ঘরের মধ্যে এসো, শুনছ?'

লোকটা আস্তে আস্তে দেয়াল ধরে দাঁড়াল। একটু দম নিল, তারপর আমাদের পিছন পিছন ঘরের মধ্যে এল।

'বসো ওই কোণে।' পলাশ আঙুল দিয়ে ঘরের কোণ দেখিয়ে দিল।

লোকটা সসংকোচে বসল। দুটো হাঁটুর ওপর মুখ রেখে।

আমি ভিতরে গিয়ে একটা পুরোনো শার্ট এনে লোকটার দিকে ছুড়ে দিলাম। লোকটা কৃতজ্ঞতা-ভরা চোখে আমার দিকে দেখল, তারপর শার্টটা গায়ে দিয়ে নিল।

আমি সমীরের দিকে ফিরে বললাম, 'এবার নাও হে, তোমার গয়ায় পিণ্ডদানের কাহিনি বলো।'

সমীর ভ্রূ কোঁচকাল। 'আমার পিণ্ডদানের কাহিনি?'

অপ্রস্তুত হয়ে বললাম, 'আহা, তোমার নয়, তোমার ভূতের।'

পলাশ ফোড়ন কাটল, 'ওই একই হল। ভূত আর সমীরে তফাত নেই। ভূত হচ্ছে গাঁজা, আর সমীর সেই গাঁজার আড়তদার।'

ঠিক এইসময় আমাদের তিনজনকে অবাক করে দিয়ে লোকটি কথা বলল।

'কে বললে বাবু, ভূত গাঁজা?'

পলাশ এবার লোকটির দিকে ফিরল।

'তুমিও ভূতের গল্প জানো নাকি হে?'

লোকটা দুটো হাত রগড়াতে রগড়াতে বলল, 'গল্প নয় বাবুরা, নিজের চোখে ভূত দেখেছি।'

'সে কী হে? বলো শুনি।'

তিনজনই লোকটার কাছে এগিয়ে বসলাম।

লোকটা হাতদুটো দিয়ে নিজের শরীর ঘষে নিল, বোধ হয় গরম করার চেষ্টায়, তারপর বলতে লাগল—

'একসময়ে আমি ট্রেনের কামরায় কামরায় প্লাস্টিকের চিরুনি ফেরি করে বেড়াতাম। সকাল সাতটায় বের হতাম। দুপুর বেলা রাস্তার ধারে কিছু খেয়ে নিতাম, তারপর আবার রাত দশটা সাড়ে দশটা পর্যন্ত চিরুনি বিক্রির চেষ্টা। রাত্রি বেলা কোনো স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের এক কোণে শুয়ে কাটাতাম।

একদিন হয়েছে কী, ঠিক এমনই বাদলা। যাত্রীর সংখ্যা কম। যারা আছে তাদের চিরুনি কেনার দিকে দৃষ্টি নেই, কোনোরকমে বাড়ি পৌঁছোতে পারলে বাঁচে। আমিও কোণের এক বেঞ্চে বসে ঢুলতে ঢুলতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি।

যখন ঘুম ভাঙল, মনে হল অনেক রাত। বৃষ্টি থেমেছে। জানলা দিয়ে ম্লান জ্যোৎস্না গাড়ির মধ্যে এসে পড়েছে। জানলা দিয়ে উঁকি মেরে বুঝতে পারলাম, ট্রেন শেডের মধ্যে রয়েছে।

ভালোই হল। বেঞ্চের ওপর পা তুলে ঘুমোবার চেষ্টা করলাম। পারলাম না। মনে হল কোথায় যেন খুটখাট আওয়াজ হচ্ছে।

সূচীপত্রে যান

একবার ভাবলাম ইঁদুর। কিন্তু ইঁদুর মালগাড়ি ছেড়ে এ-গাড়িতে আসবে কেন? এদিক-ওদিক চোখ ঘেরাতে ঘোরাতে দেখতে পেলাম, বাথরুমে হাতলটা নাড়ছে। কে যেন খোলবার চেষ্টা করছে, পারছে না।

একটু ভয় হল, চোর-ডাকাত নয় তো?

তারপর আবার মনে হল, চোর হোক, ডাকাত হোক, আমার কী! আমার সম্বল দু-টাকার চিরুনি আর পকেটে দেড় টাকা।

চোখ বন্ধ করে ফেললাম।

হঠাৎ মুখের ওপর গরম নিশ্বাস পড়তে চমকে চোখ খুলেই আঁতকে উঠলাম।

সামনে একজন লোক। লোকই বা বলি কী করে! মুণ্ডু নেই, মুণ্ডুটা নিজের হাতে ধরা। দুটো চোখ বীভৎসভাবে বেরিয়ে আছে। দাঁতের ফাঁক দিয়ে জিভটা ঝুলে পড়েছে। সেই জিভ দিয়ে টপ টপ করে রক্তের ফোঁটা ঝরছে।

আমি চিৎকার করতেই মুণ্ডুটা জিভটাকে ভিতরে টেনে নিয়ে চাপা গলায় বলল, "চুপ, ভয়ের কিছু নেই। আমিও তোমার মতন ট্রেনে লজেন্স হজমিগুলি ফেরি করে বেড়াতাম। নিজে গান বেঁধে সুরে করে গাইতাম। গানের গলা ছিল বলে বাবুরা খুশি হয়ে শুনত, তারপর আমার জিনিস কিনত। সেইজন্য অন্য ফেরিওয়ালারা আমায় হিংসা করত, বিশেষ করে তারক। সে আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকত। আমার মতন গাইবার চেষ্টা করত, পারত না। এক সন্ধ্যায় টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে। আমি গাড়ির পাদানিতে দাঁড়িয়ে। ট্রেনের গতি একটু কমলে পাশের কামরায় উঠব। তারক ঠিক আমার পিছনে। হঠাৎ সে সজোরে আমাকে ধাক্কা দিল। পাশের লাইন দিয়ে দার্জিলিং মেল আসছিল নক্ষত্রবেগে। ট্রেনের গতিবিধি আমাদের নখদর্পণে। সঙ্গে সঙ্গে আমি ছিটকে একেবারে লাইনের ওপর। তারপর দার্জিলিং মেলের চাকা—'

লোকটির কথা শোনা গেল না। চোখ-বাঁধানো বিদ্যুতের আলো, তারপরই খুব কাছে কোথাও বাজ পড়ল।

জানালার কাচ ঝনঝন করে উঠল। মেঝে কেঁপে উঠে মনে হল চেয়ারগুলো উলটে ফেলে দেবে।

আমরা সবাই প্রথমে ভাবলাম বুঝি ভূমিকম্প, তারপর বুঝতে পারলাম, না, বাজের শব্দ।

পলাশ বলল, 'খুব ভূতের গল্প ফেঁদেছ তো হে!'

কোনো উত্তর নেই।

আমি তাড়াতাড়ি উঠে সুইচ টিপলাম। আলোয় ঘর ভরে গেল।

কী আশ্চর্য, কোণ খালি! লোকটা কোথাও নেই।

অথচ লোকটা ঘরের মধ্যে ঢোকবার পর দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। দরজা সেইরকমই বন্ধ আছে।

বাইরে একটা মোটরের শব্দ। অনেকগুলো লোকের চিৎকার।

দরজা খুলে আমরা বাইরে এলাম। বৃষ্টি কমে গেছে। একটা অ্যাম্বুলেন্স দাঁড়িয়ে। গোটা চারেক পুলিশ রোয়াকের কাছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'কী হল?'

ইনস্পেকটর বলল, 'আপনাদের পাশের বাড়ি থেকে থানায় ফোন করেছিল, এখানে মড়া পড়ে আছে।'

'মড়া!'

আমরা উঁকি দিয়েই চমকে উঠলাম। সেই লোকটা পড়ে রয়েছে চিত হয়ে। দুটো হাত বুকের ওপর জড়ো করা। দুটো চোখের তারা বিস্ফারিত।

'কখন মারা গেল?'

'ঠিক বলা মুশকিল। তবে ঘণ্টা দুয়েক তো নিশ্চয়। একেবারে কাঠ হয়ে গেছে।'

কিন্তু বলতে গিয়েই সামলে নিলাম। আমার কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। লোকটার পরনে আমার দেওয়া পুরোনো শার্ট, যেটা তাকে আধঘণ্টা আগে দেওয়া হয়েছিল।

ওদের মুখ দেখে বুঝতে পারলাম, সমীর আর পলাশ দুজনেই সেটা লক্ষ করেছে।

সূচীপত্রে যান

ভূতচরিত

ভূত নেই বলি কী করে?

এতদিন বুক ফুলিয়ে বন্ধুবান্ধবদের আসরে, সভা-সমিতিতে বলে এসেছি, ভূত শুধু মানুষের ভয়ের ছায়া, দুর্বল মানুষের অসুস্থ কল্পনা।

ভূতে বিশ্বাসী কয়েক জন বন্ধু তর্ক করেছে।

পৃথিবীতে তোমার চেয়ে অনেক পণ্ডিত, বিজ্ঞ লোকেরা ভূতের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। তুমি চিৎকার করে সে অস্তিত্বে ফাটল ধরাতে পারবে না। সবিনয়ে তাদের বলেছি তাই, পণ্ডিতদেরও ভুল হয়, বিজ্ঞজনেরা প্রমাদমুক্ত নন। বিখ্যাত চিকিৎসকের ভুলের জন্য কত রোগী খতম হয়েছে, প্রথম শ্রেণির উকিলদের ভুলে কত নিরীহ লোক ফাঁসির রজ্জু গলায় পরেছে, তার ঠিক আছে। কাজেই তোমাদের ও প্রমাণ আমি মানতে রাজি নই। যতক্ষণ না আমি নিজের চোখে দেখছি।

বন্ধুরা মারমুখী হয়ে উঠেছে।

'তার মানে তোমার স্থূল দেখাটাই আসল। তুমি নিজের চোখে—'

তাদের বাধা দিয়ে বলেছি—

'তোমরা কী বলবে জানি! আমেরিকা আমি দেখিনি বলে, আমেরিকা নেই? আমার ঠাকুরদার বাবাকে আমি চাক্ষুষ দেখিনি, কাজেই তাঁরও অস্তিত্ব নেই, এই তো? কিন্তু আমেরিকা ফেরত অনেক লোকের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। তারা আমেরিকা দেখেছে। আর ঠাকুরদাকে আমি দেখেছি, তাই বৈজ্ঞানিক কারণে তাঁর বাবাও নিশ্চয় ছিলেন। কিন্তু তোমরা কেউ ভূত দেখেছ? এমন কাউকে আমার সামনে হাজির করতে পারো, যিনি স্বচক্ষে ভূত দেখেছেন?'

বন্ধুরা আমার মতন নাস্তিক সম্বন্ধে হতাশ হয়ে তর্ক বন্ধ করেছে।

নাস্তিক। কারণ তাদের মতে, ভূত যে মানে না, ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তার বিশ্বাস না থাকাই স্বাভাবিক।

আমি নিজে কিন্তু কম চেষ্টা করিনি।

যেখানে ভূতের গন্ধ পেয়েছি, সেখানে ছুটেছি। পোড়ো বাড়িতে, জলা জায়গায়, তেপান্তরের মাঠে, গোরস্থানে, শ্মশানে, কিন্তু ভূতের দেখা পাইনি।

এমনই করে স্কুল জীবন কাটল। কলেজ জীবনের কিছুটা।

একদিন ক্লাস ছিল না। কমনরুমে বসে গল্প করছিলাম। নানা ধরনের কথাবার্তা। দেশবিদেশের কথা, চাকরির অবস্থা, সাধারণভাবে মানুষের মধ্যে ধর্মহীনতার প্রসার! শেষকালে শুরু হল ভূতের কাহিনি।

আমার এক সতীর্থ বলল, 'মানুষ যত সভ্য হচ্ছে, শহরের প্রসার হচ্ছে, ততই ভূত সরে যাচ্ছে।'

আমি হেসে বললাম, 'ভূত ছিলই না কোনোদিন, কাজেই সরে যাবার প্রশ্ন ওঠে না।'

আমার কথা শেষ হবার আগেই গুরুগম্ভীর কণ্ঠ কানে এল।

'বলো কী হে, ভূত নেই?'

চমকে ফিরে দেখলাম।

একটু দূরে আর একটা চেয়ারে একজন ছাত্র। বয়সে আমাদের চেয়েও বড়ো। একমুখ গোঁফ আর দাড়ি। চোখে পুরু পাওয়ারের চশমা। জানতাম ছাত্রটির নাম আনন্দমোহন। দর্শনে এম.এ. পড়ে।

'ভূত দেখবার সাহস আছে?'

দলের সবাই চুপচাপ। কেবল আমি বললাম, 'হ্যাঁ আছে।'

সূচীপত্রে যান

আনন্দমোহন চেয়ারটা টেনে আমার পাশে বসল। অনলবর্ষী দৃষ্টি দিয়ে কিছুক্ষণ আমাকে দেখল, তারপর বলল, 'কিছু হলে আমাকে দায়ী করতে পারবে না।'

হেসে বললাম, 'নিশ্চিন্তে থাকুন, আমি সাবালক। আপনার কোনো দায় থাকবে না।'

'বেশ, শোনো তাহলে, ক্যানিং লাইনে চেপে চাঁপাটিতে নামবে। ভালো নাম চম্পাহাটি। সেখান থেকে দু-মাইল দূরে খালেশ্বরীর মন্দির। তার পাশেই শ্মশান। অমাবস্যার রাতে সেই শ্মশানে গিয়ে রাত কাটিয়ে ফিরে আসতে হবে, অবশ্য যদি তোমার বরাতে ফিরে আসা থাকে।'

এরকম ভয় দেখানো কথা আগেও অনেক শুনেছি। অন্য শ্মশানে অন্ধকারে রাতও কাটিয়েছি। কিছু দেখতেও পাইনি। আমার কোনো ক্ষতিও হয়নি। তাই বললাম, 'কিন্তু আমি যে সত্যি খালেশ্বরী মন্দিরের শ্মশানে গিয়েছি, তা আপনার কাছে প্রমাণ করব কী করে?'

আনন্দমোহন মাথা নাড়ল, 'তার উপায় আছে। খালেশ্বরী মন্দিরের পাঁচিলে অদ্ভুত পরগাছা আছে। মানুষের আঙুলের মতন লম্বা পাতা। পাঁশুটে রং-এর ফুল হয়। এ ধরনের গাছ অন্য কোথাও দেখিনি। তা ছাড়াও আর এক ব্যাপার আছে। সেই পরগাছার পাতায় পাতায় চিতার ধোঁয়ার গন্ধ! মড়া পোড়ানোর চামড়ার আঁশটা গন্ধে অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসে। সেই গাছের পাঁচটা পাতা তুলে আনতে হবে।'

'ঠিক আছে, আমি রাজি।'

আনন্দমোহন আমার সঙ্গে চম্পাহাটি পর্যন্ত যাবে। সেখানে তার এক মাসির বাড়ি। রাত হলে আমি চলে যাব শ্মশানে। পরগাছার পাতা নিয়ে ভোরবেলা ফিরে আনন্দমোহনের সঙ্গে দেখা করব।

যদি পার, আনন্দমোহন পেট পুরে 'কলেজ কেবিনে' খাওয়াবে। তা ছাড়া করকরে দশ টাকার একটা নোট দেবে।

আনন্দমোহনের মেসো অনেক বারণ করল।

'বাবা, ওসব গোয়ার্তুমি করতে যেও না। জায়গাটা খুবই খারাপ। তান্ত্রিকরা উপাসনা করেন। অমাবস্যায় নির্ঘাত ওঁদের আবির্ভাব হয়।'

হেসে উত্তর দিলাম, 'ওদের সঙ্গে মোলাকাত করতেই তো যাচ্ছি।'

আমি যখন নাছোড়বান্দা, তখন আনন্দমোহনের মেসো একটা রুদ্রাক্ষ নিয়ে হাতে বেঁধে দিয়ে বলল, 'রাম রাম। বিপদে পড়লে রামনাম জপ করবে। আর কী বলব বাবা, এসব সর্বনেশে খেলায় মেতো না। কোনোদিন মুশকিলে পড়ে যাবে।'

রাত আটটায় খাওয়াদাওয়া সেরে শ্মশানের দিকে রওনা হলাম। ঘুটঘুটে অন্ধকার। ভালো করে পথ দেখাই যায় না। ঝোপে ঝোপে জোনাকির ঝাঁক। কয়েক বার বিশ্রি সুরে পেঁচা ডেকে উঠল। ঝিঁঝির আওয়াজ।

এসবে আমি অভ্যস্ত। এর আগে বাজি রেখে বার তিনেক নানা জায়গার শ্মশানে গিয়েছি। মড়ার খাট থেকে গাঁদা ফুলের মালা ছিঁড়ে এনেছি।

প্রায় ঘণ্টা তিনেক পর শ্মশানে পৌঁছোলাম। এতটা সময় লাগার কথা নয়। মনে হয় পথ হারিয়েছিলাম।

শ্মশানের কাছাকাছি আসতেই তীব্র মাংসল গন্ধে বমি আসতে লাগল। বুঝতে পারলাম বোধ হয় মড়া পোড়ানোর গন্ধ। অথচ কাছে গিয়ে কোনো চিতা দেখতে পেলাম না।

একটু ঘোরাঘুরি করেই বুঝতে পারলাম, উগ্র গন্ধটা আসছে খালেশ্বরী মন্দিরের দিক থেকে।

কাছে গিয়ে টর্চ জ্বালালাম। গন্ধের জন্য নাকে রুমাল চাপা দিলাম।

এইসময় এলোমেলো হাওয়া উঠল। পরগাছাগুলো শিরশির করে কেঁপে উঠল। কী আশ্চর্য, ঠিক যেন আঙুল নেড়ে আমাকে কাছে ডাকছে!

ভোরবেলা ফেরার সময় এই পরগাছার পাতা ছিঁড়ে নিয়ে যাব।

আবার শ্মশানের দিকে ফিরলাম।

সূচীপত্রে যান

স্থির জোনাকির মতন অনেকগুলো আলো। বুঝতে অসুবিধা হল না, ওগুলো শিয়ালের চোখ। তাদের রাজত্বে আমার অনাহূত উপস্থিতিতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। কাছে যেতেই ছুটে পালাল।

অদ্ভুত একটা শোঁ-শোঁ শব্দ। মড়ার খুলির মধ্যে দিয়ে বাতাস প্রবাহিত হলে এ ধরনের শব্দ হয়।

আর একটু এগিয়েই দাঁড়িয়ে পড়লাম।

উঁচু ঢিবির ওপর বাঁশের খাট। তার ওপর একটা মড়া। মুখ ঢাকা। ধারে-কাছে কোনো লোক দেখতে পেলাম না।

সরে এলাম। এদিকটা অনেকগুলো গাছের জটলা। তার তলায় মিটমিট করে লণ্ঠন জ্বলছে।

যাক সম্ভবত কোনো লোক আছে এখানে। শ্মশানে সারাটা রাত একলা থাকতে হবে না।

কাছে গিয়ে দেখলাম, লণ্ঠন মাঝখানে রেখে দুজন লোক চুপচাপ বসে আছে। পরনে গেঞ্জি আর ধুতি। বিস্ফারিত চোখ। গালের চোয়াল প্রকট।

'কে আপনারা?'

বার দুয়েক প্রশ্ন করতে উত্তর মিলল।

'আমরা মড়া পোড়াতে এসেছি।'

'শুধু দুজন?'

'আরও দুজন গাঁয়ে গেছে কাঠ কিনতে। অনেকক্ষণ গেছে ফিরছে না কেন কে জানে! নেশা করে কোথাও পড়ে নেই তো?'

আমি তাদের কাছে বসে পড়লাম। যাক, সারাটা রাত অন্তত মুখ বুজে থাকতে হবে না। কথা বলবার লোক পাব।

একজন আমার দিকে চোখ তুলে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি এখানে কেন?'

বললাম, 'বেড়াতে এসেছি।'

উত্তর শুনে দুজনেই খ্যাঁক খ্যাঁক করে হেসে উঠল।

'শ্মশানে বেড়াতে? ভালো, ভালো। বেড়াবার আর জায়গা পেলেন না?'

মরীয়া হয়ে বলে ফেললাম, 'ভূত দেখতে এসেছি।'

আবার সেই খ্যাঁক-খ্যাঁক হাসি।

'খাঁচা এনেছেন?'

'খাঁচা? খাঁচা কী হবে?'

'কেন, ভূত দেখতে পেলে ধরে নিয়ে যাবেন।'

বুঝলাম ঠাট্টা করছে। কোনো উত্তর দিলাম না।

কিন্তু কতক্ষণই-বা চুপচাপ থাকা যায়!

এক সময়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কে মারা গেলেন?'

'আমাদের দাদা।'

আবার চুপচাপ।

কিছুক্ষণ পর একজন আর একজনকে বলল, 'এ তো মুশকিল হল। কতক্ষণ এভাবে বসে থাকব। এত দেরি তো হবার কথা নয়!'

'চল, একটু এগিয়ে দেখি।'

লণ্ঠন তুলে নিয়ে ওরা উঠে দাঁড়াল।

'আপনি বসে বসে শ্মশানের হাওয়া খান মশাই। আমরা গাঁয়ের দিকে একটু এগিয়ে দেখি।'

বসে বসে দেখলাম লণ্ঠনের ম্লান দীপ্তি গাছপালার আড়ালে ঢাকা পড়ে গেল। হাওয়ায় গড়াতে গড়াতে পায়ের কাছে কী-একটা ঠেকল। হাতে করে তুললাম।

সূচীপত্রে যান

নরমুণ্ড! কী আশ্চর্য, হাতে করতেই যেন নড়ে উঠল। জীবন্ত বস্তুর মতো। মাটিতে ফেলে দিতেই আবার গড়িয়ে গড়িয়ে চলে গেল।

বুঝতে পারলাম মনের ভুল। মনের ভুল, না মনের ভয়।

ভয় ঝেড়ে ফেলার জন্য উঠে দাঁড়ালাম।

হাঁটতে হাঁটতে ডোবার ধারে গিয়ে হাজির।

ধারে একটা হিজল গাছ। তাতে হেলান দিয়ে বসলাম।

বোধ হয় তন্দ্রা এসে গিয়ে থাকবে, গায়ে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়তে চমকে জেগে উঠলাম।

টর্চের আলোয় হাতঘড়ি দেখলাম। রাত তিনটে। তার মানে অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছি। আর ঘণ্টা খানেক। চারটের সময় এখান থেকে রওনা হলে ছ-টা নাগাদ আনন্দমোহনের মাসির বাড়ি পৌঁছে যাব।

তার আগে পরগাছার পাতাগুলো ছিঁড়ে নিই।

আবার মন্দিরের কাছে এলাম। হাত বাড়িয়ে পাতা ছিঁড়তে গিয়েই বিপদ। কিছুতেই ছিঁড়তে পারলাম না। কী শক্ত পাতা!

শুধু তাই নয়। মনে হল কে যেন আমাকে ধাক্কা দেবার চেষ্টা করছে, বাধা দিচ্ছে। কিছুতেই পাতা ছিঁড়তে দেবে না।

মনে পড়ে গেল, পকেটে ছুরি আছে।

ছুরি বের করে পাঁচটা পাতা কেটে নিলাম। ঠিক মনে হল, মানুষের দেহের ওপর যেন ছুরি চালাচ্ছি।

তারপরই অবাক কাণ্ড। কাটা পাতা থেকে টপটপ করে রক্ত ঝরে পড়তে লাগল!

রক্ত মানে লাল রং-এর রস।

পাতা পাঁচটা রুমালে বেঁধে শ্মশানে ফিরে এলাম।

মিটমিট করে লণ্ঠন জ্বলছে। তাহলে, লোকগুলো বোধ হয় ফিরে এসেছে।

লণ্ঠনের কাছে গিয়েই চমকে উঠলাম।

সারি সারি তিনটে খাটিয়া।

কিন্তু লোকজন কোথায়? এরা এলই-বা কখন।

টর্চের আলো ফেললাম খাটিয়ার ওপর, তারপর মনে হল পিঠের শিরদাঁড়া বেয়ে ঠান্ডা একটা শিহরণ। আমার সমস্ত শরীর টলতে লাগল।

এ কী করে হল!

তিনটে খাটিয়াতে এক মড়া! এক বয়স, একরকম দেখতে!

লণ্ঠন নিয়ে যে দুজন বসেছিল, এখন মনে পড়ল, তাদের দুজনেরও এরকম চেহারা! সেই চেহারা খাটিয়ার ওপর।

এবার বুঝতে পারলাম, বেশ একটু ভয় ভয় করছে।

কোনো যুক্তি দিয়েই মনকে বোঝাতে পারলাম না। এরকম কী করে হতে পারে!

শ্মশানে থাকতে সাহল হল না।

চম্পাহাটির দিকে রওনা হলাম।

পিছন ফিরতেই মনে হল কারা যেন খ্যাঁক খ্যাঁক করে হেসে উঠল। নাকি সুরে বলে উঠল, 'খাঁচা এনেছেন? ভূত নিয়ে যাবেন কীসে?'

সেবার বাজি জিতেছিলাম বটে, আনন্দমোহনের প্রশংসাও পেয়েছিলাম, কিন্তু মনের মধ্যে একটা সন্দেহ দানা বেঁধে রইল।

ভূত যদি নেই, তাহলে একই চেহারার তিনটে মড়া পাশাপাশি দেখলাম কী করে! বিশেষ করে যে দুজনকে কিছুক্ষণ আগে জীবন্ত দেখেছি, কথা বলেছি, তারাই মড়া হয়ে খাটিয়ায় শুয়ে!

সূচীপত্রে যান

ভৌতিক না হলেও অলৌকিক তো বটেই! অনেক বছর কেটে গেছে। ভূতের কথা ভাববার আর অবসর পাইনি। ডাক্তারি পড়া নিয়ে প্রাণান্ত। পাঁচ বছরের কোর্স, শেষ হল সাত বছরে। পরীক্ষার মুখে ঠিক একটা করে ঝঞ্ঝাট।

তারপর হাসপাতালে এক বছর হাউস সার্জেন হিসেবে।

জীবনের বীভৎস দিকটার সঙ্গে পরিচিত হলাম। সেই সময় সারা শহরে খুনোখুনির রাজত্ব। সময় নেই, অসময় নেই, গাদা গাদা মড়া মর্গে এসে পৌঁছোতে লাগল। বোমায় কারও হাত-পা উড়ে গেছে, ছোরার আঘাতে কারও পেটের নাড়িভুঁড়ি বাইরে এসে পড়েছে। আবার পথদুর্ঘটনার বলিও আছে। লরি কিংবা বাসের তলায় থেঁতলানো দেহ।

এইসব মড়া চিরে রিপোর্ট দিতে হত। এই কাজে আমার সহায় মাধাই ডোম। সেই অর্ধেকের বেশি কাজ করে দিত।

খালেশ্বরীর মন্দিরের সেই পরগাছার গন্ধে একদিন নাকে রুমাল চাপা দিতে হয়েছিল, কিন্তু এখন স্তূপীকৃত মড়ার গাদার মধ্যে ঘোরাফেরা করতে কোনো গন্ধ পাই না।

এক রাতে ঘুমে অচেতন ছিলাম, হঠাৎ দরজায় ধাক্কা।

ডাক্তার সায়েব! ডাক্তার সায়েব!

অল্প ডাকেই ইদানীং ঘুম ভেঙে যেত। তাড়াতাড়ি উঠে দরজা খুলে দেখলাম মাধাই ডোম দাঁড়িয়ে।

কী খবর জানাই ছিল, তবু জিজ্ঞাসা করলাম, 'কী ব্যাপার?'

'একটা মড়া এসেছে হুজুর।'

'তাড়া কীসের। কাল সকালেই হবে।'

'না, আপনি একবার আসুন!'

আশ্চর্য লাগল। মাধাই ডোমের এত আগ্রহ দেখিনি এর আগে।

পোশাক বদলে মর্গে চলে এলাম।

মেঝের ওপর স্ট্রেচারে শোয়ানো রয়েছে। মনে হচ্ছে যেন ঘুমোচ্ছে। বছর উনিশ-কুড়ির বেশি নয়। একমাথা ঢেউ-খেলানো চুলের রাশ। কালো চুলের মাঝখানে পদ্মের মতো ঢলঢলে একটা মুখ। মুখে কোনো বিকৃতি নেই, একটু কুঞ্চনও নয়।

'কে নিয়ে এল?'

'পুলিশ।'

'মারা গেল কীসে?'

উত্তরে মাধাই ডোম দেহটা উপুড় করে দিল।

পিঠের দু-জায়গায় গভীর ক্ষতচিহ্ন। মনে হল ধারালো ছোরা দিয়ে দু-বার আঘাত করা হয়েছে।

মাধাই ডোম আজকাল অনেক বিজ্ঞ হয়েছে। গম্ভীর গলায় বলল, 'পার্টির ব্যাপার হুজুর। আজকাল যা হয়েছে!'

নিজের কাজ শুরু করলাম। ঘণ্টা খানেকের বেশি লাগল না। রিপোর্ট লেখাও শেষ।

মাধাই ডোমকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'বডি নিতে কেউ এসেছে?'

'না হুজুর, এখনও হয়তো সর্বনাশের খবরই পায়নি।'

'তা ঠিক। কাল খোঁজ পড়বে।'

পরের দিনও কেউ এল না। পুলিশ মৃতদেহের ফোটো নিয়েছিল। তার ফোটোও ছাপিয়ে দিয়েছিল বড়ো বড়ো খবরের কাগজে।

দিন চারেক পার হয়ে গেল। দেহ নিতে তবুও কেউ এল না।

সূচীপত্রে যান

ওষুধ ইঞ্জেকশন দিয়ে মৃতদেহ ঠিক রাখার চেষ্টা করা হয়েছিল। যাতে গন্ধ না বের হয়, কিন্তু দেহ আটকে রাখবার একটা সীমা আছে।

মাধাই ডোম এসে তাগাদা দিতে লাগল।

'হুজুর, আর কতদিন আটকে রাখব? হুকুম দিন, গাদায় পুড়িয়ে দিই।'

মাধাই ডোমের উদ্দেশ্যও ছিল।

অনেক হাড়ের ব্যবসায়ী চড়া দামে কঙ্কাল কিনতে চায়। বেওয়ারিশ লাশ তাদের পাচার করে দেওয়া খুব লাভজনক।

যখন ভাবছি কী করব, তখন একজন ছাত্র এসে খবর দিল, 'স্যার, একটি ছোকরা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।'

এরকম অনেকেই আসে। আত্মীয়স্বজনকে হাসপাতালে ভরতি করতে হয়, কিংবা মেডিকেল রিপ্রেজেনটেটিভ। ওষুধ গছাতে উৎসাহী।

দুটো ব্যাপারেই আমার কোনো হাত ছিল না। তবু ছোকরাকে ডেকে পাঠালাম। মাধাই ডোমকে বললাম, 'পরে দেখা করতে।'

ছোকরা আমার ঘরে ঢুকতেই চমকে উঠলুম।

চেহারায় এমন মিল হয়? মৃতা মেয়েটির সঙ্গে অদ্ভুত সাদৃশ্য। মুখ, চোখ, রং একরকম। মেয়েটিই যেন পুরুষের বেশ পরে এসেছে।

কিছুক্ষণ কথা বলতে পারলাম না। তারপর বললাম, 'কী চাই?'

'আমার বোন আভার বডিটা নিতে এসেছি। ছোরা মারার কেস।'

'এত দেরি হল আপনার?'

'আমি অনেক দূর থেকে আসছি। খবরের কাগজে ফোটো দেখে চিনতে পেরেছি।'

কথাগুলো বলার সময়ে ছোকরার গলা অশ্রুরুদ্ধ হয়ে এল। মৃদুকণ্ঠে বলল, 'দেশ থেকে এ হানাহানির কবে যে শেষ হবে!'

আমি বলেই ফেললাম, 'আপনার সঙ্গে আপনার বোনের চেহারার কিন্তু অদ্ভুত মিল।'

ছোকরা কিছুক্ষণ একদৃষ্টে আমার দিকে দেখল, তারপর বলল, 'সত্যি কথা বলতে কী, আমরা যমজ। আমি আভার চেয়ে সাত সেকেন্ডের বড়ো।'

বডি ছেড়ে দেবার জন্য যা প্রয়োজন করে দিলাম।

মনে একটু সান্ত্বনা পেলাম, যাক মেয়েটির দেহের সৎগতি হবে।

ব্যাপারটা ঘটল ঠিক পরের দিন।

কোয়ার্টার থেকে বের হয়ে হাসপাতালে ঢুকছি, মাধাই ডোমের সঙ্গে দেখা।

'হুজুর, আর একজন লাশের খদ্দের এসেছে।'

'কে? কোন লাশের?'

'সেই ছোরা মারার কেস হুজুর। অল্পবয়সি মেয়েটার।'

'বলিসনি, কাল তার ভাই লাশ নিয়ে গেছে?'

'বলেছি হুজুর। ভদ্রলোক একবার আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।'

বিরক্তিকর। বললাম, 'আসতে বল।'

ভদ্রলোক ঢুকল। প্রৌঢ়। মাথায় কাঁচা-পাকা চুল। চোখে বেশি পাওয়ারের চশমা। খুব গম্ভীর চেহারা।

আমি বললাম, 'আপনি ডোমের কাছে শোনেননি?'

'হ্যাঁ, শুনেই তো আপনার কাছে এসেছি। সত্যি কথাটা জানতে।'

'এ আর সত্যি-মিথ্যে কী? ভাই এসে লাশ নিয়ে গেছে। যমজ ভাই।'

সূচীপত্রে যান

সামনে রাখা চেয়ারে ভদ্রলোক বসে পড়ে বলল, 'যমজ ভাই? মানে, অঞ্জু এসে বডি নিয়ে গেছে।'

'নাম মনে নেই। খাতায় লেখা আছে, দেখতে পারেন। আপনি কে?'

'আমি আভার বাবা।'

'বাবা?'

'হ্যাঁ। চাকরি থেকে অবসর নিয়ে রেবতীপুরে থাকি। রেবতীপুর অজ পাড়াগাঁ। বর্ধমান থেকে ত্রিশ মাইল। আমার মেয়ে আভা এখানে কী করত আমি জানি না। আমার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল না। শুনেছি বাজে লোকের খপ্পরে পড়েছিল। চালের চোরাকারবার করত!'

ভদ্রলোক দীর্ঘশ্বাস ফেলে পকেট থেকে ভাঁজ করা খবরের কাগজ টেনে বের করল।

'কাল কাজে বর্ধমান এসেছিলাম। কী আশ্চর্য ব্যাপার দেখুন! জিনিস কিনে গাঁয়ে ফিরছি। সেই কাগজের মোড়কে আভার ছবি। অবাধ্য হোক, যাই হোক, মেয়ে তো! সকালেই ছুটে চলে এলাম।'

'কিন্তু আপনাকে তো বললাম, আপনার ছেলে এসে বডি নিয়ে গেছে।'

'তা কী করে হয়?'

ভদ্রলোক অদ্ভুত দৃষ্টি দিয়ে আমাকে দেখল।

'না হবার কী আছে! আপনার মতন তিনিও খবরে কাগজ দেখে চলে এসেছেন।'

'কিন্তু,' ভদ্রলোক ধরা গলায় বললেন, 'অঞ্জু তো পাঁচ বছর আগে মারা গেছে। বাস দুর্ঘটনায়।'

এবার আমি সোজা হয়ে বসলাম, 'সেকী!'

'সেইজন্যই তো আশ্চর্য লাগছিল। অঞ্জু আসবে কী করে!'

অনুভব করতে পারলাম, শরীরের রক্ত মুখে এসে জমল। অনেক বছর আগে খালেশ্বরীর মন্দিরের পাশে শ্মশানের সেই অভিজ্ঞতা মনকে আচ্ছন্ন করল।

দুটো ঘটনাই তো আমার নিজের চোখে দেখা।

কী করে অস্বীকার করব! কোন যুক্তিতে!

সূচীপত্রে যান

ভূতুড়ে কাণ্ড

যে কাজ যুক্তি দিয়ে বোঝানো যায় না, কিংবা যে কাজ আশ্চর্যজনকভাবে ঘটে যায়, তাকে আমরা বলি ভূতুড়ে কাণ্ড। আবার ভূতরা নিজে যে কাজ করে তাকে তো ভূতুড়ে কাণ্ড বলেই।

আমাদের পরিবারে এমনই এক ভূতুড়ে কাণ্ড ঘটেছিল। পরীক্ষা দিয়ে মামার বাড়ি বেড়াতে গেছি। দিদিমা আর মামাদের আদরের সঙ্গে প্রচুর আম, জাম, জামরুল খাচ্ছি। তোফা আনন্দে সময় কাটাচ্ছি।

তিন মামা। বড়ো মামা রেল অফিসে কাজ করতেন। বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে শহরের বাসাবাড়িতে থাকতেন। মাসে একবার বাড়িতে আসতেন।

তিনি মেজো মামাকে তারই অফিসে চাকরি করে দেবার কথা বলেছিলেন। কিন্তু মেজো মামা রাজি নন। ছেলেবেলা থেকে মেজো মামা একটু ভিন্ন প্রকৃতির। সব ব্যাপারে বেপরোয়া।

তিনি বলেছিলেন, 'চাকরি বাকরি আমার ধাতে পোষাবে না। আমি স্বাধীন ব্যাবসা করব।'

তা মেজো মামা স্বাধীন ব্যাবসাই শুরু করেছিলেন। পাঁচ মাইল দূরের মাছের ভেড়ি থেকে মাছ কিনে গঞ্জের হাটে ব্যাপারীদের কাছে সেই মাছ বিক্রি করত। পরিশ্রমের কাজ, কিন্তু ভালো টাকাই হাতে থাকত।

ছোটো মামা কিছু করত না। মামাদের চাষবাসের জমি দেখত আর অবসর সময়ে জাল দিয়ে পাখি ধরত, কাঠি দিয়ে খাঁচা করত আর তাতে পাখিগুলোকে রাখত। তবে বেশিদিন নয়। হঠাৎ একদিন খাঁচা খুলে পাখিগুলোকে উড়িয়ে দিত। এক নম্বরের খেয়ালি লোক।

আমাদের গল্প অবশ্য মেজো মামাকে নিয়ে। গল্পই-বা বলি কেন, একেবারে আমার চোখে দেখা ঘটনা।

মেজোমামা ভোরে উঠে সাইকেলে রওনা হয়ে যেতেন। খুব ভোরে, তখন ভালো করে আলোও ফুটত না। রাস্তাটা অনেকটা পাকা নয়। মানুষের পায়ে চলে সরু একটু রেখা। বেশ কিছুটা যাবার পর ইউনিয়ন বোর্ডের পাকা রাস্তা।

একদিন ভোরেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। থেকে থেকে বিদ্যুতের ঝিলিক আর মেঘের গর্জন। বোঝা যাচ্ছে, একটু পরেই ঝড়জল শুরু হয়ে যাবে।

মেঘের ডাকে আমি ভোর ভোর উঠে পড়েছি। উঠে মেজোমামার যাওয়ার তোড়জোড় দেখছি। দিদিমা বললেন, 'ওরে, এই আবহাওয়ায় আজ না-হয় নাই বেরোলি, আকাশের অবস্থা ভালো নয়, এখনই জোর তুফান উঠছে।'

ঝড়কে দিদিমা তুফান বলতেন।

মেজোমামা হাসলেন। 'তাহলে বর্ষাকালে বাড়ির বাইরে যাওয়া যায় না। আমার কাছে বর্ষাতি আছে। কোনো অসুবিধা হবে না।'

মেজোমামা যখন বের হলেন, তখন ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। বাতাসও বেশ জোর। আধ ঘণ্টার মধ্যে দারুণ ঝড় উঠল। চারিদিক অন্ধকার। বাজের শব্দে কান পাতা দায়। সেইসঙ্গে তুমুল বর্ষণ। এধারে-ওধারে বড়ো বড়ো গাছ মড়মড় করে ভেঙে পড়ল কী বাড়ির চালা উড়ে গেল। ধসে পড়ল মাটির দেয়াল। দিদিমার কথাই ঠিক। তুফানই বটে!

আমি জানলার ধারে চুপচাপ বসে প্রকৃতির তাণ্ডব দেখছি। একটু পরেই দিদিমা এসে আমার পাশে বসলেন।

বসেই অপেক্ষা করতে লাগলেন, 'এই দুর্যোগে বাড়ির কুকুর বেড়াল বাইরে বের হয় না, আর এত করে বারণ করা সত্ত্বেও ছেলেটা রাস্তায় বের হল!'

সূচীপত্রে যান

সত্যিই চিন্তার কথা। এই ঝড়জলে বর্ষাতি আর মেজোমামাকে কতটুকু বাঁচাতে পারবে। হাওয়ার দাপটে সাইকেল চালানোই মুশকিল। সাইকেল থেকে নেমে যে কোনো গাছের তলায় আশ্রয় নেবেন, তাও নিরাপদ নয়। মাথার উপর গাছের ডাল ভেঙে পড়লেই হল।

সন্ধ্যা পর্যন্ত একটানা ঝড়বৃষ্টি চলল। দিদিমা খাওয়াদাওয়া ছেড়ে বিছানা নিলেন। মেজোমামার নাম করে অঝোরে কান্না।

মেজোমামা ফিরলেন রাত আটটা নাগাদ। সাইকেল নেই। হেঁটেই এসেছেন। হাঁটু পর্যন্ত কাদা। পরনের জামাকাপড় ছিন্নভিন্ন। বর্ষাতির খোঁজ নেই।

দিদিমা মেজোমামাকে জাপটে ধরলেন। কিছুতেই ছাড়বেন না। শুধু কী জাপটে ধরা, ভেউ ভেউ করে কান্না। মেজোমামা বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আঃ ছাড়ো! জাপটাজাপটি ভালো লাগে না। আমি মরছি নিজের জ্বালায়!'

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'মেজোমামা তোমার সাইকেল?'

'বট গাছ চাপা পড়ে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে গেছে।'

'বট গাছ চাপা!'

'হ্যাঁ কাঞ্চনতলার কাছে দারুণ ঝড় উঠল। বট গাছের ডাল মড়মড় করে ভেঙে পড়ল আমার ওপর। সাইকেল চুরমার হয়ে গেল। আমি ছিটকে পড়লাম মাটির ওপর। এই দেখ না।'

মেজোমামা চুল সরিয়ে দেখালেন। মাথার এক জায়গায় রক্ত জমে কালো হয়ে গেছে।

তারপর থেকে মেজোমামা কেমন বদলে গেলেন। মাছের ব্যাবসা বন্ধ।

সারাটি দিন ঘুমিয়ে কাটাতেন। রাত্রে বেরিয়ে যেতেন। কখন ফিরতেন কে জানে!

দিদিমা অনেক বলতেন, কিন্তু মেজোমামা নির্বিকার।

শেষকালে দিদিমার নির্দেশে আমি শুতাম মেজোমার সঙ্গে। অবশ্য আলাদা খাটে। একদিন খুব ভোরে মেজোমামার ডাকে ঘুম ভেঙে গেল।

'এই, এক কাপ চা খাওয়াতে পারিস?'

ঘরের কোণে স্টোভ ছিল, তাকের ওপর চা চিনি কাপ ডিস। আগে আগে ভোরে বের হবার সময় মেজোমামা নিজে চা করে খেতেন।

ঘুম জড়ানো গলায় বললাম, 'তুমি নিজে করে খাও না।'

মেজোমামা যেন ভয় পেয়ে গেলেন, 'না, আমি আগুনের কাছে যেতে পারব না, ভয় করে।'

ভয় করে কথাটা মেজোমামার মুখে নতুন শুনলাম। মেজোমামা চিরকাল দুর্দান্ত প্রকৃতির। দারুণ সাহস।

সেই দুর্ঘটনার পর থেকে মেজোমামা যেন কুঁকড়ে গেছেন। কারও সঙ্গে ভালো করে কথাও বলেন না। কেউ ডাকতে এলে বলে দেন, বল আমি বাড়িতে নেই।

আরও আশ্চর্যের কাণ্ড, মাথার একদিকের রক্ত জমে থাকাটা একইরকম হয়ে গেল। ওষুধপত্র মালিশ কিছুতে কিছু হল না।

অগত্যা উঠে চা তৈরি করে দিলাম। নিজেও খেলাম এক কাপ।

আর এক রাতে এমন এক ব্যাপার ঘটল, তাতে একটু ভয়ই পেয়ে গেলাম। কদিন গুমোট গরম পড়েছে। হাতপাখা নেড়ে নেড়ে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছি। কিছুতেই ঘুম আসছে না। বিছানায় এপাশ-ওপাশ করছি।

বহুকষ্টে যাও-বা ঘুম এল, সেটা পেঁচার কর্কশ আওয়াজে ভেঙে গেল।

ভয় পেয়ে উঠে বসলাম। জানলা দিয়ে ঘরের মধ্যে চাঁদের আলো এসে পড়েছে। কোথাও একটু অন্ধকার নেই।

মেজোমামার দিকে চোখ ফিরিয়েই চমকে উঠলাম। আমার মামার বাড়ির সবাই বেশ একটু খর্বকায়। মেজোমামা আবার বেঁটে।

সূচীপত্রে যান

সেই মেজোমামাকে দেখলাম, বিরাট চেহারা। দেহ খাটের বাইরে গিয়ে পড়েছে! দুটো চোখ রগড়ে নিয়ে আবার দেখলাম একই দৃশ্য।

খাট থেকে নেমে পালাবার চেষ্টা করতেই দৃশ্য বদলে গেল। মেজোমামা যেন নিজের সাইজে ফিরে এলেন।

মনকে বোঝালাম, ঘুম চোখে নিশ্চয় ভুল দেখেছি। না হলে এমন ব্যাপার হতে পারে নাকি!

একথা কাউকে কোনোদিন বলিনি, জানি কেউ বিশ্বাস করবে না।

কিন্তু পরে যা ব্যাপার ঘটল, তাতে আমি রীতিমতো ঘাবড়ে গেলাম।

এক রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে দেখি, মেজোমামা বিছানায় নেই। ভাবলাম প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বাইরে গেছেন এখনই ফিরবেন, কিন্তু অনেকক্ষণ কেটে গেল, মেজোমামা ফিরলেন না। উঠে পড়লাম। জানলা দিয়ে বাইরে চোখ পড়তেই বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল। মেজোমামা রোয়াকে বসে আছেন। জানলার দিকে পিছন ফিরে। একটু দূরে গোটা দুয়েক গাছ পার হয়ে একটা জাম গাছ আছে, ছোটোমামা জাল পেতে রেখেছে পাখি ধরবার জন্যে। জালের একজায়গায় ফুটো ছিল, ছোটোমামা বোধ হয় লক্ষ করেনি। সেই ফুটো দিয়ে আটকে থাকা পাখিগুলো ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ করে বেড়িয়ে যাচ্ছে।

মেজোমামা বসে বসেই হাত বাড়ালেন। কী বিরাট হাত! রোয়াক থেকে জাম গাছটার দূরত্ব কমপক্ষে ত্রিশ কজ দূরে তো হবেই।

হাতটা সোজা গাছের ওপর চলে গেল। যেখানে জালের ফুটো সেখানে। মেজোমামা আঙুল দিয়ে জাল গিঁট বেঁধে দিলেন। পাখিদের পালানো বন্ধ হল।

আমি বুকের ওপর হাত চেপেও দুপদুপ শব্দ বন্ধ করতে পারলাম না। মনে হল এখনই অজ্ঞান হয়ে যাব। কোনোরকমে কাঁপতে কাঁপতে খাটের ওপর শুয়ে পড়লাম।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছি, জানি না। ভোরে উঠে দেখি, মেজোমামা খাটে শুয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছেন। আশ্চর্য কাণ্ড, দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। কাল রাতে মেজোমামা যখন রোয়াকে বসে তখন লক্ষ করেছি দরজায় ছিটকানি।

তাহলে মেজোমামা বাইরে গেলেন কী করে? বন্ধ দরজা দিয়ে ঘরের মধ্যেই বা কী করে ঢুকলেন? ঠিক করে ফেললাম, আর মামার বাড়ি নয়। কোনো একটা অছিলায় বাড়ি পালাব।

এটাও কি চোখের ভুল? দু-দু-বার এরকম চোখের ভুল হতে পারে কখনো।

দুপুর বেলা কিন্তু মত বদলে গেল। ছোটোমামা জালে আটকানো পাখিগুলো নিয়ে খাঁচায় পুরছিল। আমি বসে মসে দেখছিলাম। মেজোমামাও বসেছিলেন।

বেশিরভাগই মনুয়া আর টুনটুনি পাখি। একটা শুধু বড়ো আকারের টিয়া। গাঢ় সবুজ রং, লাল চোখ। কিছুতেই ধরা দেবে না। ছোটোমামার হাতে ঠুকরে রক্ত বের করে দিল।

আমি তখন দেখছিলামই, আরও একটা জিনিস লক্ষ করছিলাম, আড়চোখে দেখছিলাম উঠানে মেজোমামার ছায়া পড়েছে কিনা।

দেখে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। উঠানের ওপর মেজেমামার রীতিমতো ছায়া পড়েছে আর তাঁর পায়ের আঙুলগুলো একেবারে স্বাভাবিক।

তার মানে রাত্রে নিশ্চয় আমি বিদঘুটে স্বপ্ন দেখেছি। পেট গরম হলে যা হয়। পেট ঠান্ডা করার জন্য রোজ সকালে একটা করে ডাব খেতে হবে।

আর বাড়ি ফিরে যাওয়ার বিপদও আছে। এখানে দিব্যি হেসেখেলে বেড়াচ্ছি, আর ওখানে বাবা রোজ পাঁচ পাতা হাতের লেখা আর দশটা অঙ্ক কষাবে।

বেশ কিছুদিন অলৌকিক কিছু চোখে পড়ল না। বুঝতে পারলাম নিজের ভয়ের বিকৃত রূপটাই দেখেছি।

সূচীপত্রে যান

মেজোমামা যে মাছের ব্যাবসা ছেড়ে দিয়েছেন তাতে দিদিমা খুব খুশি। তাঁর দুশ্চিন্তার অবসান হয়েছে। কিন্তু আমি ভাবি মেজোমামার চলবে কী করে! একদিন জিজ্ঞাসাই করে ফেললাম, 'হ্যাঁ মেজোমামা, তুমি যে মাছের ব্যাবসা ছেড়ে দিলে, কী হবে?'

মেজোমামা চুল আঁচড়াচ্ছিলেন, ফিরে বললেন, 'কেন? তোর অসুবিধাটা কী হচ্ছে?'

মুশকিলে পড়ে গেলাম। সামনে গিয়ে বললাম, 'না, অসুবিধা আর কী! আগে তুমি মাঝে মাঝে বড়ো বড়ো মাছ আনতে—'

আমাকে থামিয়ে দিয়ে মেজোমামা বললেন, 'ও, এই কথা। তোকে আজই বড়ো মাছ খাওয়াচ্ছি।' মেজমামা বেরিয়ে গেলেন। ফিরলেন, হাতে একটা প্রকাণ্ড রুই মাছ নিয়ে।

আমি তো অবাক।

'হ্যাঁ, মেজোমামা, এর মধ্যে এত বড়ো মাছ পেলে কোথায়?'

মেজোমামা হাসলেন, 'একজন জেলের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। মাছের ঝুড়ি নিয়ে হাটে যাচ্ছিল। আমার তো সবই চেনা, বলতেই দিয়ে দিল।'

দিদিমার আনন্দ আর ধরে না। বঁটি নিয়ে এসেই মাছ কুটতে বসলেন। আমি কাছে দাঁড়িয়ে রইলাম।

রোজ ছাই-রঙা একটা উটকো বিড়াল এ বাড়িতে আসত। আহারের সন্ধানে। সেদিনও সে এসে হাজির।

বঁটির পাশে আঁশের স্তূপ। বেড়ালটা এগিয়ে এসে আঁশে মুখ দিয়েই বিকট স্বরে ম্যাও করে উঠল। অস্বাভাবিক স্বর। কেউ যেন তার গলা টিপে ধরেছে।

তারপর ল্যাজটা খাড়া করে সোজা পাঁচিলের ওপর গিয়ে উঠল। দিদিমাও ব্যাপারটা লক্ষ করেছিলেন।

তিনি বললেন, 'বেড়ালটার কী হল বলতো? ওভাবে চেঁচিয়ে উঠল। গলায় কাঁটা ফুটল না কি?'

কিন্তু আমি স্পষ্ট দেখেছি বেড়ালটা একটা আঁশও মুখে তোলেনি। খাওয়া তো দূরের কথা। কেবল শুঁকেই ওইরকম চিৎকার করে উঠল। সব ব্যাপারটা কেমন যেন অদ্ভুত মনে হয়েছিল।

এমনকী, দিদিমা যখন একটা কলাপাতায় বড়ো মাছের টুকরো ভেজে আমাকে খেতে ডাকলেন তখন একটু ইতস্তত করেছিলাম।

তারপর মনে সাহস এনে মাছের টুকরো মুখে দিয়ে আশ্বস্ত হয়েছিলাম। না, কোনো গোলমেলে ব্যাপার নেই। দিব্যি সুস্বাদু মাছ।

কত অল্পেতে আমরা ভয় পেয়ে যাই। বেড়ালটার ওভাবে চিৎকার করে ওঠার হাজার কারণ থাকতে পারে।

তবে সেদিন থেকে বেড়ালটাকে আর ধারে-কাছে দেখতে পাই না। বোধ হয় অন্য বাড়িতে আস্তানা গেড়েছে।

এতদিন কথাটা দিদিমা কিংবা ছোটোমামাকে বলিনি কারণ প্রথমত, সব ব্যাপারটা নিজেই ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারিনি। হয়তো আমারই চোখের ভুল কিংবা ভয়ের ছায়াটা রূপ ধরে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল।

দ্বিতীয়ত, প্রয়োজন হলে এই অলৌকিক কাণ্ড যে কাউকে দেখাতে পারব, এমন সম্ভাবনা কম।

তা ছাড়া দিদিমাকে নিজের ছেলের সম্বন্ধে কী করে এসব কথা বলি!

তবে আমি মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলাম আর একবার বীভৎস দৃশ্য চোখে পড়লেই মামার বাড়ি থেকে পালাব। এখানে আদরযত্নের লোভে তো আর বেঘোরে প্রাণ দিতে পারি না।

বেশ কিছুদিন সব স্বাভাবিক। কোথাও কোনো গোলমাল হল না। মেজোমামা অবশ্য মাছের ব্যবসায়ে আর গেলেন না। বাড়িতেও বিশেষ থাকতেন না। কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়াতেন কে জানে!

দিদিমা জিজ্ঞাসা করলে বলতেন, 'একটা কিছু করবার চেষ্টায় আছি। কতদিন আর চুপচাপ বসে থাকব।'

সূচীপত্রে যান

তারপরই অঘটন ঘটল। মাঝরাতে বাথরুমে যাবার প্রয়োজনে বাইরে বেরিয়ে দেখি, ছোটোমামা রোয়াকের এককোণে দাঁড়িয়ে। একেবারে পাথরের মূর্তির মতন নিস্পন্দ, নিশ্চল।

আমি কাছে যেতেই আঙুল দিয়ে বাগানের দিকে দেখাল। যা দেখলাম তাতে আমার মাথা ঘুরে গেল।

একটা গাছের ডালে মেজোমামা পা ঝুলিয়ে বসে। মেজোমামা মানে মুখটা মেজোমামার কিন্তু দেহটা বিরাট! মাথাটা প্রায় গাছের মগডালে ঠেকেছে। পা দুটো মাটির অল্প ওপরে।

কী খেয়ে খেয়ে বাগানের দিকে ছুড়ে ফেলছেন। একটা ছিটকে এসে রোয়াকের ওপর পড়তে নীচু হয়ে দেখেই চমকে উঠলাম। রক্তমাখা হাড়ের টুকরো!

সমস্ত শরীর থরথর করে কেঁপে উঠল। মনে হল এখনই বুঝি অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়ব। ছোটোমামা আমার অবস্থাটা বুঝতে পেরে আমার হাতটা শক্ত করে ধরে ঘরের মধ্যে নিয়ে এসেছিল।

তারপর দিন পনেরো কী হয়েছে আমি জানি না। দারুণ জ্বরে আমি প্রায় বেহুঁশ। দিদিমা চেয়েছিলেন আমার বাবাকে খবর দিতে, কিন্তু ছোটোমামা অনেক বুঝিয়ে তাঁকে নিরস্ত করেছিল। ছোটোমামা বলেছিল, শুধু ভয় পেয়ে আমার এই জ্বর। ডাক্তারেরও তাই মত। এর মধ্যে বাবাকে টেনে নিয়ে এলে আমার ব্যাপারটা তাঁকে জানাতে হবে।

স্বাভাবিকভাবেই কথাটা বাবা বিশ্বাস করবেন, এটা আশা করা যায় না।

অথচ তার পরের দিন সকালে দিদিমার পোষা ছাগলটা নিখোঁজ, খুঁজতে খুঁজতে বাগানের মধ্যে তার ছিন্ন মুণ্ডটা পাওয়া গিয়েছিল। চারদিকে রক্তমাখা যেসব হাড়ের টুকরো পাওয়া গেল সেগুলো যে ছাগলেরই হাড় সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

কিন্তু এমন কথা কে বিশ্বাস করবে? বিশেষ করে শহরের লোক।

মেজোমামা নাকি আশ্চর্যজনকভাবে শান্ত হয়ে গিয়েছিলেন। হাঁটুর ওপর মাথাটা রেখে চুপচাপ বসে থাকতেন ঘরের মধ্যে। হাজার ডাকে সাড়া দিতেন না। খেতে ডাকলে রুক্ষকণ্ঠে উত্তর দিতেন, খিদে নেই শরীর খারাপ।

দিদিমা যে মেজোমামাকে এত ভালোবাসতেন, সেই দিদিমা ছোটোমামার কাছে সব শুনে মেজোমামার ধারে-কাছে ঘেঁষতে চাইলেন না।

আমি যখন সেরে উঠলাম, তখন ব্যাপারটা অনেক দূর এগিয়েছে।

শোবার ব্যবস্থা পালটে গেছে। একঘরে আমরা তিনজন শুতাম। একপাশে দিদিমা, অন্যপাশে ছোটোমামা, মাঝখানে আমি। সারারাত ঘরে আলো জ্বলত।

ছোটোমামা দরজার ভিতর থেকে ডবল তালা লাগিয়ে দিত। আমরা সবাই জানতাম অলৌকিক শক্তির পক্ষে এ তালা কোনো বাধাই নয়, কিন্তু তবু বারণ করতে পারিনি।

ছোটোমামা আর আমি ওই দৃশ্য দেখার পর, আমি আগে যা দেখেছি সব দিদিমা আর ছোটোমামাকে বলেছি। ছোটোমামা বলল, 'কথাটা আগেই তোমার বলা উচিত ছিল, তাহলে আরও আগে ব্যবস্থা নিতে পারতাম।' কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে তাও ছোটোমামা বলল।

বদনপুর এখান থেকে আড়াই মাইল। সেখানকার ভৈরব রোজা খুবই বিখ্যাত। তার খড়মের আওয়াজে ভূতপ্রেত থরথর করে কাঁপে।

তাকে পাওয়া খুবই মুশকিল। লোকের ডাকে প্রায়ই ভিনগাঁয়ে চলে যায় আর দক্ষিণাও এক মুঠো টাকা।

দিদিমাকে ছোটোমামা অনেক কষ্টে রাজি করাল। দিদিমা সব বুঝেও একটু ইতস্তত করলেন। হাজার হোক ছেলে তো।

ছোটোমামা বোঝাল, 'বেশ তো, ভৈরব রোজা এলেই সব বোঝা যাবে।'

খুব ভোরে ছোটোমামা বেরিয়ে পড়ল। বদনপুরে ভৈরবকে যদি না পাওয়া যায়, তাহলে অন্য গাঁ থেকে তাকে ধরে আনতে হবে।

সূচীপত্রে যান

ছোটোমামা যখন বের হল তখন মেজোমামা বাড়ি ছিলেন না। আধঘণ্টা পরে কোথা থেকে ফিরে এলেন।

চেহারা দেখে মনে হল অনেক দূর থেকে যেন ছুটতে ছুটতে আসছেন। হাঁটু পর্যন্ত কাদা, সারা দেহ ঘামে ভিজে গেছে। তাড়াতাড়ি আসতে গিয়ে ফতুয়াটা গাছের ডালে লেগে ছিঁড়ে গেছে।

দিদিমা রোয়াকে বসে তরকারি কুটছিলেন। আমি পাশে বসেছিলাম।

মেজোমামা সামনে এসে দাঁড়ালেন। ঠোঁটের দু-পাশে ফেনা। লাল চোখ পাকিয়ে দিদিমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ছোনে কোথায় গেছে?'

ছোনে ছোটোমামার ডাকনাম।

আমার বুকের দুপদাপ শব্দ আমি স্পষ্ট শুনতে পেলাম। ভয় হল অবশ হয়ে বঁটির ওপর না পড়ে যাই!

দিদিমা কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, 'নিজের কী-একটা দরকারে গেছে!'

'নিজের দরকারে না ছাই!' মেজোমামা দাঁত কিড়মিড় করে উত্তর দিলেন, 'ভাই তো নয়, শত্রুর শত্রুর, আচ্ছা ঠিক আছে।'

কথাগুলো বলেই মেজোমামা জোরে জোরে পা ফেলে বাড়ির চারপাশে ঘুরতে লাগলেন, দুটো হাত পিছনে, কেবল মাথা নাড়ছেন, থুতু ফেলছেন আর ঘুরছেন।

ব্যাপারটা দেখে দিদিমা আর সাহস পেলেন না। আমার হাত ধরে ঘরের মধ্যে ঢুকে দরজায় খিল তুলে দিলেন।

দিদিমার দিকে চেয়ে দেখি তাঁর দু-চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। তাঁর মনের কথাটা বুঝতে পারলাম।

যতক্ষণ মেজোমামা বাড়ির চারদিকে ঘুরতে লাগলেন, ততক্ষণ আমি আর দিদিমা ঘরের এককোণে চুপচাপ বসে রইলাম।

কিছুক্ষণ পর মেজোমামাকে আর দেখা গেল না। দিদিমা উঠে জানলা দিয়ে দেখে যখন নিঃসন্দেহ হলেন যে মেজোমামা ধারে-কাছে কোথাও নেই, তখন আমাকে খেতে দিলেন।

নিজে কিছু খেলেন না। ছোটোমামা এলে একসঙ্গে খাবেন।

আমি খাব কী! তখনও শরীর থরথর করে কাঁপছে। মনে হচ্ছে কিছু খেলেই বমি হয়ে যাবে। মনে মনে ঠিক করে ফেললাম, কোনোরকমে আজকের রাতটা কাটিয়ে কাল সকালেই বাড়ি রওনা হব। এখানে এভাবে ভয়ে কুঁকড়ে থাকলে শীঘ্রই শক্ত অসুখে পড়ে যাব।

ছোটোমামা ফিরল বেলা আড়াইটা নাগাদ। সাইকেল-রিকশায়। সঙ্গে ভৈরব রোজা।

আমি জানলা দিয়ে দেখতে লাগলাম।

ভৈরবের পরনে লাল টকটকে কাপড়। গায়ে কোনো জামা নেই। গলায় অনেকগুলো রুদ্রাক্ষের মালা। দু-হাতে রুদ্রাক্ষের তাগা। লাল দুটি চোখ। কপালে সিঁদুরের ফোটা। ঝাঁকড়া পাকা চুল কাঁধ পর্যন্ত এসে পড়েছে।

ভৈরব নেমে ঢুকতে গিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। বাতাসে কী যেন শুঁকল তারপর ছোটোমামার দিকে ফিরে বলল, 'কেউ গৃহবন্ধন করেছে।'

ছোটোমামা অবাক।

'গৃহবন্ধন কী?'

'কেউ মন্ত্র পড়ে গৃহবন্ধন করে দেয়, তাতে এই গৃহের মধ্যে কোনো কাজকর্ম করলে তা ফল দেয় না।'

'কে এ কাজ করবে?'

'যাকে তাড়াতে চাও সেই করবে।'

'কিন্তু তার পক্ষে তো কিছু জানা সম্ভব নয়!'

ছোটোমামার কথায় ভৈরব খুব জোরে হেসে উঠল।

'প্রেতাত্মার পক্ষে সবকিছু জানতে পারাই সম্ভব। মানুষের চেয়ে তারা অনেক বেশি শক্তির অধিকারী হয়।'

'তাহলে উপায়?'

সূচীপত্রে যান

'উপায় আছে বই কী! তুমি আগে সাইকেল-রিকশাকে বিদায় করো।'

ছোটোমামা সাইকেল-রিকশার ভাড়া মিটিয়ে দিল। ভৈরব পাশে রাখা ঝোলা থেকে একটি মাটির সরা বের করল। তার ওপর চারটে পাকা লঙ্কা, একমুঠো সরষে, কতকগুলো কুশের ডগা রাখল। তারপর রাস্তার ওপরই বসে পড়ে বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়তে লাগল।

মন্ত্র পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই লঙ্কা, সরষে আর কুশের ডকা আমাদের বাড়ির দিকে ছুড়তে লাগল।

পিছনে নিশ্বাসের শব্দ হতে ফিরে দেখলাম দিদিমা এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর চোখে তখনও জল।

আধ ঘণ্টা পরে ভৈরব উঠে দাঁড়াল। 'ঠিক আছে। এবার বাড়ির মধ্যে চলো।'

ভৈরবের কাণ্ডকারখানা দেখে ইতিমধ্যেই রাস্তার ওপর গাঁয়ের কিছু লোক জড়ো হয়েছিল। ভৈরবের পিছনে তারা বাড়ির মধ্যে এসে ঢুকল। উঠানে মাটি দিয়ে বেদি করা হল। তাতে কাঠ, শুকনো ডালপালা দিয়ে আগুন জ্বালানো হল। ভৈরব সেই অগ্নিকুণ্ড প্রদক্ষিণ করতে করতে মাঝে মাঝে কাঠি করে ঘি ছিটিয়ে দিতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠতে থাকল।

ততক্ষণে সাহস পেয়ে আমি রোয়াকে গিয়ে বসেছি। দিদিমা আমার পাশে। ছোটোমামা ভৈরবের কাছে। তার ফাইফরমাশ খাটছে।

আধ ঘণ্টা কিছু হল না। সব নিস্তব্ধ। শুধু ভৈরবের রুক্ষ গলায় মন্ত্র পাঠের শব্দ শোনা গেল। হিং টিং ছট — অদ্ভুত ভাষা।

আমি তখন ভাবতে শুরু করেছি যে সবটাই বুজরুকি, তখন হঠাৎ শোঁ শোঁ আওয়াজ। ঠিক অনেক দূর থেকে ঝড় এলে যেমন হয়।

পশ্চিমদিকের গাছপালাগুলো ভীষণভাবে দুলতে লাগল। গাছের ডালে বসা কাকের দল চিৎকার করে আকাশে পাক খেতে লাগল।

একটু পরেই গাছপালার পিছন থেকে মেজোমামা এসে হাজির। দুটি চোখ বনবন করে ঘুরছে, ফুলে উঠেছে নাকের পাটা। মুখে একটা মুরগি। বেচারি মরণযন্ত্রণায় পাখা ছটফট করছে! মেজোমামার দু-কষ বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে!

মেজোমার সেই মূর্তি দেখে আমি ভয়ে দিদিমাকে জড়িয়ে ধরলাম। দেখলাম উত্তেজনায় দিদিমাও ঠকঠক করে কাঁপছে।

মেজোমামা এসে দাঁড়াতে ভৈরবেরও চেহারা বদলে গেল। সে আরও জোরে জোরে মন্ত্র পড়তে লাগল। আগুনে মুঠো মুঠো কী ফেললে, তাতে আগুন আরও দাউদাউ করে জ্বলে উঠল।

মেজোমামা এগোতে পারল না। গাম গাছের তলা পর্যন্ত এসে দাঁড়িয়ে পড়লেন। বিশ্রীভাবে ভৈরবকে গালাগাল দিতে লাগলেন। আধ-খাওয়া মুরগিটা ছুড়ে দিল তার দিকে। মুরগিটা এসে পড়ল আগুনের মধ্যে।

'কে তুই?' ভৈরব চেঁচিয়ে উঠল।

'আমি দয়াল বাঁড়ুজ্জে!' মেজোমামা আরও চিৎকার করে বললেন।

'না, তুই দয়াল নস। ঠিক করে বল, কে তুই?'

দয়াল বাঁড়ুজ্জে মেজোমামার নাম। ডাকনাম টোনা।

'বলব না।'

মেজোমামার সে কী গর্জন! ঠোঁটের দু-পাশে ফেনা এসে জমল।

'বলবি না? আচ্ছা দেখি বলিস কিনা?' ভৈরব পাশে পড়ে থাকা ঝাঁটাটা তুলে নিয়ে ঘটের ওপর মারতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে মেজোমামা আর্তনাদ করে উঠলেন। মনে হল ঝাঁটার প্রত্যেকটা ঘা যেন তাঁর দেহেই পড়ছে।

'বলছি, বলছি, আর মারিসনি!'

মেজোমামা গাছতলায় বসে পড়লেন।

সূচীপত্রে যান

'বল।' ভৈরব ঝাঁটা আছড়ানো শব্দ করল।

'আমি মহিন্দর ডোম।'

ভৈরব দিদিমার দিকে চোখ ফেরাল, 'চেনেন মহিন্দর ডোমকে।'

দিদিমা একটু ভেবে নিয়ে বললেন, 'আমি কখনো দেখিনি। বাবার কাছে শুনেছি মহিন্দর পুজোর সময় ঢাক বাজাত। বিষয় সম্পত্তি নিয়ে শরিকদের সঙ্গে গণ্ডগোল হওয়াতে তারা পিছন দিক থেকে মাথায় লাঠি মেরে লোকটাকে শেষ করে দিয়েছে।'

মেজোমামা আর বলব না। মহিন্দরই বলি। মহিন্দর চুপচাপ সব শুনল। দিদিমার কথা শেষ হতে বলল, 'মাঠাকরুন ঠিক বলেছেন। শিবে আমার মাথায় লাঠি মেরেছিল। আমিও শোধ নিয়েছি। শিবের গুষ্টির ঘাড় মটকে পগারে ফেলে দিয়েছি। ওর বংশে বাতি দিতে আর কেউ নেই।'

'তুই দয়ালের দেহে এলি কী করে?'

'সেদিন খুব ঝড়জলের সময় দয়াল সাইকেল চেপে বট গাছের তলা দিয়ে যাচ্ছিল। ওটাই আমার আস্তানা। হঠাৎ মোটা একটা ডাল ভেঙে দয়ালের মাথার ওপর। দয়াল খতম। তার সাইকেল চিঁড়েচ্যাপটা। আমি দেখলাম এমন সুযোগ আর পাব না। অমাবস্যায় বামুনের মড়া। অনেক বছর দেহহীন হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। সুড় সুড় করে ঢুকে পড়লাম।'

'এ দেহ তোকে ছাড়তে হবে।' ভৈরব বলল।

'মাথা খারাপ! আমি ছাড়ব না!'

'তবে রে!'

আবার ঘটের ওপর ঝাঁটার আছড়ানি।

মাটির ওপর গড়াগড়ি দিয়ে মহিন্দর যন্ত্রণায় কাতরাতে লাগল।

একটু পরে বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, যাব, যাব।'

'কী করে বুঝব তুই গেছিস?'

'কী করতে হবে বল?'

ভৈরব এদিকে-ওদিকে দেখল। উঠানের একপাশে মরচে-ধরা একটা বরগা পড়েছিল। সেইদিকে আঙুল দেখিয়ে ভৈরব বলল, 'ওটা দাঁতে করে তুলে নিয়ে যেতে হবে। আর একটা কথা।'

'বল।'

'গাঁ থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে চলে যেতে হবে।'

'ঠিক আছে। কাসুন্দিপুরের শ্মশানে আস্তানা বাঁধব। এদিকে আর আসব না।'

'যা তবে।'

লোহার ভারী বরগা যেটা তুলতে অন্তত জন চারেক লোকের দরকার, সেটা মহিন্দর অবলীলাক্রমে দাঁতে করে তুলে নিল।

আবার সেই ঝোড়ো হাওয়া। গাছপালার মধ্য দিয়ে বরগা নক্ষত্রবেগে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

এদিকে নজর পড়তে দেখলাম মেজোমামার প্রাণহীন দেহটা গাব গাছের তলায় পড়ে আছে। দেহ থেকে বিশ্রী পচা গন্ধ বের হচ্ছে।

ভৈরব বলল, 'এখনই দেহটা সৎকারের ব্যবস্থা করো। অনেক দিনের বাসি মড়া।'

দুম করে একটা শব্দ। দিদিমা অজ্ঞান হয়ে রোয়াকের ওপর ঢলে পড়লেন।

এসব অনেক দিনের কথা।

দিদিমা কবে মারা গেছেন। মামারাও কেউ বেঁচে নেই। মামাতো ভাইবোনেরা কে কোথায় ছিটকে পড়েছে খবর রাখি না।

আমারও বেশ বয়স হয়েছে।

সূচীপত্রে যান

খুব ঝড় জল শুরু হলে সব ঘটনাটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে।
মাঝে মাঝে মনে হয় সত্যিই এসব অবিশ্বাস্য ব্যাপার ঘটেছিল?
কিন্তু চোখের সামনে দেখা সবকিছু অস্বীকার করি কী করে?

সূচীপত্রে যান

আরণ্যক

যুক্তির আতশ কাচ দিয়ে সবকিছুর বিশ্লেষণ সম্ভব নয়।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ যেমন আছে, তেমনি আছে অতীন্দ্রিয় জগৎ। সে জগতে সবকিছু বিচিত্র, সবকিছু যুক্তির মাধ্যমে যাচাই করা চলে না। এই অতিপ্রাকৃত জগৎকে গায়ের জোরে অস্বীকার যারা করে, তারা পৃথিবীর বারো আনা রহস্যের খোঁজ পায় না।

অনেক সময় আমরা মনকে বোঝাই এসব চোখের ভুল, মনের ভুল, যা ঘটেছে নিছক কল্পনা অথবা মনের তৈরি মায়া, কিন্তু সঙ্গোপনে নিজের মনের মুখোমুখি যখন বসি, তখন এসব অবজ্ঞা করা দুরূহ হয়ে ওঠে।

ভণিতা ছেড়ে আসল ঘটনার কথা বলি।

রায়পুর থেকে ছত্রিশ মাইল পশ্চিমে। আধা শহর, নাম খুরশীদগড়। আধা শহর বলছি এইজন্য, পাকা রাস্তা আছে, গোটা কয়েক অফিস, একটা পেট্রোল পাম্প, মোটরের কারখানা। পাকা রাস্তার পরিধি পার হলেই নিবিড় জঙ্গল। ছোটো ছোটো টিলা। কিছুটা অঞ্চল সংরক্ষিত। সরকারি বনবিভাগের।

প্রথম এসেছিলাম বছর দশেক আগে। এক টিম্বার কোম্পানির প্রতিনিধি হিসেবে।

কাজ বিশেষ কিছু নয়। জঙ্গল থেকে কাটা কাঠের হিসাব রাখতে হত। দুজন কর্মচারী, মাসান্তে তাদের মাইনে দেওয়া। অবসর সময়ে শিকার।

শিকারের হাতেখড়ি হয়েছিল উড়িষ্যার জঙ্গলে। বাবা সেখানে বনবিভাগে ছিলেন। জরিপের কাজে। তিনিই হাতে করে শিকার শিখিয়েছিলেন। প্রথমে সম্বর, অ্যান্টিলোপ, তারপর বন্য বরাহ, শেষকালে লেপার্ড।

নিজের দক্ষতার ওপর বেশ আস্থা হয়েছিল। এদিক-ওদিক থেকে শিকারের জন্য ডাকও আসত।

তারপর খুরশীদগড়ে আবার যখন এলাম, তখন আমার পদোন্নতি হয়েছে। এক বিশ্বজোড়া পেট্রোল কোম্পানির আমি ভ্রাম্যমাণ পরিদর্শক।

বড়ো শহর বদলায়। তার রাস্তাঘাট বাড়ি-বাগান কয়েক বছর অন্তর নতুন রূপে পালটায়। কিন্তু খুরশীদগড়ের মতন আধা শহর শতাব্দীর পর শতাব্দী একরকম থাকে।

পুরোনো বাসিন্দারা এসে ঘিরে ধরল। কুশল প্রশ্ন, নিমন্ত্রণের হিড়িক। অনেক রাত পর্যন্ত গল্পগুজব।

আড্ডা ভাঙবার মুখে আদিবাসীর দল এসে দাঁড়াল। খালি গা, পরনে নেংটি, চুলে পালক গোঁজা। কারও কারও হাতে টাঙ্গি আর বর্শা। এদের বাস জঙ্গলের মধ্যে ঝরনার ধারে। রাস্তা তৈরির কাজ করে। মেয়ে-পুরুষ দুজনেই।

সারা বছর এ কাজ থাকে না, বিশেষ করে বর্ষাকালে। তখন এরা জঙ্গল সাফ করে চাষবাস করে। হরিণ কিংবা পাখি শিকার করে আগুনে ঝলসে খায়।

'বাবু, তুই এসেছিস— এবার বাঁচা!'

মনে হল চেনা লোক। দশ বছর আগে আমাকে দেখেছে।

মুখ তুলে দেখলাম, ঠিক তাই। মোড়ল কথা বলছে। চুলে পাক ধরেছে, কিন্তু পেশী এখনও সতেজ। টানটান চেহারা।

'আগের বার বাঁচিয়েছিলি।'

এর আগে একবার চিতার উপদ্রব হয়েছিল। এদের ছাগল মুরগি তুলে নিয়ে যেত। একবার উঠোনে তেল মাখিয়ে একটা বাচ্ছাকে রোদে শুইয়ে রেখেছিল দিন-দুপুরে। চিতা ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে নিয়ে উধাও।

সূচীপত্রে যান

এক বুড়ো কাছে বসে পাহারা দিচ্ছিল। সে মুহূর্তের জন্য দেখল একটা হলুদ ঝিলিক উঠানের ওপর পড়েই আবার মিলিয়ে গেল।

সেইসময় এরা দল বেঁধে এসেছিল।

'বাবু, তোর বন্দুক নিয়ে একবার চল। আমাদের সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে!'

গিয়েছিলাম।

চিতা শিকার সহজ নয়। বন্দুক হাতে সবসময় সজাগ থাকতে হয়। চিতার থাবার তলায় ডানলোপিলোর প্যাডিং। পাশ দিয়ে গেলেও শব্দ পাওয়া যায় না। তা ছাড়া এরা গাছে উঠতে ও দক্ষ। যে গাছের তলায় শিকারি বন্দুক নিয়ে তৈরি হয়ে আছে, চিতা হয়তো ওত পেতে রয়েছে সেই গাছেরই ডালে। সুযোগ বুঝে শিকারির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

প্রথমত একটা 'কিল' রাখা হল।

ঝরনার ধারে একটা ঝোপের পাশে মরা মোরগ।

আমি কাছেই একটা গাছের ডালে বসে রইলাম।

একদিন, দু-দিন গেল, কিছু হল না।

অথচ ঝোপের মধ্যে চিতার ল্যাজ আছড়ানোর শব্দ কানে এল। বার দুয়েক পাতার ফাঁকে তার জ্বলন্ত দুটি চোখও দৃষ্টিগোচর হল।

কিন্তু চিতা বাইরে এল না। সম্ভবত সে বাতাসে মানুষের গন্ধ পেয়ে থাকবে। বুঝলাম, এভাবে তাকে কাবু করা যাবে না।

আদিবাসীদের বললাম, 'তোমরা এক কাজ করো, তিনদিক থেকে ঝোপটা পেটাতে শুরু করো। তাহলেই চিতা বের হয়ে পড়বে। ফাঁকা দিকে আমি তৈরি থাকব বন্দুক নিয়ে। বের হলেই গুলি চালাব।'

এতে বিপদের সম্ভাবনাও যথেষ্ট।

মরিয়া চিতা লোকেদের ঘাড়ের ওপরও ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। যার ওপর পড়বে নিস্তার নেই।

কিন্তু শিকারে কিছু বিপদের সম্ভাবনা থাকেই।

ঝোপের একটা দিকে ঝরনা।

ঝরনা এখনও অনেক নীচে। ঝুঁকে পড়লে তবে তার উচ্ছল জলস্রোত দেখা যায়। ঢালু পাড় জঙ্গলে সমাকীর্ণ।

সেদিকে বন্দুক তাগ করে আমি বসলাম।

এদিকে লোকেরা টিন আর ক্যানেস্তারা পিটতে লাগল। অত্যুৎসাহী দু-একজন কাপড়ের বলে পেট্রোল মাখিয়ে তাতে আগুন জ্বেলে ঝোপের মধ্যে ফেলতে শুরু করল।

কাজ হল। ঝোপের অন্তরাল থেকে চিতার ক্রুদ্ধ গর্জন শোনা গেল।

প্রায় ঘণ্টা কয়েক পর।

ঝোপের মধ্যে একটা তীব্র আলোড়ন। চিতাটা লাফিয়ে শূন্যে উঠল। পরিষ্কার দিনের আলো। আকাশে ছিটেফোঁটা মেঘ নেই।

হলুদ রং-এর একটা বলের আকার। চিতা নিজের শরীরটা গুটিয়ে নিয়েছে। কাচের মার্বেলের মতন জ্বলছে দুটো চোখ। বড়ো বড়ো দাঁতের ফাঁক দিয়ে লাল টকটকে জিভটা বেরিয়ে পড়েছে।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গুলি করলাম। পর পর দুটো।

প্রথমটা পিছনের পায়ের ওপর লাগল। দ্বিতীয়টা চোয়ালে। চোয়াল ভেঙে যাবার শব্দ হল। শূন্যেই ডিগবাজি দিয়ে চিতাটা নীচের ঘন জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেল। তার প্রাণে বেঁচে থাকার প্রশ্নই ওঠে না। চোয়াল গুঁড়িয়ে যেতে নিজের চোখে দেখেছি! কিন্তু আপশোশ হল, শিকার হাতের মুঠোয় এল না।

খুব অল্প সময়, তবু তার মধ্যে নজর এড়ায়নি।

সূচীপত্রে যান

চিতার একটা কান নেই। সম্ভবত বনেবাদাড়ে ঘোরার সময় কাঁটাগাছে লেগে কানটা কেটে গেছে।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য আরও বিস্ময়কর।

চিতার দেহের একপাশে কোনো দাগ নেই! ধূসর বর্ণ।

পরে দু-একজন প্রত্নতত্ত্ববিদের সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ করেছি। তারা কোনো সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেনি।

চিতাটা যে মারা গিয়েছিল, সে বিষয়ে নিশ্চিত হবার আরও একটা কারণ ছিল।

তারপর থেকে আর কোনোরকম উপদ্রব হয়নি।

দশ বছর পরে আবার সেই উপদ্রব।

'বাঁচা বাবু, বাঁচা! সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে!'

পিছনে দাঁড়ানো একজন মোড়লের কথার প্রতিবাদ করল।

'একী বাঘ যে বাবু বন্দুকে টোটা ভরে মারবে, আরে বাঘ খতম। এ তো পিরেত। বাঘের রূপ ধরে এসেছে।'

শুনলাম, কোনো মন্তব্য করলাম না।

আদিবাসীদের জগতে ভূতপ্রেতের অবাধ রাজত্ব। হঠাৎ ঝড়ে গাছ পড়ে গেল সেও অপদেবতার কাণ্ড, আবার গভীর রাত্রে শকুনিশাবকের করুণ কান্নাও প্রেতের কারসাজি।

যাহোক, ঠিক করলাম, পরের দিনই শিকারে বের হব।

মোড়লকে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলে দিলাম। চিতার গতিবিধি সম্বন্ধে বিশেষরূপে ওয়াকিবহাল হবার জন্য।

পরের দিন সকালে খাটিয়ায় বসে চা পান করছি, মোড়ল এসে দাঁড়াল।

'কী খবর বলো?'

'খবর আর কী বলব বাবু! কাল মোমিন যা বলেছে, কথাটা মিথ্যা নয়।'

'মোমিন কে? আর সে কী বলেছে?'

'মোমিন আমার ভাইয়ের ছেলে। সে যে বলেছে, চিতা নয় অপদেবতা, ঠিকই বলেছে।'

'কেন?'

'তাকে শিকার করা যায় না। মাস ছয়েক আগে বনবিভাগের এক সাহেব এসেছিল। দশদিন ধরে নাজেহাল। এই দেখল, চিতা সামনের এক গাছের আড়ালে, বন্দুক ছুড়ল, ব্যস কোথাও কিছু নেই। একটু পরেই দেখল, চিতা পিছনের পাথরের এক ঢিবির পাশে।

শেষকালে সাহেব বন্দুক কাঁধে নিয়ে ফিরে গিয়েছিল। স্বীকার করেছিল, চিতা নয়, ভৌতিক কিছু-একটা।'

হেসে বললাম, 'সাহেব শিকারে যাবার আগে ক-গ্লাস শরাব টেনে নিতেন, সে হিসাব রাখো মোড়ল? শুধু সামনে-পিছনে কেন, তেমন হলে চারপাশে চারটে চিতা দেখতে পেত।'

আমার রসিকতায় মোড়ল হাসল না।

মোড়লের কাছে শুনলাম, নদীর ওপারে বনের মধ্যে চিতার আস্তানা।

সময় সুযোগ বুঝে সে নদী সাঁতরে এপারে চলে আসে।

দুপুরে যখন এপারের মাঠে আদিবাসি ছেলেরা গোরু-ছাগল চরাতে আসে, তখন তাদের অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে চিতা ছোটো সাইজের গোরু কিংবা ছাগলের ওপর লাফিয়ে পড়ে। তারপর আধমরা শিকার পিঠে নিয়ে অক্লেশে নদী পার হয়ে নিজের আস্তানায় ফিরে যায়।

কোনো কোনোদিন এপারের জঙ্গলের মধ্যে বসেও আহার শেষ করে। একটা বেপরোয়া ভাব, অকুতোভয়, অসমসাহসিক।

পীতবর্ণের এই অগ্নিশিখা আশপাশের সকলের আতঙ্ক।

সূচীপত্রে যান

আমি বললাম, 'ঠিক আছে, আজ দুপুর বেলা গাছের ডালে বন্দুক নিয়ে অপেক্ষা করব, ঠিক গোচারণ ভূমির পাশে। হয়তো কয়েক দিন অপেক্ষা করতে হবে, কিন্তু এ ছাড়া আর পথ দেখছি না।'

খাওয়াদাওয়ার পর খাকি সার্ট আর হাফপ্যান্ট পরে তৈরি হচ্ছি, এল গোকুলপ্রসাদ।

আমি যে পেট্রোল কোম্পানির প্রতিনিধি, গোকুলপ্রসাদ সেই কোম্পানির এখানকার ডিস্ট্রিবিউটর।

আমাকে দেখে বলল, 'একী, রণসাজে কোথায়? অবশ্য কিপাং নদীর ধারে হরিয়াল আর তিতিদের ঝাঁক নামে এইসময়।'

'পাখি নয় গোকুল, চিতা-শিকারে।'

দৃশ্যত গোকুলপ্রসাদের মুখের রং বদলাল। সে গলার স্বর খাদে নামিয়ে বলল, 'জঙ্গলে যে চিতা অত্যাচার করছে, সেটা নাকি?'

'হ্যাঁ, আদিবাসির দল এসেছিল। সেই চিতার কথাই বলল।'

'সর্বনাশ, ও কাজ ভুলেও করবেন না!' গোকুলপ্রসাদের কণ্ঠে আতঙ্কের স্পর্শ।

'কেন?'

'ওটা চিতা নয়, অশরীরী কিছু।'

উচ্চহাস্য করে উঠলাম। জানতাম, গোকুলপ্রসাদ কখনো নেশা ভাং করে না। জীবনে বিড়ি-সিগারেটও খায়নি। কাজেই নেশার ঘোরে কিছু দেখবে এমন সম্ভাবনা কম।

তবে গোকুলপ্রসাদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল বছর খানেক আগে। তখনও পর্যন্ত সে অকলঙ্ক চরিত্র ছিল। বছর খানেকের মধ্যে যদি নেশার দাস হয়ে থাকে তো বলতে পারব না।

তাই প্রশ্ন করলাম, 'কী ব্যাপার বলো তো?'

গোকুলপ্রসাদ খাটিয়ার ওপর চেপে বসল।

'দিন পনেরো আগে আমি রায়পুর থেকে ফিরছিলাম চাচার বাড়ি থেকে। বের হতে দেরি হয়ে গেল। মাঝপথে সন্ধ্যা নামল। আমি গাড়ি চালিয়ে আসছিলাম। জঙ্গলের পাশের রাস্তায় এসেছি, দেখি ঝোপের ধারে একটা চিতা। বসে বসে নিজের থাবা চাটছে। মোটরের হেডলাইটে তার দুটো চোখ সবুজ মার্বেলের মতন জ্বলে উঠল।

আমি একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। সঙ্গে কোনো হাতিয়ার নেই। চিতা যদি মোটরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাহলেই বিপদ!

মাইল দুয়েক গিয়ে মোটরের গতি কমালাম। বাঁক ঘুরতেই এক দৃশ্য। ঝোপের কাছে বসে চিতাটা থাবা চাটছে।'

আমি হেসে অভয় দিলাম, 'তোমার কি ধারণা এত বড়ো জঙ্গলে চিতা মাত্র একটি-ই? আর নেই?'

গোকুলপ্রসাদ মানতে চাইল না। সে বললে, 'কিন্তু এক চিতা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই। এক সাইজ, এক বসার ভঙ্গি। পরপর চারবার এক দৃশ্য দেখলাম।'

আমি আর কিছু বললাম না।

এ দেশে সিদ্ধিপান নেশার মধ্যে পরিগণিত হয় না। খুব সম্ভব চাচার বাড়িতে গোকুলপ্রসাদ সিদ্ধির শরবত পান করে থাকবে। তারই কল্যাণে রাস্তার দু-পাশে কেবল চিতাই দেখেছে।

একটু বসে গোকুলপ্রসাদ চলে গেল। তারপরেই মোড়ল এল।

আমি তৈরিই ছিলাম, মোড়লের সঙ্গে বের হয়ে পড়লাম।

'এবার ''কিল'' কী হবে?' পথে যেতে যেতে জিজ্ঞাসা করলাম।

'একটা ছাগলের বাচ্ছা এনেছি। সেটাকে গাছের তলায় বেঁধে রাখব। তুই মাচা বেঁধে গাছের ডালে বসবি।'

এমন ব্যবস্থায় সন্দেহ প্রকাশ করলাম।

'কিন্তু চিতার পক্ষে গাছে ওঠা মোটেই অসুবিধাজনক নয়।'

সূচীপত্রে যান

মোড়ল বলল, 'সে ব্যবস্থাও করা হয়েছে। তুই গাছে উঠে গেলে জঙ্গল থেকে কাঁটাগাছ এনে তলায় রেখে দেব। কাঁটাগাছ দেখলে বাঘ সেদিকে ঘেঁষে না।'

আয়োজন অবশ্য ভালোই, কিন্তু কোনো কারণে বিপদের সম্মুখীন হলে দ্রুত গাছ থেকে অবতরণ করার পথ বন্ধ।

আমি শুধু মোড়লকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'যে গাছে মাচা বাঁধা হবে তার আশেপাশে অন্য গাছ আছে?'

মোড়ল মাথা নাড়ল, 'না।'

আমার এ প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য, চিতাটা পাশের কোনো গাছে উঠে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে কিনা?

যখন মাচার কাছে গিয়ে পৌঁছোলাম, তখন দুপুরের রোদ স্তিমিত। এমনিতেই ঘন অরণ্যের মধ্যে সূর্যালোকের প্রবেশ নিষেধ।

জনচারেক লোক অপেক্ষা করছিল। একজনের হাতে দড়িতে বাঁধা ছাগলছানা। সেটার পরিত্রাহি চিৎকারে অরণ্য মুখরিত।

আমি ভেবেছিলাম আমার সঙ্গে কেউ একজন মাচায় থাকবে, কিন্তু কার্যকালে দেখা গেল কেউ থাকতে রাজি নয়।

এমনকী মোড়লেরও বাড়িতে মেয়ের অসুখ।

তবে যাবার সময় মোড়ল আশ্বাস দিয়ে গেল, আমাকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে না। ছাগলছানার চিৎকারে আকৃষ্ট হয়ে চিতাটা শীঘ্রই দেখা দেবে।

তা ছাড়া, এই সময় বনের জন্তুরা অনেকেই নদীতে জলপান করতে আসে।

অতএব গাছে হেলান দিয়ে বন্দুক কোলে নিয়ে চুপচাপ অপেক্ষা করতে লাগলাম।

রেদের তেজ ম্লান হয়ে এল। গাছের ছায়া দীর্ঘতর।

দু-একটা মেটে রং-এর খরগোশ ইতস্তত দৌড়াদৌড়ি শুরু করল। পাখিরা কুলায়ে ফিরল। তাদের অপূর্ব কাকলিতে অরণ্যের নীরবতা খানখান হয়ে গেল।

সন্ধ্যা নামল। ঝোপে ঝোপে জোনাকির ঝাঁক। দূরে দু-একটা ময়ূরের ডাক শোনা গেল।

কিন্তু চিতাটার দেখা নেই।

আরও আশ্চর্য, ছাগলছানা নির্ভয়ে ঘুমোচ্ছে। কোনোদিক থেকে কোনো উপদ্রব হতে পারে, এমন চিন্তা তার নেই।

কাগজে-মোড়া খাবার আর ফ্লাস্ক থেকে জলপান করলাম। বুঝতে পারলাম, সারাটা রাত এইরকম ত্রিশঙ্কুর মতন কাটাতে হবে।

এই সময়ে গাছ থেকে নেমে ফেরার চেষ্টা বাতুলতা।

একটু বোধ হয় তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম, নিশাচর পাখির কর্কশ কণ্ঠস্বরে তন্দ্রা ভেঙে গেল।

ছাগলছানা তখনও অঘোরে ঘুমোচ্ছে। ঝোপের পাশে দুটি জ্বলন্ত দৃষ্টি। বুঝতে পারলাম, চিতা ঝোপের মধ্যে অপেক্ষা করছে। সুযোগ বুঝে শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

এখন আর অন্ধকার নেই। চাঁদের অমল জ্যোৎস্নায় বনভূমি যেন স্নান করে উঠেছে। আমি যেদিকে বসে আছি, সেদিকটা অন্ধকার, ঘন পাতার রাশির জন্য, কিন্তু গোচারণ ভূমি, নদীর পাড়, ছোটো ছোটো ঝোপ সব দুগ্ধধবল।

ঝোপটা নড়ে উঠল। আমি বন্দুক নিয়ে তৈরিই ছিলাম।

চিতা সন্তর্পণে ঝোপ থেকে বাইরে এসে দাঁড়াল।

চিতাটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। কোথাও একটু অন্ধকার নেই।

আমি এক ঝলক দেখেই চমকে উঠলাম।

সূচীপত্রে যান

একটা কান কাটা! শরীরের একদিকে কোনো দাগ নেই! ধূসর বর্ণ!

তার অর্থ, বছর দশেক আগে যে-চিতাকে গুলি করে হত্যা করেছিলাম, পরলোক থেকে সেই চিতা ফিরে এসে আমার সামনে দাঁড়িয়েছে।

অবশ্য মুহূর্তের জন্য এমন একটা চিন্তা আমার মনকে আচ্ছন্ন করেছিল, তারপরই মনকে বোঝাতে শুরু করলাম। যুক্তি দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে।

কাঁটা ঝোপের আঘাতে যেকোনো জন্তুরই কান কাটা যেতে পারে। এর মধ্যে আশ্চর্যজনক কিছু নেই। বিশেষ করে সিংহ, বাঘ, চিতা যারা শিকার ধরবার আগে গুড়ি মেরে চলে।

আর দেহের কিছুটা ধূসর হওয়াও বিচিত্র নয়। কে জানে, সামনে দাঁড়ানো চিতাটা দশ বছর আগে নিহত চিতার বংশোদ্ভূত কিনা।

চিতার গন্ধে ছাগলছানা জেগে উঠেছে। শুধু জেগে ওঠা নয়, বিপদের গুরত্ব বুঝতে পেরেছে।

তারস্বরে চিৎকার করছে আর রজ্জুমুক্ত হবার প্রাণপণ চেষ্টা।

আশ্চর্য, চিতার লক্ষ্য কিন্তু ছাগলছানা নয়। সে একদৃষ্টে আমার দিকে দেখছে! দুটি চোখে প্রতিহিংসা বিচ্ছুরিত।

একটু চিন্তায় পড়লাম।

কিছু বলা যায় না। যে ডালে আমি বসে আছি, সেটা এমন কিছু উঁচুতে নয়। দু-একবার চেষ্টা করলেই নাগাল পেয়ে যেতে পারে।

তারপর দুজনে জড়াজড়ি করে কাঁটার স্তূপের ওপর পড়ব।

বন্দুক ঠিক করে বসে রইলাম।

চিতা শূন্যে লাফ দিলেই ট্রিগার টিপব। দোনলা বন্দুক। প্রয়োজন হলে দ্বিতীয় গুলি ছুড়তে হবে।

'ঠিক তাই।'

চিতাটা নীচু হয়ে মাটির সঙ্গে নিজেকে প্রায় মিশিয়ে দিল। প্রবল বেগে ল্যাজটা আছড়াচ্ছে। ল্যাজের ঝাপটায় শুকনো পাতার স্তূপ ইতস্তত উড়তে লাগল। দৃষ্টি কিন্তু আমার দিকে।

কয়েক মুহূর্ত, তারপরই চিতা লাফ দিল।

সঙ্গে সঙ্গে গুলি ছুড়লাম।

ঠিক পাঁজরে গিয়ে লাগল। শূন্যেই মুখ বিকৃত করে চিতাটা পাক দিয়ে সশব্দে মাটির ওপর পড়ল। চার পা প্রসারিত করে মরণযন্ত্রণায় সমস্ত শরীরটা বার কয়েক কুঞ্চিত করল, তারপর স্থির হয়ে গেল।

এখন নামা বিপদজনক। তা ছাড়া আমার নামার উপায়ও ছিল না। তলায় কাঁটার স্তূপ।

অনেক শিকার-কাহিনিতে পড়েছি, বাঘ নিস্তেজ হয়ে পড়ে থাকে, মৃতের ভান করে। উৎফুল্ল শিকারি কাছে গেলে, তার প্রচণ্ড থাবার আঘাতে কিংবা দংশনে প্রাণ হারায়।

ঠিক করলাম, সারাটা রাত গাছের ওপরই থাকব। যা-কিছু করার, ভোরের আলো ফুটলে করাই সমীচীন হবে।

কোমরের বেল্ট খুলে নিজেকে গাছের ডালের সঙ্গে শক্ত করে বাঁধলাম নিদ্রার ঘোরে ছিটকে নীচে পড়ে যাওয়া বিচিত্র নয়।

নির্মেঘ আকাশ। সবকিছু দিনের মতন পরিষ্কার।

চিতার দিকে দেখতে দেখতে চমকে উঠলাম।

স্পষ্ট দেখেছিলাম, আমার গুলি তার পাঁজর বিদ্ধ করেছিল, কিন্তু চোয়াল থেকে রক্তের স্রোত গড়িয়ে পড়ছে।

দশ বছর আগে ঠিক যেখানে গুলি লেগেছিল।

পাঁজর আর চোয়ালের দূরত্ব অনেকটা। গুলি পিছনে চোয়ালে লাগবে তা সম্ভব নয়।

সূচীপত্রে যান

আশ্চর্য কাণ্ড। এই প্রথম শরীরে একটা শিহরণ অনুভব করলাম। অরণ্যে অন্য সব শব্দ জাদুমন্ত্রে যেন থেমে গেল। এমনকী ঝিঁঝির ডাও।

একসময়ে নিদ্রিত হয়ে পড়েছিলাম।

যখন ঘুম ভাঙল, তখন ভোর হয়ে গেছে। চারিদিকে, পাখির স্বর শোনা যাচ্ছে।

সামনের দিকে চেয়েই চমকে উঠলাম। কোথাও চিতা নেই! অথচ ছাগলছানাও উধাও!

অলৌকিক ব্যাপার। গাছ থেকে অনেক কষ্টে নেমে পড়লাম। কাঁটায় দু-এক জায়গায় ছড়ে গেল।

কাছে গিয়ে ভালো করে দেখলাম। রক্তের সামান্য দাগও নেই। ছাগলছানা যে দড়িতে বাঁধা ছিল, তাও নেই। খুঁটিটাও নিখোঁজ।

তাহলে কাল রাতে সবকিছু কি স্বপ্নে ঘটেছিল? তা কি সম্ভব?

নিজের বন্দুক পরীক্ষা করে দেখলাম। দুটো গুলিই রয়েছে। গুলি ছোড়া হয়েছিল তার কোনো প্রমাণ নেই।

একটু পরেই আদিবাসিরা এসে জড়ো হবে। কী বলব তাদের? আমার কাহিনি তাদের চিতার সম্বন্ধে অলৌকিকত্বই প্রমাণ করবে।

ছাগলছানাটাও নেই। তার অর্থ চিতা এসেছিল।

আমার পরাজয়ের কাহিনি আদিবাসিদের কাছে রটে যাওয়ার চেয়েও নিঃশব্দে আত্মগোপন করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

চলতে শুরু করলাম।

একটু চলতেই মনে হল পিছনে কে যেন আমাকে অনুসরণ করছে। পিছন ফিরে দেখেই থমকে দাঁড়ালাম। চলার শক্তি কে যেন হরণ করে নিল।

গাছের আড়ালে সেই চিতা! দুটি চোখে আগুনের ঝলক। চোয়াল আর পাঁজরে রক্তক্ষত।

আহত চিতা কি আমাকে অনুসরণ করছে?

কিন্তু বন্দুকে দুটো গুলিই যখন অটুট, তখন চিতা আহত হল কী করে?

বন্দুক তুললাম। মনে হল, ভোরের কুয়াশার মধ্যে চিতা যেন মিলিয়ে গেল।

একবার নয়, এক দৃশ্য বার বার তিনবার।

অগ্নি-ঝরা দৃষ্টি দিয়ে আমাকে জরিপ করতে করতে চিতা চলেছে।

তারপর অনেকদিন কেটে গেছে।

বয়স হয়েছে। শিকার করার শক্তি আর নেশা কোনোটাই নেই।

প্রায় অবসর জীবনযাপন করছি।

মাঝে মাঝে রায়পুর অঞ্চলের বনবিভাগের কয়েক জন দেখা করতে আসে।

সকলের মুখেই এক কাহিনি শুনি।

কাটা কান আর রক্তাক্ত দেহ নিয়ে যে চিতাকে প্রায়ই রাত্রের অন্ধকারে দেখা যায়, তাকে বধ করা কোনো শিকারির পক্ষেই সম্ভব হয়নি।

সকলেই বাধ্য হয়ে স্বীকার করেছে, ওটা সাধারণ চিতা নয়। হয়তো চিতাই নয়— চিতার প্রেতাত্মা।

আমারও তাই মত।

কিন্তু আমার যুক্তিবাদী বন্ধুরা, যাঁরা সবকিছু বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে যাচাই করে নিতে চান, তাঁদের আমি কী করে বোঝাব?

অতীন্দ্রিয় জগতের রহস্য যুক্তিনির্ভর নয়— বিশ্বাস-নির্ভর।

সূচীপত্রে যান

রাতের প্রহরী

এ কাহিনি অমিয়া মাসির কাছে শোনা।

তবে অমিয়া মাসি হলফ করে বলেছেন, এ কাহিনিতে একটুও ভেজাল নেই, প্রতিটি বর্ণ সত্য।

তাঁর জবানিতেই বলি।

জানো, শরীরটা বছর দুয়েক আগে খারাপ হয়ে পড়েছিল। যা খাই, কিছু হজম হয় না। পেটে অসহ্য ব্যথা। চোখে অন্ধকার দেখি। ডাক্তার বললেন, 'কলকাতা ছাড়তে হবে। এ শহর ব্যাধির ডিপো। এখানে থাকলে শরীর সারবে না।'

ঠিক হল কোনো স্বাস্থ্যকর জায়গায় গিয়ে মাস দুয়েক কাটিয়ে আসব।

ঘাটশিলা, মধুপুর, গিরিডি, দেওঘর কোনো জায়গাই তোমার মেসোর পছন্দ নয়। জানো তো, কী খুঁতখুঁতে মানুষ! বললেন, 'ওসব বড়ো ফাঁকা জায়গা, নিরাপদ নয়।'

ভাবতে ভাবতে ঠিক হল লখনউ। সেখানে আমার দাদাশ্বশুরের একটি বাড়ি ছিল। বহু পুরোনো বাড়ি। উনি শখ করে তৈরি করেছিলেন, যখন লখনউতে চাকরি করতেন। সে বাড়ির যে কী অবস্থা তাও জানি না।

সেখানে যাওয়া হল।

চারবাগ, আমিনাবাদ জিজ্ঞাসা করে বাড়ির পাত্তা মিলল। চক থেকে বেশ দূরে। আশপাশে মুসলমানের বস্তি। ছাগল, মুরগির পাল ঘুরছে।

একতলা বাড়ি। যতটা জরাজীর্ণ হবে ভেবেছিলাম, অবস্থা অতটা খারাপ নয়। আগেকার দিনের মজবুত মশলার গাঁথনি।

যখন বাড়ির মধ্যে ঢুকলাম তখন বিকাল। রোদ ঝলমল করছে। দুটো ঘর, বাথরুম। একফালি রান্নাঘর।

বাইরে বের হয়ে হোটেলে খাওয়া সেরে নিলাম। তারপর এদিক-ওদিক ঘুরে যখন বাড়ি ফিরলাম তখন প্রায় আটটা।

তালা খুলে ঢুকতে গিয়েই দাঁড়িয়ে পড়লাম।

'সেলাম সাহাব।'

মুখ ফিরিয়ে দেখলাম, দরজার বাইরে একজন। পরনে কালো কুর্তা আর পাজামা, মাথায় কালো টুপি বাঁকা করে বসানো।

তোমার মেসো জিজ্ঞাসা করলে, 'কৌন?'

'আপকা গোলাম হুজুর!'

বাতি জ্বেলে লোকটাকে ভিতরে ডাকা হল।

দীর্ঘ চেহারা। কোটরগত দুটি চোখ, কিন্তু নিষ্প্রভ নয়, জ্বলজ্বল করছে। মুখের কোথাও কোনো মাংস নেই। বোঝা গেল অর্ধাহারে এমন চেহারা হয়েছে।

'কী চাই?'

'আপনারা নতুন এসেছেন। কিছুদিন থাকবেন এখানে?'

'সেইরকম ইচ্ছা আছে। এ আমার দাদুর বাড়ি। বহুদিন আসা হয়নি।'

লোকটা নীচু হয়ে কুর্নিশ করল। 'নিশ্চয় থাকবেন সাহাব, আলবত থাকবেন। যে কদিন থাকবেন, গোলাম পাহারা দেবে। হাজার হোক, আপনাদের পক্ষে বিদেশ-বিভুঁই।'

সূচীপত্রে যান

ভালোই হল। একটা পাহারাদার থাকলে আমরা নিশ্চিত। বিদেশে যখন এসেছি, চুপচাপ বাড়িতে তো আর বসে থাকব না। ঘুরে ঘুরে বেড়াব।

'তোমার নাম কী?'

'বান্দার নাম আবদুল রিজভি।'

'তোমাকে কেউ চেনে এখানে?'

লোকটার দুটো চোখ দপদপ করে জ্বলে উঠল।

'দেখবেন হুজুর? এই দেখুন!'

আধময়লা কুর্তার মধ্য থেকে আবদুল প্রায় শতছিন্ন গোটা কয়েক কাগজ বার করল। কাগজগুলো হলদে হয়ে গেছে। গোটা তিনেক অভিজ্ঞানপত্র। বড়ো বড়ো লোকের লেখা। ফৈজাবাদের জমিদার, অযোধ্যার নবাবের ভাইপো, গোণ্ডার রহিম, সবাই লিখেছে, আবদুল রিজভির মতন বিশ্বাসী, কর্তব্যপরায়ণ, সৎলোক দুর্লভ।

'ঠিক আছে, তোমাকে রাখব। কত দিতে হবে বলো।'

'আমি একলা মানুষ খোদাবন্দ, যা দেবেন তাতেই রাজি!'

আবদুল রয়ে গেল। দিন তিনেক খুব ভালোভাবে কাটল। বেড়িয়ে যখনই ফিরতাম, দেখতাম, সদর দরজার পাশে আবদুল খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে। সজাগ প্রহরী। আমাদের দেখলে কপালে হাত ঠুকে সেলাম করত। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেলে শুনতে পেতাম খটখট জুতোর শব্দ। বাইরে আবদুল পাহারা দিচ্ছে।

কিন্তু তিনদিন পর রাত্রে ক্লান্ত হয়ে ঘুমোচ্ছি, হঠাৎ মনে হল আমার খাটটা যেন নড়ে উঠল। চমকে খাটের উপরে উঠে বসলাম। ভাবলাম, নির্ঘাৎ ভূমিকম্প।

বাড়িতে বিজলিবাতি ছিল না। হ্যারিকেন ব্যবহার করতাম। আলো জ্বললে তোমার মেসোর ঘুম হয় না বলে শোবার আগে হ্যারিকেন নিভিয়ে দিতাম। কিন্তু মাথার বালিশের নীচে টর্চ থাকত।

তাড়াতাড়ি টর্চ জ্বাললাম। দেখলাম, তোমার মেসোর খাট ঠিক জায়গাতেই রয়েছে! আমার খাটটা হাত দশেক সরে এসেছে!

ভূমিকম্পে তো এমন হবার কথা নয়!

গলা দিয়ে স্বর বের হচ্ছিল না। কোনোরকমে চাপা গলায় তোমার মেসোকে ডাকলাম।

বার কয়েক ডাকার পর তোমার মেসো উঠে বসল।

'কী, কী হল?'

'কী হয়েছে বলতে হল না। খাটের অবস্থান দেখে সবই বুঝতে পারল।

'ওখানে গেলে কী করে?'

'তাই তো ভাবছি। কে যেন আমার খাটটা সরিয়ে নিয়ে এল!'

তোমার মেসো ভ্রূ কুঁচকে কিছুক্ষণ ভাবল, তারপর বলল, 'বুঝতে পেরেছি। তোমার রোগ তো একটা নয়! ঘুমিয়ে কথা বলো, ঘুমাতে ঘুমাতে শিবপুরের বাড়িতে একবার বারান্দা পর্যন্ত হেঁটে চলে গিয়েছিলে, মনে আছে? সেইরকম খাটটা ধরেই হয়তো হাঁটতে শুরু করেছ। দাঁড়াও, খাটটা ঠিক জায়গায় সরিয়ে দিই।'

তোমার মেসো খাট থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গেই আশ্চর্য কাণ্ড ঘটল।

আমি আমার খাটের ওপর বসে। সরসর করে খাটটা সরে পুরোনো জায়গায় চলে গেল! ভয়ে হাত কেঁপে টর্চটা নিভে গিয়েছিল। অন্ধকারে শুধু আমার আর্তকণ্ঠ শোনা গেল।

তোমার মেসো উঠে হ্যারিকেন জ্বালাল। তারপর সারাটা রাত দুজনে চুপচাপ বসে।

একবার তোমার মেসো দরজা খুলে বাইরে গিয়ে ডাকল, 'আবদুল!'

'হুজুর!'

উত্তরের সঙ্গে সঙ্গে আবদুল এসে সামনে দাঁড়িয়েছিল।

সূচীপত্রে যান

'ফরমাইয়ে সাহাব!'

কিন্তু ব্যাপারটা এমন অলৌকিক, অবিশ্বাস্য যে কাউকে বলাও যায় না। যাকে বলব সেই ভাববে আমাদের মাথায় দোষ আছে। তাই চুপচাপ রইলাম।

আমাদের দুজনের কেউই ভূতে বিশ্বাস করতাম না। চিরকাল দুজনে শহরে মানুষ। ভূতের কথা গল্পে পড়েছি, কিন্তু এমন অভিজ্ঞতা কখনো হয়নি।

রাতের ব্যাপারটা আমাদের দুজনকেই রীতিমতো ভাবিয়ে তুলল।

তোমার মেসোর প্রথমে ধারণা হয়েছিল খাটটা আমিই সরিয়েছি, কিন্তু চোখের সামনে খাটটা আবার সরে আসতে দেখে কিছু বুঝে উঠতে পারছিল না।

দিন পনেরো নির্বিবাদে কাটল। কোনো উপদ্রব নেই। একসময় আমার নিজেরই মনে হল, সব ব্যাপাটাই হয়তো মনের ভুল!

সিনেমা দেখে ফিরতে সেদিন একটু রাত হয়েছিল। খাওয়াদাওয়া সেরে শুতে প্রায় বারোটা হল।

শীত পড়তে শুরু হয়েছে। লখনউতে শীতের প্রকোপ একটু বেশি। সব জানলাগুলো সন্ধ্যারাত থেকেই বন্ধ করে দিয়েছিলাম।

হঠাৎ মাঝরাতে খটখট করে সব জানলাগুলো খুলে গেল! কনকনে ঠান্ডা হাওয়ার ঝলক হাড় পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিল। বন্ধ করার দোষ হলে একটা জানলা খুলে যাওয়া সম্ভব, কিন্তু এভাবে একসঙ্গে শোবার ঘরের চারটে জানলা খুলে যায় কী করে!

তোমার মেসো খাটের ওপর উঠে বসল। উঠেই আমাকে ধমক, 'জানলাগুলোও কী ভালো করে বন্ধ করতে পারো না? মাঝরাতে আচ্ছা ঝামেলা!'

তোমার মেসো উঠে সব জানলাগুলো টেনে বন্ধ করে দিল।

মিনিট পাঁচেক।

তোমার মেসো এসে খাটে শোয়ামাত্র আবার খটখট করে জানলাগুলো খুলে গেল।

বার তিনেক এরকম হবার পর দুজনেই একটু ভয় পেয়ে গেলাম। দরকার নেই বাপু শরীর সারিয়ে, এই ভূতুড়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়াই ভালো।

কথাটা হঠাৎ আমার মনে হতে বললাম, 'আবদুলকে একবার ডাকলে হয় না!'

'আবদুল! আবদুল কী করবে?'

'আমরা যখন ঠিকমতো জানলাগুলো বন্ধ করতে পারছি না, তখন ওকে দিয়ে একবার চেষ্টা করো।'

কথাটা বোধ হয় তোমার মেসোর মনে লাগল। দরজাটা খুলে ডাকল, 'আবদুল!'

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এল, 'হুজুর!'

আশ্চর্য মনে হয়! আবদুল মানুষ না যন্ত্র!

আবদুল দরজায় এসে দাঁড়াল।

'জানলাগুলো কিছুতেই বন্ধ করতে পারছি না। একবার দেখো তো!'

আমি টর্চটা জ্বালিয়ে আবদুলের মুখের ওপর রেখেছিলাম। মনে হল, আবদুলের দুটো চোখ জ্বলে উঠল।

'জি হুজুর!'

আবদুল একটা একটা করে জানলাগুলো বন্ধ করে দিল। তারপর আবদুল আর এক মিনিট দাঁড়াল না, সেলাম করে বাইরে চলে গেল।

দরজা বন্ধ করে আমরা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। না, জানলাগুলো আর খুলে গেল না।

তার মানে আমরা বোধ হয় জানলাগুলো ঠিকমতো বন্ধ করতে পারছিলাম না।

রাত্রে আর কোনো অসুবিধা হল না।

সত্যি, কত মিথ্যা কারণে আমরা ভয় পাই। কত অল্পে।

সূচীপত্রে যান

পরের দিন দুপুর বেলা আবদুলকে দেখলাম। সাধারণত দিনের বেলা সে নিজের ডেরায় চলে যায়। পাহারা দিতে আসে সন্ধ্যা বেলা। কিন্তু সেদিন দুপুরে বের হবার মুখে দেখলাম, আবদুল চারদিক ঘুরছে।

তোমার মেসো পোস্টাফিসে গিয়েছিল খাম, পোস্টকার্ড কিনতে। আশপাশে এমন কেউ নেই, যাদের সঙ্গে আলাপ করতে পারি। চারদিকে বস্তি।

'কী খুঁজছ আবদুল?'

আবদুল যেন একটু চমকে উঠল।

আমার দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ দেখে বলল, 'একটা চিজ খুঁজছি মেমসাহেব। অনেক দিন আগে হারিয়েছিলাম, কিন্তু কোথায় হারিয়েছিলাম ঠিক মনে পড়ছে না।'

উত্তর দিয়েই আবদুল আর দাঁড়াল না। আস্তে আস্তে বস্তির দিকে এগিয়ে গেল।

ইচ্ছা ছিল, আবদুলকে তার পুরোনো সংসার, তার পরিবারের লোকজন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করব, কিন্তু সুযোগ পেলাম না।

কী খুঁজছে আবদুল ঠিকভাবে সে কথাও বলল না। কেমন একটা দুর্বোধ্য উত্তর দিয়ে গেল।

জানলাগুলো ভালোভাবে দিনের আলোয় পরীক্ষা করে দেখলাম। কলকবজার বিশেষ কোনো কারসাজি নেই। অথচ রাত্রে কেন বন্ধ করতে পারলাম না।

দিনের বেলা কোনো গোলমাল নেই, কিন্তু রাত হলেই যেন গা ছমছম করে। মনে হয়, আমি আর তোমার মেসো ছাড়া তৃতীয় আর এক সত্তার যেন আবির্ভাব হয়। তাকে চোখে দেখা যায় না, কিন্তু তার কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে সে নিজেকে ধরা দেয়।

এই খাট সরানো, জানলাগুলো আচমকা যাওয়া, এসব কিন্তু মোটেই স্বাভাবিক বলে মনে হয় না।

তোমার মেসো ফিরে আসতে আবদুলের জিনিস খোঁজার কথাটা বললাম, কিন্তু কথাটার ওপর সে একেবারেই গুরুত্ব আরোপ করল না। বলল, 'ওসব নিয়ে মাথা ঘামাবার কোনো মানে হয় না। হয়তো পকেট থেকে কিছু পড়ে গেছে, তাই খুঁজছিল।'

আমি কিন্তু মনের কথাটা বলেই ফেললাম, 'জানো, আর এখানে ভালো লাগছে না!'

'কেন, তোমার শরীরের তো উন্নতিই হয়েছে। পেটের ব্যথাটা আর নেই। খিদেও হচ্ছে।'

আমি একটু চুপ করে থেকে বললাম, 'এ বাড়িটা আমার ভালো লাগছে না!'

'কেন, বাড়ির কী দোষ হল?'

'কী দোষ তো তুমি জানো।'

'ওসব তোমার মনের ভুল। আমি ওসব মোটেই ভাবছি না।'

কিন্তু কয়েক দিন পরেই ভাববার যথেষ্ট কারণ ঘটল। তোমার মেসো আর আমার দুজনেরই।

সেদিন বিকাল থেকেই বৃষ্টি আরম্ভ হল। অসময়ের বৃষ্টি। বুঝতে পারলাম, এই বৃষ্টির পরেই শীতের প্রচণ্ডতা বাড়বে। দুটো বিলিতি কম্বল ছিল। তাতে সে শীত আটকাবে না।

মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেল। মনে হল ঘরের মধ্যে খুটখাট শব্দ। কে যেন বুট পরে পায়চারি করছে। একদিক থেকে আর একদিক।

উঠে বসলাম। তোমার মেসে ঘুমে অচেতন।

টর্চ জ্বালিয়ে ঘরের এদিক-ওদিক ফেললাম। কেউ কোথাও নেই। অথচ খুটখাট শব্দ সমানে শোনা গেল।

ইঁদুরের উৎপাত কিনা কে জানে! আমাদের গড়পারের বাড়িতে বিরাট সাইজের সব ইঁদুর ঘুরে বেড়াত। সাইজে বিড়ালের চেয়েও বড়ো! বাথরুমে যাওয়া দরকার। সাহস করে উঠলাম। বাথরুমের দরজা খুলে টর্চ জ্বেলে আগে এধার-ওধার দেখে নিলাম। কোণের দিকে আলো পড়তেই চিৎকার করে উঠলাম।

একেবারে দেয়াল ঘেঁষে একটি নরকঙ্কাল! বললে বিশ্বাস করবে না, জীবন্ত নরকঙ্কাল! দুটো হাত প্রসারিত করে আমাকে ডাকছে। শুধু ডাকা নয়, খল খল করে হাসি। অদ্ভুত মারাত্মক হাসি। তার শব্দে শরীরের সমস্ত

সূচীপত্রে যান

রক্ত পলকে যেন জমাট বেঁধে যায়!

আর আমার জ্ঞান ছিল না। বাথরুমের দরজার কাছে মূর্ছিত হয়ে পড়েছিলাম। যখন জ্ঞান হল দেখলাম, খাটের ওপর শুয়ে আছি। সকাল হয়েছে। তোমার মেসো উদবিগ্ন মুখে পাশে বসে।

একটু পরেই মেসো বলল, 'কী হয়েছিল?'

কী হয়েছিল বললাম।

মেসো বলল, 'কী আশ্চর্য, কাল রাত থেকে কতবার যে আবদুলকে ডেকেছি, ডাক্তারের কাছে পাঠাব বলে, কিন্তু সে নিখোঁজ! পাশের বস্তির এক ছোকরাকে ডাক্তার আনতে পাঠিয়েছি।'

একটু পরেই বাইরে মোটরের শব্দ হল। বৃদ্ধ বাঙালি ডাক্তার ঘরে ঢুকলেন।

সব শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'আমরা আপনার দাদুকে এই জমিতে বাড়ি করতে অনেক বারণ করেছিলাম। তিনি শোনেননি।'

'কেন, এ জমিতে কী আছে?'

'একটা কবর ছিল। কবরের ওপর কেউ বাড়ি করে না। আপনার দাদুও এ বাড়িতে বেশিদিন টিকতে পারেননি!'

'আরও একটা কথা, আবদুল বলে একটা লোক পাহারা দিত, তাকেও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।'

'আবদুল? পুরো নাম কী?'

'আবদুল রিজভি।'

ডাক্তার নাম শুনে চমকে উঠলেন। সে কী! এখানে আবদুল রিজভিরই তো কবর ছিল! সে মারা গেছে আজ আশি বছরের ওপর।

কিন্তু সে যে অনেকগুলো সার্টিফিকেট দেখাল।

পরের দিনই আমরা কলকাতা ফিরে এসেছিলাম।

এখনও মাঝে মাঝে ভাবি। দুটো প্রশ্নের উত্তর পাই না। ঘুরে ঘুরে কী খুঁজছিল আবদুল রিজভি? নিজের কবর? আর সে রাতে ওভাবে বাথরুমে কঙ্কাল-মূর্তি কেন দেখাল? আমাদের তাড়াবার জন্যই কি?

সূচীপত্রে যান

অবাস্তব

আমি তখন বি. এ. পড়ি। পরীক্ষা সামনে। বাড়ি থেকে বের হওয়া প্রায় বন্ধ। সারাদিন বাড়িতে বসে পড়াশুনো করছি। মাঝে মাঝে শুধু বিশ্রামের জন্য বারান্দায় এসে দাঁড়াচ্ছি।

গত দু-বছর থিয়েটার, সিনেমা, জলসায় যে সময় নষ্ট করেছি তার খেসারত।

বিকালে বসে বসে অর্থনীতির পাতা ওলটাচ্ছি, দুম করে পাখা বন্ধ হয়ে গেল। আলোর সুইচ টিপে দেখলাম আলোও বন্ধ।

আমাদের ছাত্রাবস্থায় 'লোডশেডিং'-এর ব্যাপার অজানা ছিল। বারান্দায় বেরিয়ে এপাশে-ওপাশে খোঁজ করে জানলাম এ এলাকার সব বাড়ির এক অবস্থা। বাতিও জ্বলছে না। পাখাও চলছে না।

কোথাও একটা বড়ো রকমের গোলমাল হয়েছে।

গুমোট গরম। বাড়িতে থাকা দুষ্কর। হ্যারিকেন কিংবা মোমবাতি জ্বেলে হাতপাখা নেড়ে নেড়ে পড়বার চেষ্টা করা যেতে পারে, কিন্তু এত মেহনতের পর মগজে কিছু ঢুকবে, এমন আশা দুরাশা।

তাই সে চেষ্টা না-করে বাড়ি থেকে বের হয়ে পড়লাম।

আমাদের পাড়ায় দেখলাম বেশিরভাগ লোক দাওয়ায় হাতপাখা চালাচ্ছে। গাড়ি ঘোড়ার জন্য পথ চলাই দুষ্কর।

রাস্তার এক পাশ দিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করলাম।

চৌরাস্তায় এসে দেখলাম, রাস্তার ওপরের বাড়িগুলোর আলো জ্বলছে পাখাও নিশ্চয় চলছে।

ভাবলাম একটা কাজ করি, একটু দূরে যে পার্ক আছে, সেখানে গিয়ে বসি। তারপর বাতি জ্বললে ফিরে আসব।

পার্কে গিয়ে বসলাম। দিব্যি ফুরফুরে বাতাস বইছে। কাছাকাছি ফুটপাতে কেউ ফুলের পশরা নিয়ে বসেছে। মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসছে।

পার্কে ঘাস দেখার জো নেই এমনই অবস্থা! অনেকেই শুয়ে পড়েছে। অনেকে আধশোয়া হয়ে রাগিনী ভাঁজছে। কেউ কেউ দল নিয়ে চক্রাকারে বসে গল্পগুজবে মত্ত।

উঠতে ইচ্ছা করল না।

পরীক্ষার দিন সাতেক বাকি। মোটামুটি তৈরি হয়েছে। অর্থনীতির কয়েকটা অধ্যায়ের ওপর চোখ বুলিয়ে নিতে হবে।

ওখানে বসে বসে অর্থনীতির সূত্রগুলো মনে মনে আওড়াতে লাগলাম।

আমি আলোর কাছেই বসেছিলাম। পার্কের মাঝে মাঝে দীপদণ্ড। কোথাও অন্ধকার নেই।

'আরে অজয়, এখানে বসে আছিস। তোকে আমি চারদিক খুঁজে বেড়াচ্ছি।'

মুখ ফিরিয়ে দেখলাম, আমার সহপাঠী প্রিয়নাথ।

প্রিয়নাথ খুব নিম্নবিত্ত ঘরের ছেলে। অল্প বয়সে মা-বাবাকে হারিয়েছে, মামার বাড়িতে মানুষ। সেখানে বেশ অনাদরে প্রতিপালিত। টিউশনির পর টিউশনি করে কলেজের খরচ চালিয়েছে।

ছাত্র হিসেবে প্রিয়নাথ যথেষ্ট মেধাবী। আমার সবচেয়ে অন্তরঙ্গ।

প্রিয়নাথকে আমারও প্রয়োজন ছিল।

অনেকগুলো পাঠ্যবিষয়ে দুজনে মিলে আলোচনা করে পড়লে অনেক সুবিধা হয়। তাই বললাম, 'আয় আয় বস। তোর সঙ্গে আমারও কিছু দরকার আছে।'

সূচীপত্রে যান

প্রিয়নাথ বসল। আমার মুখোমুখি।

তার চেহারা দেখে আমি চমকে উঠলাম।

উশকোখুশকো চুল, কোটরগত চোখ, শীর্ণ চোয়াল! পরনের সার্ট আর ধুতিও কর্দমাক্ত।

'একী জামাকাপড়ে কাদা লাগল কী করে?'

প্রিয়নাথ কিছুক্ষণ উদাস দৃষ্টিতে আমার দিকে দেখল, তারপর ক্লান্ত কণ্ঠে বলল, 'অনেকটা জলা ভেঙে আসতে হয়েছে তাই।'

'জলা? জলায় কেন? এখানে জলা পেলি কোথায়?'

'শহরের বাইরে গিয়েছিলাম। একটা কাজ ছিল।'

'কাজ? পরীক্ষার সময়?'

'হ্যাঁ ভাই, উপায় ছিল না, কিন্তু গিয়ে বিপদে পড়েছিলাম।'

'কী বিপদ?'

কিছুক্ষণ প্রিয়নাথ চুপ করে রইল, তারপর মৃদুকণ্ঠে বলল, 'তারক মাস্টারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।'

'তারক মাস্টার! তারক মাস্টার কে?'

'তারক মাস্টার আমাদের স্কুলে অঙ্ক করাতেন।'

'এতে আর বিপদ কী?'

'বিপদ মানে, তারক মাস্টার মারা গেছেন আজ পাঁচ বছর।'

'সেকী!'

'হ্যাঁ তাই। আমি নিজে তাঁর মৃতদেহ পুড়িয়ে এসেছি।'

'ঠিক দেখেছিস তো?'

'ঠিক দেখেছি। পাশাপাশি দুজনে মাইল দুয়েক একসঙ্গে হেঁটে এলাম, তারক মাস্টারই তো আমাকে জলার মধ্যে দিয়ে নিয়ে এলেন। বললেন, কম সময় লাগবে।'

'কী কথা হল?'

'অনেক এলোমেলো কথা। আমি জিজ্ঞাসা করে ফেললাম এক সময়ে, ''স্যার আপনি তো মারা গেছেন। লোচনপুরের শ্মশানে—''

আমাকে কথা শেষ করতে না-দিয়ে তারক মাস্টার বীভৎসভাবে হেসে উঠলেন।

বললেন, ''আমি বেঁচে আছি তোকে কে বললে?''

তারপর তারক মাস্টার হারিয়ে গেলেন।'

'হারিয়ে গেলেন?'

'হ্যাঁ ভাই। কথা বলতে বলতে পাশ কাটিয়ে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। অনেক ডাকলাম কোনো উত্তর নেই। তারপর আমি স্টেশনে চলে এলাম। ট্রেনের ঘণ্টা পড়তে দেরি হল। বেঞ্চের উপর বসলাম।। হঠাৎ কাঁধে একটা স্পর্শ। ফিরে দেখি সুবীর। মনে আছে, আমাদের সঙ্গে আই এ পড়ত।'

আমি বললাম, 'কিন্তু সুবীর তো—'

বাধা দিয়ে প্রিয়নাথ বলল, 'জানি সে টাইফয়েডে মারা গিয়েছিল।'

'আমরা কলেজে শোক সভা করেছিলাম। সে এসে হাজির। মনে আছে, কলেজে সে বেশিরভাগ দিনই ক্রিম রঙের একটা পাঞ্জাবি পরে আসত। চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। সুবীর আমাকে একটু ঠেলে বেঞ্চে বসল। পাশে।

তারপর বলল, ''কিরে এই অজ পাড়াগাঁয়ে এসেছিলি কেন? এখানে তোর কীসের কাজ?''

বললাম, ''আমার একটা জমির ব্যাপারে এসেছিলাম, কিন্তু তুই এখানে?''

সুবীর হাসল, ''আমার কথা ছেড়ে দে। কাজ নেই, কর্ম নেই, ঘুরে বেড়াচ্ছি।''

সূচীপত্রে যান

যেখানে সুনিশ্চিত জানি লোকটা বেঁচে নেই। কলেজ পত্রিকায় তার সম্বন্ধে আমি লিখেওছি, সে রক্তমাংসের শরীরে একেবারে পাশে বসে। গায়ে গা লাগিয়ে। তার সঙ্গে কী কথা বলব!

ইচ্ছা করেই বললাম। সুবীর কী উত্তর দেয় জানবার জন্য।

"আর কলেজ যাস না কেন?"

মাথা নেড়ে বলল, "উপায় নেই ভাই। বদ্ধঘরে আমার দম আটকে আসে। আমি একটু খোলামেলার পক্ষপাতী। তা ছাড়া কলেজে পড়ে কী হয় বল? রক্ত জল করে খেটে খুটে গ্রাজুয়েট না হয় হলাম তারপর? সেই তো দরখাস্ত হাতে নিয়ে দরজায় দরজায় মাথা ঠোকা। ভগবান জানেন ক-টা জুতো ছিঁড়লে তবে চাকরির সুরাহা হবে। আদৌ হবে কি না কে জানে!"

আমি যখন তাকে জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলাম সে মরার পরেও এভাবে দেখা দিল কী করে, ঠিক তখনই সুবীর উঠে দাঁড়াল।

বলল, "তুই বস, আমি একটু ঘুরে আসি। এখনও ট্রেন আসার ঘণ্টা খানেক দেরি।"

সুবীর উঠে দাঁড়াল। হাঁটতে হাঁটতে প্ল্যাটফর্মের একেবারে শেষে। দেখলাম, নেমে রেললাইনের পাশ দিয়ে ডিস্ট্যান্ট সিগন্যালের দিকে চলে গেল। আর তাকে দেখা গেল না।

বসে বসে সমস্ত ব্যাপারটা ভাবতে লাগলাম।

মনে হল, সবই আমার মনের কল্পনা। অবচেতন মনে হয়তো সুবীরের কথা চিন্তা করছিলাম। আমার কল্পনাই রূপ ধরে এসেছিল।

তারক মাস্টারের ব্যাপারটাও তাই।

গাঁয়ের পথ দিয়ে একলা হাঁটতে হাঁটতে স্বাভাবিকভাবেই তারক মাস্টারের কথা মনে এসেছিল। যখন এখানকার স্কুলে পড়তাম, তখন ঠিক এভাবে তারক মাস্টারের পাশাপাশি অনেক দিন গল্প করতে করতে হেঁটেছি।

সবকিছু মন থেকে ঝেড়ে ফেললাম।

উঠে টিকিটঘরের কাছে গেলাম ঘর বন্ধ। ট্রেন আসবার আধ ঘণ্টা আগে খুলবে।

ভাবলাম, কাছের চায়ের দোকানে এক কাপ চা খেয়ে আসি।

রীতিমতো তেষ্টা পেয়েছে।

অভ্যাসমতো দোকানে ঢোকবার আগে পকেটে হাত দিলাম।

সর্বনাশ পকেট খালি! অথচ আমার বেশ মনে আছে, বাড়ি থেকে বের হবার সময় মানিব্যাগ পকেটে নিয়েছিলাম।

নিশ্চয় রাস্তায় কোথায় পড়ে গেছে। সম্ভবত জলা পার হবার সময়। অবশ্য ব্যাগে বেশি টাকা ছিল না। বেশি টাকা পাবোই বা কোথায়? বোধ হয় টাকা পাঁচেক আর কিছু খুচরো ছিল।

চা না হয় না খেলাম, কিন্তু ট্রেনের টিকিট কিনব কী করে?

বিনা টিকিটে উঠলে চেকার যদি ধরে তাহলে জরিমানাও দিতে পারব না। সোজা হাজতে টেনে নিয়ে যাবে।

এখন উপায়!

এই নির্বান্ধব জায়গায় এমন কেউ নেই যে আমাকে পয়সা নিয়ে সাহায্য করবে? এখানে পড়ে থাকতেও পারব না।

চিন্তিত হয়ে পায়চারি আরম্ভ করলাম।

কিছু সময় কাটল। সিগন্যালের পাখা নীচু হল।

ট্রেনের অস্পষ্ট কাঠামো দেখা গেল।

এক জায়গায় দাঁড়ালাম।

সূচীপত্রে যান

সগর্জনে ট্রেন এসে থামল।

দারুণ ভিড়। পাদানিতে পর্যন্ত লোক ঝুলছে। ওদিকে কোথায় বুঝি মেলা চলছে। সেই মেলা ফেরত ভিড়।

ভাবলাম, ভালোই হল কোনোরকমে ঠেলাঠেলি করে যদি ট্রেনের মধ্যে একটু জায়গা করে নিতে পারি তাহলে টিকিট কাটতে হবে না।

এমন ভিড় ঠেলে চেকার আসবে এমন সম্ভাবনা কম।

গায়ের জোরে ঠেলেঠুলে উঠলাম। কিছু লোক গালাগাল দিল, কিছু লোক ঠেলে নামিয়ে দেবার চেষ্টাও করল। পারল না।

এককোণে গিয়ে দাঁড়ালাম।

একেই বলে অদৃষ্ট!

বোধ হয় গোটা দুয়েক স্টেশন পার হয়েছি, এমন সময়ে কাঁধে চাপ।

"টিকিটটা দেখাবেন।"

আড়চোখে দেখলাম, কালো কোট, সাদা প্যান্ট। হাতে টিকিট পাঞ্চ করার মেশিন।

"দেখি টিকিট।"

করিতকর্ম লোক। ভিড় ঠেলে ঠিক এসে দাঁড়িয়েছে।

আর দাঁড়িয়েছে একেবারে মোক্ষম জায়গায়।

নিরুপায়। ফিরতেই হল।

একনজর আমাকে দেখেই চেকার বলল, "আরে কে দুলু না?"

দুলু আমার ডাক নাম, কিন্তু চেকার ও নাম জানল কী করে?

"কি রে, চিনতে পারছিস না?"

চেকার মাথা থেকে টুপিটা খুলে ফেলতেই চিনতে পারলাম।

মেসোমশাই। হরিপ্রসন্নবাবু। রেলে চাকরি করতেন জানতাম, কিন্তু ঠিক কী চাকরি জানা ছিল না।

বললাম, "মেসোমশাই!"

প্রণাম করার চেষ্টা করেও পারলাম না। ভিড়ের জন্য সম্ভব হল না।

মেসো হাত তুলে বললেন, "থাক, থাক। এদিকে কোথায় এসেছিলি?"

কোথায় এসেছিলাম বললাম।

সঙ্গে সঙ্গে ভগবানকে ধন্যবাদ দিলাম। যাক, টিকিটের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। মেসো যখন রয়েছেন, তখন হাওড়া পর্যন্ত নির্ঝঞ্ঝাট যাওয়া যাবে।

কথাটার পাশাপাশি আর একটা কথা মনে পড়ে গেল।

হরিপ্রসন্নবাবুর তো এভাবে থাকবার কথা নয়। বছর চারেক আগে মামার বাড়িতে কান্নার রোল উঠেছিল। খবর এসেছিল, এই মেসো কলেরায় মারা গেছেন। গোরখপুর না কোথায় কাজ করতেন। শ্রাদ্ধের কার্ডও দেখেছিলাম। মামা কাজের দিন গিয়েছিলেন।

হরিপ্রসন্নবাবু লোকটি অমায়িক। যখনই মামার বাড়ি আসতেন আমাদের নিয়ে হইহই করতেন। জাদুঘর, চিড়িয়াখানা, গঙ্গার ওপর নৌকায় বেড়ানো।

মামা বলতেন, "ওঁর আর কী! প্রচুর কাঁচা পয়সা রোজগার। খরচ করতে পারে।"

কাঁচা পয়সা বলতে কী বোঝায় তখন জানতাম না।

কিন্তু এই কামরা ভরতি লোকের মধ্যে কী করে আমি জিজ্ঞাসা করি, মেসোমশাই, আপনি তো মারা গেছেন! আপনি আবার রেলের ধড়াচুড়ো করে টিকিট চেক করছেন কী করে?

চুপ করে বসে রইলাম।

বসে বসে বরাতের কথা ভাবলাম।

সূচীপত্রে যান

আজ সারাটা দিন একজনের পর একজন কেবল মৃত লোকদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। ব্যাপারটা কী?

নিজেকে সজোরে চিমটি কাটলাম। না, বেশ লাগছে।

তাহলে তো জেগেই রয়েছি। স্বপ্নের ঘোর নয়।

অথচ চোখের সামনে মেসোমশাই দাঁড়িয়ে। এক মুখ হাসি। গোঁফের ঝোড়া। মসৃণ টাক।

''তারপর কী করছিস এখন?''

বললাম, ''সামনে বি. এ. পরীক্ষা।''

''পরীক্ষা কি আর দিতে পারবি?''

''কেন?''

''কলকাতায় গোলমাল তো লেগেই আছে। প্রত্যেক বছর পরীক্ষার সময় ঝঞ্ঝাট।''

কী বলব, চুপ করে রইলাম।

আমি একবার ওদিকটা দেখে আসি।

চেকার মেসোমশাই ভিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

ভাগ্য ভালো। হাওড়া পর্যন্ত কিছু হল না। আর কোনো চেকার উঠল না ট্রেনে। ভিড়ের সঙ্গে গেটও পার হয়ে এলাম।'

এবার কিন্তু আমি প্রিয়নাথকে সন্দেহ করতে শুরু করেছি। যে সব কথা বলছে, সে কথা সুস্থ মস্তিষ্কের কথা নয়। বেশি পড়ে পড়ে ছেলেটার মাথা খারাপ হল নাকি!

আমি কিছু বলাবার আগেই প্রিয়নাথ উঠে দাঁড়াল।

'চলি রে, একটা কাজ মনে পড়ে গেল। আবার দেখা হবে।'

দ্রুত পদক্ষেপে প্রিয়নাথ পার্কের বাইরে চলে গেল।

একটু পরে আমিও উঠে দাঁড়ালাম।

এতক্ষণ বোধ হয় লাইন ঠিক হয়ে গেছে। পাখা আলো চালু হয়েছে। গিয়ে পড়াশুনো আরম্ভ করতে হবে।

চলতে চলতেই ভাবলাম, একবার প্রিয়নাথের খোঁজ নেওয়া দরকার।

প্রিয়নাথের মামার বাড়ি আমাদের বাড়ি থেকে খুব দূরে নয়। আর দূরে হলেও, বন্ধুর খবর নেওয়া খুবই দরকার। যেভাবে সে অবোলতাবোল কথা বলে গেল, তাতে রীতিমতো সন্দেহ হয়। নিশ্চয় মাথায় একটু গোলমাল হয়েছে।

প্রিয়নাথের বাড়ির দিকে পা চালালাম। সামনে গিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। বেশ কিছু লোকের ভিড়।

একজনকে জিজ্ঞাসা করতে বলল, 'বডি আনা হয়েছে।'

'বডি? কার বডি?'

ভিড়ের পাশ কাটিয়ে ভিতরে গিয়ে ঢুকলাম। উঠানেই শোয়ানো রয়েছে। গলা পর্যন্ত চাদর ঢাকা। মুখ খোলা, সারা মুখে যন্ত্রণার চিহ্ন।

পাশে মাথায় হাতে দিয়ে মামা বসে। একটু দূরে মামী আর বাড়ির অন্য মেয়েরা। চাপা কান্নার আওয়াজ ভেসে আসছে।

সব ব্যাপারটা বুঝতে আমার বেশ সময় নিল।

আস্তে মামাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কী হয়েছিল?'

'বাস চাপা। আজ সকালে।'

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। কী করে মামাকে বলব, যে প্রিয়নাথ খাটিয়ায় চিরদিনের জন্য ঘুমাচ্ছে, সে একটু আগে পার্কে বসে আমার সঙ্গে গল্প করে এসেছে। মরা মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার গল্প।

তবু মামাকে একবার বললাম।

'আপনি কি প্রিয়কে লোচনপুরে পাঠিয়েছিলেন?'

সূচীপত্রে যান

মামা অবাক।

'লোচনপুর? না, লোচনপুরের সঙ্গে তো আমার আর কোনো সম্পর্ক নেই। সেখানে পাঠাতে যাব কেন?'

আর কিছু বললাম না। আর যা বলার তা কেউ বিশ্বাস করত না। বরং আমাকেই পাগল ঠাওরাত।

আমি নিজেই কিছু বুঝতে পারলাম না। পরলোক থেকে আত্মারা কি প্রিয়নাথকে এগিয়ে এসে নিয়ে যেতে এসেছিল?

তাই-বা কী করে হয়!

প্রিয়নাথ যখন এসব কাহিনি আমার কাছে বলছিল, তার আগেই তো সে এ পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে অন্য লোকে চলে গেছে।

যাই হোক, এখন আমার কর্তব্য প্রিয়নাথের শবানুগমন করা।

বাড়িতে বলে আসা প্রয়োজন।

বেরিয়ে রাস্তার কাছে এসেই থেমে গেলাম। ভিড় আর নেই। সবাই সরে গেছে।

টোকলের কাছে প্রিয়নাথ দাঁড়িয়েছিল। আমাকে দেখে হেসে বলল, 'দেখলি তো কাণ্ডটা। এরা প্রমাণ করে ছাড়বে আমি বাস চাপা পড়ে মরেছি। অথচ তুই দেখ, জলজ্যান্ত বেঁচে। একটা আঁচড়ও আমার গায়ে লাগেনি।'

আমার সারা শরীর গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। আমিও তো মৃত লোকের মুখোমুখি হয়েছি। আমার অদৃষ্টে কী আছে কে জানে!

লক্ষ করিনি মাল বোঝাই লরিটা ততক্ষণে খুব কাছে এসে পড়েছে।

সূচীপত্রে যান

আবার ভূত

অনেক অলৌকিক কাণ্ড পৃথিবীতে ঘটে, যার বুদ্ধিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়।

এরকম দু-একটি ঘটনা নিশ্চয় তোমাদেরও শোনা।

স্বামী-স্ত্রী ফোটো তুলেছে, সেই ফোটোতে স্বামী আর স্ত্রীর মাঝখানে আর একটি মেয়ের মুখ। মুখটি অবশ্য খুব পরিষ্কার নয়, কিন্তু বেশ দেখা যায়।

দোকান থেকে ফোটোটা যখন বাড়িতে দিয়ে গেল, তখন স্বামী অফিসে। স্ত্রী ফোটো দেখেই চমকে উঠল।

একী, ফোটো তোলবার সময় স্টুডিয়োতে তো খালি তারা দুজন পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিল। এ মেয়েটির মুখ এল কোথা থেকে?

ফোটো প্রিন্ট করার সময় অন্য কোনো ফোটোর সঙ্গে জুড়ে গেছে?

স্ত্রী রীতিমতো চিন্তিত হয়ে পড়ল।

স্বামী অফিস থেকে ফিরতেই স্ত্রী ফোটোটা নিয়ে তার কাছে ছুটে গেল। 'একেবারে বাজে স্টুডিয়ো, দেখো আমাদের ছবিটা কীভাবে নষ্ট করে দিয়েছে!'

ফোটোটা দেখেই স্বামী চমকে উঠল।

'একী, আশ্চর্য কাণ্ড!'

তাদের দুজনের মাঝখানে যে মুখটি দেখা যাচ্ছে সেটা তার খুব চেনা। কিন্তু তার পরিচয় স্ত্রীর কাছে সে দেবে কী করে?

মেয়েটি তার প্রথম পক্ষের পরিবার। বিয়ের ছ-মাস পরে সে মারা গিয়েছিল। তার কোনো ফোটো তোলা হয়নি। অথচ এ ফোটোতে তার মুখ এল কী করে?

স্বামী যে আগে একবার বিয়ে করেছিল, সে কথা স্ত্রী জানে না। তাকে বলা হয়নি।

ফোটোটা নিয়ে স্বামী বলল, 'আমি এখনই স্টুডিয়োতে যাচ্ছি। এভাবে ফোটো নষ্ট করার জন্য খুব কড়া কথা শুনিয়ে দেব।'

স্টুডিয়োর মালিককে স্বামী সব বলতে, মালিক বলল, 'আর বলবেন না মশাই। আমরা কিছু ভেবে কূলকিনারা পাচ্ছি না। যতবার ওয়াশ করি, ওই একই ব্যাপার, মেয়েটির মুখ ফুটে ওঠে। আপনি মেয়েটিকে চেনেন নাকি?'

'না, না, আমি চিনব কী করে? এ ফোটো আপনারাই রেখে দিন, আমার দরকার নেই।'

ঝঞ্ঝাট এড়াবার জন্য স্বামী ফোটোটা স্টুডিয়োতেই রেখে এসেছিল। কিন্তু তাতে বিপদ কমেনি।

মাঝরাতে স্ত্রী চিৎকার করে বিছানার ওপর উঠে বসেছে।

'কী হল, কী হল?' বলে স্বামীও ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছে।

'সেই মুখটা আমাকে কী সব বলছে!'

'কোন মুখ?'

'যে মুখ আমাদের ফোটোতে দেখা গিয়েছিল। চোখ দুটো লাল করে খোঁনা খোঁনা গলায় আমাকে শাসাচ্ছে, ''এ আমার বাড়ি, আমার স্বামী। তুই যা, যা এখান থেকে। নইলে তোর গলা টিপে ধরব!'' '

স্বামী স্তোকবাক্যে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেছে।

'তুমি মিছিমিছি ভয় পাচ্ছ। তোমার কোনো ভয় নেই। স্বপ্ন দেখে ওরকম মনে হয়।'

স্বামী কিছু না বললেও, পাড়া প্রতিবেশীর কাছ থেকে স্ত্রী কথাটা শুনতে পেল।

সূচীপত্রে যান

তারাই বলে ফেলল, বারণ সত্ত্বেও, যে স্বামীটি আগে একবার বিয়ে করেছিল। প্রথম স্ত্রী কুয়োতলায় জল তুলতে গিয়ে পা পিছলে সিমেন্টের ওপর পড়ে মাথায় চোট পায়। দু-দিন পরেই মারা যায়।

এরপরের খবর আমার জানা নেই। এটা বোধ হয় 'পরলোকের কথা' বইতেই পড়েছিলাম।

যাক, এবার নিজের কথা বলি।

ভূত সম্বন্ধে আমার কৌতূহল ছেলেবেলা থেকেই। বড়ো হয়ে ইংরাজি বাংলা ভূততত্ত্বের বই জোগাড় করে পড়েছি। ঠিক কোনো সমস্যায় পৌঁছোতে পারিনি।

ভগবানকে বিশ্বাস করার ব্যাপারে যেমন মোটামুটি তিনটে দল আছে। আস্তিক, নাস্তিক আর সন্দেহবাদী। ভূতের বেলাতেও ঠিক তাই। আমি এই সন্দেহবাদীদের দলে।

ভূত থাকতেও পারে, আবার না থাকলেও আশ্চর্য হব না।

কিন্তু গত নভেম্বর মাসের একটা ঘটনার পর, নিজের মত বদলাতে বাধ্য হয়েছি।

সভাসমিতির ব্যাপারে আমি চিরকালই ভয় পাই। বিশেষ কোথাও যাই না। সবিনয়ে আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করি।

কিন্তু জামশেদপুরের এক সাহিত্য সম্মেলনে যেতে হয়েছিল, কারণ আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু সে সম্মেলনের উদ্যোক্তা।

আমার সঙ্গে আরও যে তিনজন সাহিত্যিক গিয়েছিলেন, তাঁরা আশেপাশের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখবার জন্য রয়ে গেলেন। সভার অধিবেশন শেষ হতেই আমি বেরিয়ে পড়লাম।

তার অবশ্য কারণ ছিল।

আমার ঘাটশিলার অন্তরঙ্গ বন্ধু মুকুল চক্রবর্তী বিশেষ করে আমাকে লিখেছিল, সভা শেষ করেই ফেরার পথে ঘাটশিলায় যেন কয়েকটা দিন কাটিয়ে যাই তার কাছে।

বিভূতিভূষণের স্পর্শে ঘাটশিলা সাহিত্যিকদের তীর্থস্বরূপ।

কিন্তু মানুষ গড়ে আর ভগবান ভাঙে।

ট্রেন গলৌডির কাছ বরাবর গিয়ে আটকে রইল।

একদল লোক লাইনের ওপর বসে পথ অবরোধ করে। ট্রেন তারা একচুল নড়তে দেবে না, যতক্ষণ না তাদের আবেদন মঞ্জুর হয়।

'কী তাদের আবেদন?'

এতদিন বম্বে এক্সপ্রেস গলৌডিতে থামত। হঠাৎ নতুন সময়পঞ্জিতে নিয়ম হয়েছে, সে আর থামবে না। হাওয়ার বেগে স্টেশন অতিক্রম করে যাবে।

তাই গলৌডিবাসীরা বিক্ষোভে ফেটে পড়ল।

ড্রাইভার আর গার্ড তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

এ ট্রেনটা আজকের মতন অন্তত চলতে দিন। কারণ, আজ রবিবার। চক্রধরপুরে খবর দিলেও কোনো লাভ হবে না। ছুটির দিন ঊর্ধ্বতম কর্মচারীরা কেউ অফিসে আসে না, অথচ তারা ছাড়া এ বিষয়ে কিছু বলা সম্ভব নয়।

বিক্ষোভকারীরা চুপচাপ। এসব কথা তাদের কানে গেছে এমন মনে হল না।

দু-ঘণ্টা পার হয়ে গেল। চারদিকে অন্ধকার। কয়েকটা জোনাকি উড়ছে। কামরা থেকে নেমে পড়লাম।

একজন মাতব্বরকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কী ভাই, কখন ট্রেন ছাড়বে?'

আমার দিকে অবহেলা-ভরে একবার চোখ ফিরিয়ে দেখে লোকটা বলল, 'আমাদের দাবি মানলেই ছাড়বে। আজ ছুটির দিন, কর্তারা বুঝি কেউ নেই, কাজেই কাল বেলা দশটার আগে তো ছাড়ছেই না।'

সরে এলাম। কামরার মধ্যে চুপচাপ বসে থাকতে ভালো লাগল না। তা ছাড়া এক মারোয়াড়ি দম্পতি দুটি নাবালক নিয়ে আমার সহযাত্রী। ইতিমধ্যে সঙ্গে যে খাবার ফলমূল ছিল নাবালক দুটি খেয়ে শেষ করেছে,

সূচীপত্রে যান

তাতেও ক্ষুধা মেটেনি। দুজনে তারস্বরে চিৎকার করছে। কামরার মেঝে ফলের খোসা, জল আর শালপাতার নরককুণ্ডের রূপ নিয়েছে।

রেললাইন ধরে হাঁটতে শুরু করলাম। কলকাতার দিকে নয়— এমনই হাঁটার উদ্দেশে।

মেঘে-চাঁদে লুকোচুরি খেলা চলছে। ফলে, কখনো আলো, কখনো অন্ধকার। আকন্দ গাছ, বনতুলসি আর ছোটো ছোটো কাঁটাগাছের ঝোপ।

বেশ কিছুটা এগিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

চারদিকে ধুধু মাঠ। এলোমেলো হাওয়া বইছে, ম্লান জ্যোৎস্না।

স্পষ্ট দেখলাম, মাঠের ওপর একটি মেয়ে শুয়ে। দুটো হাত বুকের ওপর, মাথায় বেণী ছড়িয়ে পড়েছে।

এমন জায়গায় মেয়েটি এল কী করে? শাড়ি পরার ধরনে বাঙালি মেয়ে বলেই মনে হচ্ছে। বয়স চোদ্দো-পনেরোর বেশি নয়।

আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলাম, তারপরই কথাটা মনে পড়ল।

মেয়েটিকে কেউ মেরেফেলে এখানে রেখে যায়নি তো? তাই হওয়া সম্ভব, না-হলে মেয়েটি এমন নিস্পন্দ হয়ে পড়ে থাকত না।

চিন্তাটা মনে আসতেই পিছিয়ে এলাম।

মেয়েটির কাছে গিয়ে বিপদ ডেকে আনব নাকি? হঠাৎ যদি পুলিশের লোক ধরে ফেলে। কী বলব তাদের?

ট্রেনে আটকেছে, তাই ফাঁকা মাঠে একটু পায়চারি করছি, এমন একটা কথা নিজের কানেই অসংলগ্ন ঠেকল।

তারপর আমি যে নির্দোষ তা প্রমাণ করতে পারব, কিন্তু বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা, পুলিশ ছুঁলে চুয়ান্ন। মনোকষ্ট, অর্থনাশ, স্রেফ ঝামেলা।

কয়েক পা গিয়ে কৌতূহলের বশে ফিরে দেখলাম।

কোথাও কেউ নেই। তাহলে কি চোখের ভুল? অনক সময় ফিকে চাঁদের আলো বিভ্রমের সৃষ্টি করে।

কিন্তু এত কাছ থেকে ভুল দেখলাম!

এদিক-ওদিক চোখ ফিরিয়েই স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

মেয়েটি একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে! শুধু দাঁড়ানোই নয়, আমার দিকে ফিরে ফিক ফিক করে হাসছে।

তবে কি মেয়েটি এই ট্রেনের যাত্রী। ট্রেন চলবার সম্ভাবনা নেই দেখে আমারই মতন নেমে পড়ে এদিক-ওদিক হাঁটছিল।

তারপর ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়েছিল, কিংবা ঘুমিয়েই ছিল, আমি দেখে মৃত মনে করেছিলাম।

মেয়েটির কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করলাম, 'এখানে কী করছ?'

মেয়েটি হেসেই বলল, 'আপনার মতন বেড়াচ্ছি।'

'কেন, ট্রেনে ভালো লাগে না?'

'বিচ্ছিরি! লোকের ভিড়ে দম বন্ধ হয়ে যাবার জোগাড়। এ জায়গা আমার খুব চেনা। চলুন আপনাকে এক জায়গায় নিয়ে যাই।'

বুঝতে পারলাম মেয়েটি কাছাকাছিই থাকে। সম্ভবত গিডনীতে। স্বাস্থ্যের জন্য অনেকেই গিডনীতে আসে।

বললাম, 'চলো। ট্রেন আবার ছেড়ে দেবে না তো?'

'দিক না, ট্রেনের চেয়ে আগে আমি ছুটতে পারি।'

কথাটা সত্যি। কারণ কোনো মেয়ে যে এত দ্রুত হাঁটতে পারে তা আমার ধারণার অতীত ছিল। আমি লম্বা লম্বা পা ফেলেও তার নাগাল পেলাম না। সে আমার চেয়ে অন্তত চার-পাঁচ গজ আগে রইলই।

'তুমি থাকো কোথায়?'

সূচীপত্রে যান

আমার প্রশ্ন শুনে মেয়েটি ফিক করে হাসল।

'ওই তো রেললাইনের ধারে।'

বুঝতে পারলাম মেয়েটি পরিহাস করছে। আসল ঠিকানা আমাকে বলতে চায় না।

হাঁটতে কষ্ট হচ্ছিল। উঁচু-নীচু জমি। মাঝে মাঝে পাথরে হোঁচট খাচ্ছিলাম, কিন্তু আশ্চর্য, একটানা মেয়েটির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলছিলাম।

মেয়েটি বোধ হয় আমার অবস্থা বুঝতে পেরেছিল।

হাত বাড়িয়ে বলল, 'আপনারা কলকাতা শহরের লোক কিনা, তাই হাঁটতেই পারেন না। একটু পরিশ্রমেই হাঁপিয়ে ওঠেন। নিন, হাত ধরুন।'

ঠিক মনে হল আমার হাত যেন বরফের স্পর্শ পেল! আমার সব রক্ত জমে হিম হয়ে গেল! সারা হাত অবশ।

'তোমার হাত এত ঠান্ডা যে?'

মেয়েটি আবার ফিক করে হাসল।

'সব সময়েই বাইরে থাকি কিনা। তা ছাড়া, শরীরে রক্তই যে নেই।'

মেয়েটি প্রায় টানতে টানতে আমায় নিয়ে চলল।

চাঁদের ফালি মেঘে ঢাকা পড়ে গেল। সব অন্ধকার।

অনেক কষ্টে মেয়েটির হাত ছাড়িয়ে নিয়ে মাটির ওপর বসে পড়লাম।

'আর চলতে পারছি না।'

'চলতে তোমাকে হবেই!'

মেয়েটির গম্ভীর কণ্ঠস্বরে মুখ তুলতেই চমকে উঠলাম।

কোথায় মেয়েটি? তার জায়গায় একটি নরকঙ্কাল! শুধু দুটো চোখ দিয়ে যেন আগুনের দীপ্তি বের হচ্ছে।

বাতাস লেগে দাঁতগুলো কড়মড় শব্দ করে উঠছে।

আমি খুব ভীরু প্রকৃতির নই। বন্ধুমহলে সাহসী বলে নাম আছে, কিন্তু মেয়েটিকে এভাবে নরকঙ্কালে রূপান্তরিত হতে দেখে, আমার মেরুদণ্ড বেয়ে শীতল স্রোত বয়ে গেল।

এত কাছ থেকে এরকম চোখের ভুল হতে পারে?

'ওঠো, চলে এসো!'

কণ্ঠস্বরও স্বাভাবিক নয়। অন্তত মেয়েটির গলার সঙ্গে কোনো মিল নেই।

বহুকষ্টে উঠে দাঁড়ালাম। দুটো পা-ই ঠকঠক করে কাঁপছে। একবার ভাবলাম, তিরবেগে পিছন দিকে দৌড়াই, কিন্তু বুঝতে পারলাম, তাতেও মেয়েটির কাছ থেকে নিস্তার পাব না।

দুটি হাত দিয়ে হয়তো কণ্ঠনালী চেপে ধরবে। আমার প্রাণহীন দেহ এই তেপান্তর মাঠে পড়ে থাকবে।

মেয়েটিকে অনুসরণ করলাম। মেয়েটি নয়— একটা কঙ্কাল।

প্রতি পদক্ষেপে আওয়াজ হল, ঠক, ঠক, ঠক।

আমার চারপাশ ঘিরে ঠান্ডা বাতাসের আমেজ। মনে হল, ধারে-কাছে প্রবল বৃষ্টি হয়ে গেছে।

নিজের শক্তিতে নয়, কঙ্কালের আকর্ষণে ছুটে চলেছি।

হঠাৎ লক্ষ করলাম, এগোবার সঙ্গে সঙ্গে কঙ্কালটি লম্বায় বাড়ছে— ছ-ফুট, সাত ফুট, আট ফুট!

গাছ ছাড়িয়ে কঙ্কালের মাথা। পাঁজরের মধ্য দিয়ে বাতাস বইছে। তার শন শন শব্দ।

ভয়ে চলবার শক্তি হারালাম। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়লাম।

কঙ্কাল কয়েক পা গিয়েই দাঁড়াল। দু-চোখে আগুনের হলকা। আমার অবস্থা দেখে হা হা করে পৈশাচিক হাসি হেসে আমার দিকে দীর্ঘ মাংসহীন হাত বাড়িয়ে দিল।

চিৎকার করে জ্ঞান হারালাম।

সূচীপত্রে যান

কতক্ষণ অচেতন ছিলাম, জানি না। যখন জ্ঞান হল, দেখলাম অন্ধকার আর নেই, প্রায় ভোর হয়ে এসেছে।

উঠে বসলাম। চারদিকে মাটির হাঁড়ি, বাঁশের টুকরো আর হাড় ছড়ানো। বোঝা গেল জায়গাটা শ্মশান।

সারা শরীরে অসহ্য ব্যথা। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালাম।

অনেক দূরে মাথায় কাঠের বোঝা নিয়ে দুজন লোক যাচ্ছিল, হাততালি দিয়ে তাদের ডাকলাম।

কাছে আসতে জিজ্ঞাসা করলাম, 'গলৌডি স্টেশন এখান থেকে কতদূর?'

একজন বলল, 'তা মাইল সাতেক হবে।'

সাত মাইল! কাল রাতে এই দীর্ঘ সাত মাইল কী করে হেঁটে এলাম, তা ভাবতেই আশ্চর্য লাগল।

এতটা পথ ফিরব, দেহে এমন শক্তি নেই। অথচ ফিরে আমাকে যেতেই হবে।

খুব ধীর পদক্ষেপে এগোতে আরম্ভ করলাম।

নিজেকে বোঝালাম, কাল রাতে যা ঘটেছে, নিজের চোখে যা দেখেছি, সবই আমার মনের কল্পনা। কোনো কারণে ভয় পেয়েছিলাম, ভয় থেকেই মন-গড়া মেয়েটির মূর্তি জন্ম নিয়েছে।

গলৌডি স্টেশনে যখন পৌঁছোলাম, তখন আর আমার দাঁড়াবার মতন অবস্থা নেই।

বোধ হয় অল্পক্ষণের জন্য জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম, চোখ খুলে দেখলাম আমার চারপাশে ছোটো একটা জনতা।

'যাও, যাও, ভিড় করো না এখানে!'

স্টেশনমাস্টার লোকজন সরিয়ে দিয়ে আমার হাত ধরে নিজের কামরায় নিয়ে গেলেন। পোর্টারকে বলে এক গ্লাস গরম দুধ এনে মুখের সামনে ধরলেন।

দুধ খেয়ে অনেকটা চাঙ্গা হলাম।

স্টেশনমাস্টার প্রশ্ন করলাম, 'বম্বে এক্সপ্রেস কি ছেড়ে দিয়েছে?'

'না। স্টেশনের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। চক্রধরপুর থেকে ট্রলি করে কর্তারা আসছেন। তাঁরা কথা দিলে তবে গাড়ি ছাড়বে; কিন্তু আপনি কে, ওই শ্মশানে কী করছিলেন?'

শ্মশানে কী করে গেলাম, স্টেশনমাস্টারকে সবিস্তারে বললাম।

সব শুনে তিনি শিউরে উঠলেন।

'সর্বনাশ, আবার সেই রেবা সোমের ব্যাপার!'

'রেবা সোম? সে কে?'

'বছর দুই আগের ঘটনা। এই বম্বে এক্সপ্রেসেই। যাত্রীর ছদ্মবেশে কয়েক জন ডাকাত মেয়ে-কামরায় উঠেছিল। তাদের আগাগোড়া বোরখা ঢাকা। হঠাৎ তারা বোরখা খুলে পিস্তল ছোরা দিয়ে মহিলাদের সামনে দাঁড়াল।'

'সর্বনাশ, তারপর?'

'সবাই অর্থ, অলংকার সব খুলে দিল, কেবল চোদ্দো-পনেরো বছরের একটি মেয়ে রুখে দাঁড়াল। ''না, কিছু দেব না। এখনই শিকল টানব।''

শিকল আর তাকে টানতে হয়নি। একটা ডাকাত তার গলাটা সাঁড়াশির মতন হাত দুটো দিয়ে চেপে ধরল, তারপর নিস্পন্দ দেহটা কামরার জানলা দিয়ে বাইরে ছুড়ে ফেলে দিল।

তারপরই প্রায়ই রেবা সোমকে দেখা যায়। কখনো কামরার ভিতরে, কখনো জানলার বাইরে ট্রেনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছোটে।

ভয় পেয়ে অনেকে অনেক বার চেন টেনে গাড়ি থামিয়ে দিয়েছে।'

'তাহলে আমি যাকে দেখেছিলাম—'

সূচীপত্রে যান

'নিঃসন্দেহে সে রেবা সোম। আপনার ভাগ্য খুব ভালো মশাই, প্রাণে বেঁচে ফিরে এসেছেন। আর একবার লাইন মেরামত হচ্ছিল, ট্রেন আধঘণ্টার জন্য থেমেছিল। একটি কলেজের ছোকরা আপনার মতন ট্রেন থেকে নেমে মাঠে দাঁড়িয়েছিল। ব্যস, তীক্ষ্ন একটা চিৎকার। চর্ট জ্বেলে অনেকে নেমে পড়ে দেখে ছেলেটি পড়ে আছে। গলায় দশ আঙুলের ছাপ। শ্বাসরোধ করে তাকে মেরে ফেলা হয়েছে।

লোকের ধারণা কোনো দুর্বৃত্ত ওত পেতে ছিল, সুযোগ বুঝে ছেলেটিকে মেরে ফেলেছে।

আমি কিন্তু সে কথা বিশ্বাস করিনি। দুর্বৃত্তই যদি ছেলেটিকে মারবে, তাহলে তার পকেটের ব্যাগ, হাতের ঘড়ি এসব ঠিক থাকবে কী করে? কেউ কাউকে বিনা উদ্দেশ্যে কখনো হত্যা করে?

অবশ্য কেবল রেবা সোম ছাড়া। তার আত্মা প্রতিহিংসা নেবার জন্য হয়তো ঘুরে বেড়াচ্ছে। সব পুরুষ মানুষের প্রতি তার ক্রোধ, ঘৃণা। কারণ পুরুষ মানুষের দ্বারাই সে নিহত হয়েছে এবং তার চরম বিপদে কোনো পুরুষ তাকে রক্ষা করতে ছুটে আসেনি।'

সেবারে ঘাটশিলায় আর নামিনি। কোথাও নামতে সাহস করিনি।

সোজা কলকাতায় ফিরে এসেছি।

অবসর সময়ে নিজের মনের সঙ্গে অনেক তর্ক করেছি। বার বার বোঝাতে চেষ্টা করেছি, যা কিছু ঘটেছে সব মিথ্যা, মনের কল্পনা। ভূতের অস্তিত্ব পৃথিবীতে নেই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমার চারপাশে ঠান্ডা একটা বাতাসের বলয় অনুভব করেছি। হাত থেকে এক গোছা কাচের প্লেট ভেঙে গেলে যেমন শব্দ হয়, তেমনি শব্দ করে কে যেন হেসে উঠেছে।

রেবা সোম বুঝি বলতে চেয়েছে, 'ওরে অবিশ্বাসী, আমরা আছি। অর্থহীন যুক্তি দিয়ে আমাদের উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব নয়।'

ক্রমে যেন বিশ্বাসের বাঁধন শিথিল হয়ে আসছে। রেবা রোম আছে, তারা চিরদিন ছিল, থাকবেও— এই সত্যই স্বীকার করতে ইচ্ছা হচ্ছে।

সূচীপত্রে যান

বনকুঠির রহস্য

চিঠিটা পেয়ে রীতিমতো আশ্চর্য হয়ে গেলাম। বছর দশেক তো হবেই, মানে কলেজ ছাড়ার পর থেকে সুকুমারের সঙ্গে আর দেখা হয়নি। শুনেছিলাম ওড়িশার এক জঙ্গলে কাঠ কেটে চালান দিচ্ছে। ব্যবসায় বেশ দু-পয়সা করেছে। কলকাতায় সে আসেই না।

চিঠিতে লেখা,

ভাই আমার বড়ো বিপদ। তুই আমাকে বাঁচা। যত তাড়াতাড়ি পারিস আয়। কটকে নেমে ট্যাক্সিতে সারানার জঙ্গলে চলে আসবি। আমার বাংলোর নাম বনকুঠি। যাকে জিজ্ঞাসা করবি সেই দেখিয়ে দেবে। আসিস ভাই। তোর আশায় রইলাম।

ইতি সুকুমার

চিঠিটা পেয়ে খুব চিন্তায় পড়লাম। কী এমন বিপদ হতে পারে সুকুমারের? ব্যাবসার জন্য যদি টাকার দরকার হয়ে থাকে তাহলে আমি আর কী সাহায্য করতে পারি। আমার সামান্য চাকরি। একলা মানুষ তাই কোনোরকমে চলে যায়।

তবে কি ওখানকার মজুরদের সঙ্গে কোনোরকম গোলমাল বাধল? তাহলেই বা আমি কী করতে পারি।

যাই হোক, বিপদ যখন লিখেছে তখন একবার যাওয়া দরকার।

অফিস থেকে দশদিনের ছুটি নিয়ে বের হয়ে পড়লাম।

কটকে নামলাম সন্ধ্যা ছ-টায়। স্টেশনে অনেক ট্যাক্সি রয়েছে, কিন্তু সারানার জঙ্গলে যেতে কেউ রাজি নয়।

যাকে জিজ্ঞাসা করি, সেই বলে যেতে চার ঘণ্টা লেগে যাবে। ফেরার সময় অত রাতে বিপদ আছে। খুব চিতাবাঘের উপদ্রব। দু-একজন বলল, রাতটা ওয়েটিংরুমে কাটিয়ে সকালেই যাবেন।

ভেবে দেখলাম ঠিক হবে। নতুন জায়গায়, বিশেষ করে জঙ্গলে রাতে না যাওয়াই ঠিক।

ওয়েটিংরুমে রাতটা কাটিয়ে সকালে ট্যাক্সি ধরলাম। শহর ছাড়িয়ে বেশ কিছুটা যাবার পর জঙ্গলের এলাকা শুরু হল। বড়ো বড়ো শাল আর কেঁদ গাছ। ঘন লতার ঝোপ। সূর্যের আলো বন্ধ। দিনের বেলাতেই আবছা অন্ধকার।

একটু এগিয়েই ট্যাক্সি থেমে গেল। আর পথ নেই।

'কী হল?'

'আর রাস্তা নেই। আপনাকে হেঁটে যেতে হবে।'

'সারানা জঙ্গল কত দূর?

'এই তো শুরু হল,' ট্যাক্সি ড্রাইভার আঙুল দিয়ে ফলকের দিকে দেখিয়ে দিল। তাতে লেখা, সারানা জঙ্গল।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'বনকুঠি কতটা দূর হবে?'

'তা বলতে পারব না। আপনি নেমে খোঁজ করুন।'

অগত্যা ভাড়া মিটিয়ে কাঁধে ঝোলা আর হাতে সুটকেস নিয়ে নেমে পড়লাম।

সরু পায়ে চলা পথ। ক্রমেই সংকীর্ণ হয়ে এল। ঝিঁঝির একটানা শব্দ, নাম না জানা পাখির কর্কশ ডাক, বাতাসে পাতা কাঁপার শিরশিরানি আওয়াজ। এই অজগর জঙ্গলে সুকুমার থাকে কী করে? অর্থের জন্য মানুষ বুঝি সবকিছুতেই অভ্যস্ত হয়ে যায়।

সূচীপত্রে যান

বেশ কিছুটা যাবার পর জনতিনেক কাঠুরিয়ার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সকলের হাতেই কুড়াল। ঝুড়িগুলো টুপির মতন মাথায় পরেছে।

তাদের প্রশ্ন করলাম, 'বনকুঠি কোন দিকে?'

তারা নিজেদের মধ্যে কী বলাবলি করল, কয়েক বার আমার আপাদমস্তক দেখলে, তারপর একজন বলল, 'বনকুঠি সোজা ডানদিকে, পুকুরের পাশে।'

চলতে চলতে লক্ষ করলাম, কাঠুরিয়ারা একটা গাছের নীচে দাঁড়িয়ে আমাকে দেখছে।

গভীর জঙ্গলে নতুন লোক দেখে তাদের কৌতূহল হওয়াই স্বাভাবিক।

একটু হাঁটতে লাগলাম। ঘামে সমস্ত শরীর ভিজে গিয়েছে। শহরের লোক, এতটা হাঁটা অভ্যাস নেই। পা-দুটো টনটন করছে।

একটু এগোতেই পুকুর দেখা গেল। পুকুর নয়, বিরাট ঝিল। জল দেখা গেল না। পদ্মপাতায় ভরতি। তার পাশেই একটা বাংলো। একতলা। চারপাশের রঙের সঙ্গে মিলিয়ে বাংলোর রং-ও সবুজ। ছোটো গেট। গেটের উপর একটা লতা উঠেছে। তাতে বেগুনি রঙের থোকা-থোকা ফুল, চমৎকার বাংলো। পথের কষ্ট যেন নিমেষে মুছে গেল।

গেটের কাছ বরাবর গিয়ে নজরে পড়ল, একটা কাঠের উপর সবুজ রং দিয়ে লেখা, 'বনকুঠি।'

গেট ঠেলে ভিতরে ঢুকেই দাঁড়িয়ে পড়তে হল। দরজায় তালা ঝুলছে।

তার মানে সুকুমার নেই। বেরিয়েছে। কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে কে জানে!

সুটকেস আর ঝোলা পাশে রেখে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে পড়লাম। বেশ ঝিরঝির বাতাস বইছে।

ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। যখন ঘুম ভাঙল, ঘড়ি দেখে চমকে উঠলাম। দু-ঘণ্টা পার হয়ে গেছে। তখনও দরজায় তালা ঝুলছে।

বুদ্ধি করে ঝোলার মধ্যে পাউরুটি আর কলা এনেছিলাম। কটক স্টেশন থেকে ফ্লাস্কে গরম চা ভরে নিয়েছিলাম। আপাতত তাই খেয়ে প্রাণ বাঁচালাম।

নেমে কিছুক্ষণ পায়চারি করলাম। সব জানলা বন্ধ। সেটাই স্বাভাবিক। এই ঘন জঙ্গলে কেউ জানলা খুলে বাইরে যায় না। জানলা দিয়ে বাইরে থেকে সাপ খোপের ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ার ষোলো-আনা সম্ভাবনা।

আরও দু-ঘণ্টা কাটল। সুকুমার কলকাতায় চলে গিয়েছে। আমি যে আসবই, সেটা তো তার জানবার কথা নয়। তবু চিঠি যখন আমাকে দিয়েছে, তখন তার দু-একদিন অপেক্ষা করা উচিত ছিল।

দরজার কাছে এগিয়ে গেলাম। খুব কম দামি মরচে পড়া তালা ঝুলছে। জোরে কয়েক বার টানতেই তালাটা খুলে এল।

বাড়ির মধ্যে ঢুকলাম। একটা খাট-বিছানা পাতা। একপাশে আলমারি। বোধ হয় কাপড় জামা রাখার। একটা গোল টেবিল, একটা চেয়ার।

খিদেয় চোখে অন্ধকার দেখছি। ছুটে রান্নাঘরে গেলাম। একটা জালের মিটসেফ। খুলতেই দেখলাম, চাল, ডাল, আলু আর ডিম রয়েছে। নীচে একটা স্টোভ।

রান্না করার অভ্যাস আমার ছিল। একসঙ্গে চাল ডাল চড়িয়ে দিলাম। তার মধ্যে আলুও ছেড়ে দিলাম। দুটো ডিমও ভাজলাম।

খাওয়া সেরে নিলাম। সুকুমারের জন্য খিচুড়ি আর ডিমভাজা আলাদা করে রেখে দিলাম।

তারপর সোজা শুয়ে পড়লাম বিছানায়। কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম জানি না, খুটখাট শব্দ হতে উঠে বসলাম। দরজার ওপারে বিশ্রী একটা মুখ দেখা গেল। খোঁচা খোঁচা কাঁচা-পাকা দাড়ি। খুদে লাল চোখ। পরনে ছেঁড়া শার্ট আর প্যান্ট।

চেঁচিয়ে উঠলাম, 'কে?'

লোকটা ভিতরে এসে বলল, 'আপনি কে? বাড়ির মধ্যে ঢুকলেন কী করে?'

সূচীপত্রে যান

তার কথার উত্তর না-দিয়ে বললাম, 'তুমি কে, আগে তাই বলো?'

'আজ্ঞে আমি এ বাড়ির দেখাশোনা করতাম। রান্না, বাসনমাজা, ঘর ঝাঁট দেওয়া সব।'

'আমি সুকুমারের বন্ধু। সুকুমার কখন আসবে? আমি ভোর থেকে অপেক্ষা করছি।'

লোকটার ভাঙাচোরা মুখে বিস্ময়ের রেখা ফুটে উঠল। দুটো চোখ বিস্ফারিত। আমার আপাদমস্তক চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, 'কে আসবে? বাবু? মরা মানুষ কি ফিরে আসে?'

কথাটা কানে যেতেই লাফিয়ে বিছানা থেকে নেমে দাঁড়ালাম।

'কে মরা মানুষ? কী যা-তা বলছ?'

'আপনি শোনেননি কিছু? নিজের দোষে বাবু মরণ ডেকে আনল।'

মাথার মধ্যে সব গোলমাল হয়ে গেল। সুকুমার নেই। যে বিপদের ভয়ে সে আমাকে চিঠি লিখে আসতে বলেছিল, সেই বিপদই বুঝি তাকে গ্রাস করল। আমার কি আসতে দেরি হয়েছে? কী লজ্জা, বন্ধুর প্রাণ বাঁচাতে পারলাম না!

লোকটাকে বললাম, 'সব ব্যাপারটা খুলে বলো তো। আমি কিছু বুঝতে পারছি না।'

লোকটা মেঝের ওপর বসল। খুব নীচু গলায় শুরু করল—

'বাবু তো কাঠের কারবার করতেন, জঙ্গলের একেবারে শেষের দিকে একটা গাছ আছে। সেটাকে আমরা তোঙ্গা গাছ বলি। সে গাছ কেউ কাটে না। তাতে অপদেবতার বাস। কাঠুরিয়া কেউ সে গাছ কাটতে রাজি হল না। সবাই চলে এল জঙ্গল থেকে, কিন্তু বাবু নাছোড়বান্দা। বলল, ''এ জঙ্গলের সব গাছ আমি ইজারা নিয়েছি, কোনো গাছ আমি ছাড়ব না।'' বাবু কুড়াল নিয়ে নিজেই তার ডাল কাটতে শুরু করলেন, গোটা তিনেক ডাল মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। কাটা জায়গা দিয়ে রক্তের মতন আঠা ঝরতে লাগল। আমি জোর করে বাবুকে টেনে বাড়ি নিয়ে এসেছিলাম। তারপর—'

'কী তারপর?'

'পরের দিন ভোরে এসে দেখি সদর দরজা খোলা। বাবু মেঝের ওপর পড়ে আছেন। চোখ দুটো যেন ঠিকরে বের হচ্ছে। বাবুকে কেউ গলা টিপে মেরে ফেলেছে। বাবুর হাতের মুঠোয় তোঙ্গা গাছের ছোটো একটা ডাল।'

বললাম, 'তার মানে সুকুমারকে ডাকাতে মেরে ফেলেছে।'

'না বাবু, এখানে চোর-ডাকাত নেই। এত গভীর জঙ্গলে কে আসবে ডাকাতি করতে। ডাকাত হলে বাবুর টাকাকড়ি, জামাকাপড় নিয়ে যেত না? কিচ্ছু কেউ ছোঁয়নি। তা ছাড়া বাবুর আর এক হাতের মুঠোয় একটা কাগজ ছিল। তাতে লেখা, তোঙ্গা বাবার কোপ থেকে আমাকে বাঁচাও। আমার বড়ো কষ্ট হচ্ছে। তোঙ্গা গাছের শক্ত ডাল আমার গলা চেপে ধরেছে। উঃ!'

'কাগজটা কোথায়?'

'এই যে বাবু।' লোকটা উঠে রান্নাঘরে গিয়ে একটা হাঁড়ির মধ্যে থেকে ডায়েরির একটা ছেঁড়া পাতা নিয়ে আমার হাতে দিল।

লোকটা যা বলেছিল সেই সবই কাগজে লেখা রয়েছে। সুকুমারেরই হাতের লেখা।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি বাংলা পড়তে পারো?'

'বলতে পারি বাবু, পড়তে পারি না।'

'তবে এ লেখা পড়লে কী করে?'

'আমি পড়িনি বাবু। পুলিশের লোক এসেছিল খবর পেয়ে। তাদের মধ্যে একজন বাংলা জানত, সেই পড়ে শুনিয়েছিল। কাগজটা আমার হাতে ফেরত দিয়ে বলেছিল, যত সব আজগুবি কাণ্ড!'

কথাটা হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল। সব ব্যাপারটা কেমন রহস্যজনক অলৌকিক ব্যাপার। আমার মোটেই বিশ্বাস নেই।

সূচীপত্রে যান

'কতদিন আগে এটা হয়েছে?'

লোকটা হিসাব করে বলল, 'তা দিন পনেরো তো হবেই।'

'মিথ্যে কথা!' ধমক দিয়ে উঠলাম। 'দিন পাঁচেক আগে সুকুমার আমাকে চিঠি দিয়েছিল। এই দেখো সেই চিঠি।'

পকেট থেকে পোস্টকার্ডটা লোকটার দিকে এগিয়ে দিতে গিয়েই চমকে উঠলাম। পোস্টকার্ডে একটি আঁচড়ও নেই। কেবল লাল লাল ছোপ।

সুকুমারের গলায় যে ধরনের লাল দাগের কথা বলেছিল, অনেকটা বুঝি সেই ধরনের।

সূচীপত্রে যান

বেনেটির জঙ্গলে

অনেক বছর আগের কথা। তখন আমি সরকারের কৃষিবিভাগের সঙ্গে যুক্ত। আমার কাজ ছিল গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে চাষ-আবাদের তদারক করা। চাষের ব্যাপারে চাষিদের কোনো অসুবিধা হচ্ছে কিনা দেখা। কোনো অঞ্চল থেকে হয়তো খবর এল, ধান গাছ সেরকম বাড়ছে না, কিংবা পাতাগুলো হলদে হয়ে যাচ্ছে। নয়তো নারকেল গাছে ফল ধরবার আগেই ঝরে পড়েছে, বেগুনে কালো দাগ হচ্ছে, পোকায় পাট গাছ খতম করে দিচ্ছে, অমনি আমাকে ওষুধবিসুধ নিয়ে ছুটতে সে অঞ্চলে। নিজের চোখে সব দেখে ব্যবস্থা করতে হত।

কাজটা আমার খুব ভালো লাগত। যাওয়া-আসা দৌড়ঝাঁপে কষ্ট হয়তো একটু হত, কিন্তু বয়স কম থাকার জন্য সেসব কষ্ট আমার গায়েই লাগত না। সত্যি কথা বলতে কী, দিল্লি, আগ্রা, পুরী, হরিদ্বারের চেয়ে এইসব গ্রামাঞ্চলে ঘুরে বেড়াতে আমার ভালোই লাগত। এইসব জায়গায় গেলে আমার দেশ আর দেশের মানুষকে ভালোভাবে চিনতে পারা যায়।

তা ছাড়া আমি গেলে চাষিমহলে একটা আনন্দের ঢেউ বয়ে যেত। কে আমাকে কী খাওয়াবে তাই নিয়ে প্রতিযোগিতা। কেউ মুড়ি আনত, কেউ গুড়, কেউ-বা আবার খেতের শাকসবজি, ফলপাকুড়। চলে আসবার সময় সবাই দল বেঁধে আমাকে জিপে তুলে দিত, কিংবা আসত বাসের রাস্তা পর্যন্ত।

এ চাকরিও একদিন ছেড়ে দিলাম। কেন দিলাম সেই কথাটাই তোমাদের বলি।

হঠাৎ আতাপুর থেকে খবর এল, সেখানকার চাষিরা মাথায় হাত দিয়ে পড়েছে। লাউ গাছে ফুল হয়েই শুকিয়ে যাচ্ছে। ফল ধরছে না।

আতাপুর লাউয়ের জন্য বিখ্যাত। যেমন আকার, তেমনই স্বাদ। এই লাউ শহরে প্রচুর চালান আসে—তানপুরা তৈরির জন্য।

শরীরটা ভালো যাচ্ছিল না। ক-দিন আগে জ্বর থেকে উঠেছি, এখনও বেশ দুর্বল। কিন্তু উপায় নেই। আতাপুরের চাষিদের বিপদে পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই হবে।

আরও এক অসুবিধা হল। আমাদের তাঁবে তিনটে জিপ। দুটো গেছে নবদ্বীপ আর বীরভূমের দিকে। বাকি যেটা আছে, সেটা অচল। ইঞ্জিন মেরামতের কাজ চলছে।

অগত্যা বাসে যাওয়াই ঠিক করলাম। তার আগে কৃষি বিষয়ের বইগুলো পড়ে নিলাম। কেন অকালে লাউয়ের ফুল ঝরে যাচ্ছে। কিছু ওষুধপত্রও ব্যাগে ভরলাম।

অশুভক্ষণেই বোধ হয় যাত্রা শুরু করেছিলাম। মাইল পঁচিশ-ছাব্বিশ গিয়েই বাস থেমে গেল। আর এগোবার উপায় নেই।

সামনে কয়াল নদী। অন্য সময়ে এই নদী রুপোলি সুতোর মতন পাশে পড়ে থাকে। ছোটো একটা কাঠের পুল। এখন কাঠের পুলের চিহ্ন নেই।

নেমে দাঁড়ালাম। এখন উপায়। পাশে একটা টিনের চালা ছিল। চায়ের দোকান। সেখানে খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম, গত তিনদিন ধরে এ এলাকায় একটানা বৃষ্টি হয়েছে। মাত্র আজ সকালে থেমেছে। ফলে আশপাশের নদীনালা কূল ছাপিয়ে গাঁয়ের মধ্যে ঢুকে গেছে। চাষবাস সব নষ্ট। অনেকেই বাড়িঘর ছেড়ে উঁচু জমিতে আশ্রয় নিয়েছে।

সর্বনাশ, এখন কী উপায় হবে! এতটা পথ এসে ফিরেই বা যাই কী করে! চায়ের দোকানের লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলাম।

সূচীপত্রে যান

লোকটা মাথা চুলকে বলল, 'আতাপুরের খবর ঠিক জানি না। তবে গাঁটা একটু উঁচু জমির ওপর। বোধ হয় বন্যার জল ঢোকেনি।'

'আতাপুরে যাব কী করে?'

'কেন, নৌকা করে বল্লভডাঙা চলে যান। সেখানে থেকে পায়ে হাঁটা রাস্তা আছে। রাইচণ্ডী হয়ে আতাপুর। তবে পথে জল পড়বে কিনা জানি না।'

ঠিক করলাম বরাত ঠুকে রওনাই হব। আকাশের অবস্থা খুব ভালো নয়। বৃষ্টি থেমেছে বটে, তবে আকাশ জুড়ে কালো মেঘ ঘোরাফেরা করছে। যেকোনো মুহূর্তে বৃষ্টি শুরু হয়ে যেতে পারে।

তার ওপর ফিরে যাবার রাস্তাও বন্ধ। বাস ফেলে রেখে ড্রাইভার আর কনডাক্টর সরে পড়েছে।

সামনে দেখলাম কয়াল নদীতে গোটা তিনেক নৌকা পারাপার করছে। ব্যাগ কাঁধে ফেলে একটা নৌকায় চেপে বসলাম।

মিনিট কুড়ির মধ্যেই ওপারে বল্লভডাঙা পৌঁছে গেলাম। রাইচণ্ডী পর্যন্ত অনেকেই সঙ্গী হল। তারপর আতাপুরের রাস্তায় আমি একলা। মনে হল এদিকে বন্যার প্রকোপ বেশি নেই, কিন্তু আতাপুরের কাছাকাছি গিয়েই দেখলাম, দু-পাশে জলের স্রোত। খেতখামার সব জলের তলায়। দু-পাশের বাড়ি খালি। লোকজন সব সরে গেছে।

গাঁয়ের মাঝখানে কৃষি বিভাগের বাড়ি। একতলায় অফিস, দু-তলায় থাকার ব্যবস্থা। আমি এলে দু-তলাতেই থাকি।

অফিসের সামনে গিয়ে যখন পৌঁছোলাম, তখন অন্ধকার নেমেছে। চারিদিকে ব্যাঙ আর তক্ষকের ডাক।

ব্যাগ থেকে টর্চ বের করে দরজার ওপর আলো ফেললাম। দরজায় বিরাট তালা ঝুলছে।

সর্বনাশ! এখানে রাতটা কাটাব কোথায়? ব্যাগের মধ্যে পাঁউরুটি আর কলা এনেছিলাম, তাও শেষ হয়ে গেছে। আশপাশের বাড়ি বন্ধ। লোকেরা আশ্রয়ের জন্য যে যেখানে পেরেছে, পালিয়েছে। যদিও আতাপুর গ্রামটা উঁচু জায়গায়, তবুও জোর করে কিছু বলা যায় না। বন্যার জল বাড়লেই গ্রামে ঢুকে পড়বে।

নিরুপায় হয়ে এদিক-ওদিক দেখলাম। কোথাও কেউ নেই। রাতটা হয়তো অভুক্ত অবস্থায় কৃষি অফিসের বারান্দাতেই কাটাতে হবে। সেটা মোটেও নিরাপদ নয়।

কিছুটা এগোতেই নজরে পড়ল পাশের একটা কুঁড়েঘর থেকে আলো দেখা যাচ্ছে। তার মানে লোক আছে ভেতরে।

এগিয়ে গিয়ে। বললাম, 'কে আছ, বাইরে এসো।'

দীর্ঘ একটা ছায়া। কাছে আসতে লণ্ঠনের আলোয় চিনতে পারলাম। তিলক। কৃষি অফিসের বেয়ারা। সকলের ফাইফরমাস খাটে।

ধড়ে প্রাণ এল। তিলকের কাছে নিশ্চয় অফিসের চাবি আছে। বাইরে রাত কাটাতে হবে না।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'আমার চিঠি তোমরা পাওনি?'

তিলক খনখনে গলায় উত্তর দিল, 'আর চিঠি? চারদিকে যা ব্যাপার, পিয়নই আসছে না কদিন ধরে। চিঠি বিলি করবে কে?'

'দাও, অফিসঘরের চাবিটা দাও।'

'চাবি তো সুনন্দবাবুর কাছে। তিনি চাবি দিয়ে চলে গেছেন।'

'চলে গেছেন? কোথায়?'

'তাঁর বাড়ি নন্দীপুর।'

নন্দীপুরে সুনন্দবাবুর বাড়ি তা জানতাম। আতাপুর আর নন্দীপুর পাশাপাশি গ্রাম। মাঝখানে আড়াই মাইল। আড়াই মাইল পথ হয়তো বেশি নয়, কিন্তু দু-গ্রামের মধ্যে ঘন জঙ্গল। একপাশে শ্মশান।

সূচীপত্রে যান

দিনের বেলা খুব প্রয়োজন না হলে জঙ্গলে কেউ ঢোকে না। বছর খানেক আগে সুনন্দবাবুর সঙ্গে একবার তার বাড়ি গিয়েছিলাম। কিন্তু সে দিনের বেলা। তাও দেখেছি ঝুপসি অন্ধকার।

তিলকের কুঁড়ের যা অবস্থা তাতে রাত কাটানোর প্রশ্নই ওঠে না।

একমাত্র উপায় নন্দীপুর চলে যাওয়া। আকাশে মেঘের ফাঁকে ফাঁকে চাঁদের আলো রয়েছে। পথ চলতে অসুবিধা হবার কথা নয়।

তিলককে তাই বললাম, 'তাহলে আমি নন্দীপুরে চলে যাই।'

'এই রাতে?'

'এ ছাড়া আর উপায় কী? এখানে থাকব কোথায়? খাব কী?'

'তা অবশ্য ঠিক। চলে যান রাম নাম করতে করতে।'

'রাম নাম করতে হবে কেন?'

'মাঝখানে শ্মশান পড়বে তো। অপদেবতাদের উপদ্রব। তাই বলছি।'

ভূতের ভয় আমার কোনোকালেই ছিল না। কাজেই সেদিক থেকে কোনো অসুবিধা নেই। একমাত্র ভয় ছিল দুর্ব,ত্তদের।

কিন্তু দুর্বৃত্তরা আমার কীই-বা নেবে। হাতঘড়ি, টর্চ আর সামান্য কিছু টাকা।

এসব ভেবে কোনো লাভ নেই। নন্দীপুর যাওয়া ছাড়া আমার আর অন্য পথ ছিল না। আড়াই মাইল পথ যেতে বড়োজোর আড়াই ঘণ্টা লাগবে। একবার সুনন্দবাবুর বাড়ি গিয়ে পৌঁছোতে পারলে আহার-আশ্রয় দুই মিলবে।

ব্যাগটা কাঁধে ফেলে চলতে শুরু করলাম।

পথ যতটা সহজ হবে ভেবেছিলাম ততটা হল না। একেবারে অন্ধকার বন। বট, পাকুড় আর অশ্বত্থের জটলা। গাছ থেকে বিরাট সব ঝুরি নেমে জায়গাটা অন্ধকার করে রেখেছে। চাঁদের আলো গাছের পাতায় ঢাকা পড়ে গেল।

টর্চ জ্বাললাম। পায়ে চলা সুরু পথ। ভূতপ্রেতের ভয় হয়তো করি না, কিন্তু সাপখোপের উপদ্রব তো আর উপেক্ষা করতে পারি না। সাবধানে এদিক-ওদিক দেখে এগোতে লাগলাম।

একমাত্র ভরসার কথা, হাঁটু পর্যন্ত গামবুট ঢাকা। ছোবলে বিশেষ ক্ষতি হবে না।

এ জঙ্গলটির নাম বেনেটির জঙ্গল। কেন এ নাম জানি না। জানবার কোনো আগ্রহ ছিল না। কোনোরকমে এটা পার হতে পারলে বাঁচি।

অনেকক্ষণ ঘোরার পর খেয়াল হল। টর্চের আলোয় হাতঘড়িতে দেখলাম তিন ঘণ্টা পার হয়ে গেছে। যেভাবে হাঁটছি এতক্ষণে নন্দীপুরে পৌঁছে যাবার কথা। তাহলে নিশ্চয় পথ হারিয়েছি।

চলার গতি আরও দ্রুত করলাম। খিদেয় পেট জ্বলছে। শরীরও দুর্বল লাগছে। কিছুটা এগিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। সামনে অন্ধকারে জমাট-বাঁধা জোনাকির মতন কী সব জ্বলছে!

টর্চের আলো ফেলতেই সেগুলো সরে গেল। বুঝতে পারলাম শেয়ালের পাল। টর্চটা এদিক-ওদিক ঘোরাতেই দেখলাম চারদিকে মড়ার খুলি আর হাড় ছড়ানো। তার মানে শ্মশান। নন্দীপুর যেতে ডানদিকে শ্মশান পড়ে। শ্মশানের মধ্যে দিয়ে যেতে হয় না। তাহলে নির্ঘাৎ ভুল করেছি।

শ্মশান ডানদিকে রেখে হিসাব করে পথ বদলালাম। কয়েক পা যেতেই ঠক করে কপালে একটা গাছের ডাল লাগল।

উঃ করে কপাল চেপে কিছুক্ষণ বসে রইলাম। তারপর টর্চের আলো ওপর দিকে ফেলতেই শরীরের রক্ত হিম হয়ে গেল।

একটা পা! গাছের ডাল থেকে ঝুলছে!

সূচীপত্রে যান

কেউ বোধ হয় কাউকে মেরে গাছের ডালে টাঙিয়ে রেখেছে। কিন্তু টর্চের আলো যতদূর গেল, কেবল পা-ই দেখতে পেলাম। শরীরটা কোথায় গেল?

কোনোরকমে পাশ কাটিয়ে যেতে গিয়েই বিপত্তি। আবার মাথায় লাগল।

ওপরে চেয়ে দেখি, সেই পা।

কী আশ্চর্য, পা-টা এদিকে এল কী করে? যেদিক যাচ্ছি পা-টাও সেদিকেই ঘুরছে। শরীর ছাড়া পা-ই বা গাছের ডালে কে ঝুলিয়ে রাখল!

মাথা নীচু করে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করতেই নাঁকি সুর কানে এল।

'অঁ চাটুঁজ্যে মশাঁই শোঁন, শোঁন, কঁথা আঁছে।'

এই এতক্ষণ পরে বুকটা কেঁপে উঠল। কাটা পা দেখে ভেবেছিলাম, কোনো বদমায়েশ লোক হয়তো কাউকে কেটে তার দেহ খণ্ড খণ্ড করে গাছের ডালে টাঙিয়ে রেখেছে। কিন্তু এধরনের গলার স্বর গাছের ওপর থেকে আসছে কী করে?

কেউ কি গাছের ডালে বসে ভয় দেখাচ্ছে?

ওপরের দিকে চেয়েই চমকে উঠলাম। টর্চের আলোয় যা দেখলাম, তাতেই গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

বিরাট একটা কঙ্কাল! মাথাটা গাছের মগডাল ছাড়িয়ে। কঙ্কালের চোখ সচরাচর যেমন হয়, গর্ত নেই, তার বদলে লাল দুটি সার্চলাইট। আলো দুটো অনবরত ঘুরছে। কাঁধের ওপর ধবধবে একটা পৈতা।

অস্বীকার করব না, লোকে আমাকে খুবই সাহসী বলে জানত। আমি নিজেও ভূতপ্রেতের কাহিনিকে একদম পাত্তা দিতাম না। হেসে উড়িয়ে দিতাম। কিন্তু সে রাতে বেনেটির জঙ্গলে চোখের সামনে যে দৃশ্য দেখেছিলাম, তা জীবনে ভুলতে পারব না। সে কথা মনে হলে এখনও মাঝরাতে শিউরে উঠি।

ব্যাগটা আঁকড়ে ধরে আমি বিদ্যুৎবেগে ছুটতে আরম্ভ করেছিলাম।

'কিঁ হঁলরে, ছুঁটছিস কেঁন, কঁথাটা শুঁনে যাঁ।'

মনে হয়েছিল গলাটা যেন ক্রমেই কাছে আসছে। প্রত্যেক গাছের ডালে বিরাট আকারের সেই কঙ্কাল-পা।

নিশ্চিত মৃত্যু বুঝতে পেরে আমি পাগলের মতন ছুটতে শুরু করেছিলাম। কাঁটাগাছ লেগে হাত-পা ক্ষত-বিক্ষত, কতবার যে গাছের শিকড়ে পা আটকে পড়েছিলাম, তার ঠিক নেই।

তবু সেই নাঁকি সুর থেকে রেহাই নেই।

'ওঁরে তুঁইও বাঁমুন, আঁমিও বাঁমুন। তোঁকে কিঁছু কঁরব না। একটু দাঁড়া।'

বেনেটির জঙ্গল ছাড়িয়ে যখন সুনন্দবাবুর দরজায় পৌঁছেছিলাম, তখন রাতের অন্ধকার কেটে ভোর হচ্ছে। শরীরে আর একবিন্দু শক্তি অবশিষ্ট ছিল না। কোনোরকমে একবার দরজার কড়া নেড়েই অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম।

যখন জ্ঞান হয়েছিল, দেখলাম বিছানায় শুয়ে আছি। পাশে সুনন্দবাবু। একটা চেয়ারে ডাক্তার।

চোখ খুলতেই ডাক্তার বলল, 'আর ভয়ের কিছু নেই। একটু গরম দুধ খাইয়ে দিন। আমার সঙ্গে কাউকে পাঠান, ওষুধ নিয়ে আসবে।'

বিকালের দিকে শরীর ঠিক হয়ে গেল। বিছানার ওপরে উঠে বসলাম।

সুনন্দবাবু বলল, 'কী হয়েছে বুঝতে পেরেছি স্যার। বেনেটির জঙ্গলে দুর্লভ চক্রবর্তীর পাল্লায় পড়েছিলেন।'

'দুর্লভ চক্রবর্তী?'

'হ্যাঁ, আমাদের গাঁয়ের পুরোহিত। অপঘাত মরে বেচারি ব্রহ্মদৈত্য হয়ে রয়েছে। বামুন দেখতে পেলেই অনুরোধ করে, গয়ায় পিণ্ড দেবার জন্য।'

'অপঘাতে মারা গেছে?'

'হ্যাঁ স্যার। শুনুন বলি কাহিনিটা।'

সুনন্দবাবু বলতে শুরু করল—

সূচীপত্রে যান

'দুর্লভ চক্রবর্তী নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। আশপাশের গাঁয়ে পুজো, বিয়ে, পইতে, অন্নপ্রাশনের কাজ করে যা উপায় করতেন তাতেই তাঁর বেশ চলে যেত। বাড়িতে শুধু বউ আর একটা ছেলে। কিন্তু ভগবান মানুষকে সব সুখ দেন না। ছেলেটা বিশ্ববখাটে। লেখাপড়া করলই না। বদমায়েশির জন্য স্কুল থেকে নাম কেটে দিয়েছিল। বাপ বুঝিয়েছিলেন, আমার সঙ্গে চল বাড়ি বাড়ি, পুজোর কাজ শিখবি। ছেলে সেসব কথা কানেও তুলত না।

একদিন অবস্থা চরমে উঠেছিল। দুর্লভ চক্রবর্তীর জ্বর। অথচ গাঁয়ের জমিদার বাড়িতে নারায়ণ পূজা। জমিদারি আর নেই, কিন্তু জমিদার বাড়ি নামটা আছে। মাসকাবারি বন্দোবস্ত। ভালোই দক্ষিণা।

দুর্লভ চক্রবর্তী ছেলের খোঁজ করলেন। ছেলে নেই, ভোরে আড্ডা দিতে বেরিয়েছে। জমিদার বাড়ির লোক এসে চেঁচামেচি করে গেল।

ছেলে ফিরল দুপুর বেলা। দুর্লভ চক্রবর্তী কাঁথা জড়িয়ে দাওয়ায় বসেছিলেন রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে। ছেলেকে যাচ্ছেতাই গালাগাল করলেন। খড়ম ছুড়লেন। খড়ম ছেলের গায়ে লাগল না।

ছেলেটিও অকালকুষ্মাণ্ড। উঠানের ওপর একটা বাঁশ পড়েছিল, তাই তুলে নিয়ে সোজা বাপের মাথায়।

দুর্লভ চক্রবর্তী ছিটকে পড়েছিলেন। চারদিকে রক্তস্রোত। ছেলে নিখোঁজ।

কবিরাজ আসার আগেই সব শেষ। সেই থেকে দুর্লভ চক্রবর্তী বেনেটির জঙ্গলে বট গাছের ডালে বাসা বেঁধেছেন। কারও ক্ষতি করেন না। কেবল বামুন দেখলেই অনুরোধ করে গয়ায় পিণ্ড দেবার জন্য।'

অন্য সময় হলে আমি সুনন্দবাবুর কথাগুলো বিশ্বাসই করতাম না, কিন্তু কানে তখনই সেই নাঁকি সুর ভেসে আসছে। অঁ চাঁটুজ্যে মঁশাই, শোঁন, শোঁন। চোখ বন্ধ করতেই দেখতে পেলাম বীভৎস কঙ্কালমূর্তি! কাঁধে পৈতা, দুটি চোখে আগুনের গোলা।

শহরে ফিরে এসেই চাকরিতে ইস্তফা দিয়েছিলাম।

সূচীপত্রে যান

বিনোদ ডাক্তার

আমার চাকরিই এই রকমের। এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ঘুরে বেড়ানো। ব্যাঙ্কের হিসাব দেখা। কোথাও তিন-চার দিনেই কাজ হয়ে যায়, আবার কোথাও দিন কুড়িও লেগে যায়। এটা নির্ভর করে ব্যাঙ্কের হিসাবের জট কেমন পাকিয়েছে তার ওপর।

আগে ব্যাঙ্কের শাখা কেবল বড়ো বড়ো শহরেই থাকত। কিন্তু এখন চাষিদের সুবিধার জন্য আধা শহরে, গ্রামেও শাখা হচ্ছে। আমাকে বেশিরভাগ সময় এইসব আধা শহরেই যেতে হত।

এই ধরনের কাজে একবার বিরামপুরে যেতে হয়েছিল। সকালে অফিসে গিয়ে শুনলাম বেলা তিনটের গাড়িতে রওনা হতে হবে। আমার এক প্রস্থ বিছানা বাঁধাই থাকত। সুটকেস গুছিয়ে নিয়ে ট্রেনে চড়ে বসলাম।

বিরামপুর স্টেশনে যখন নামলাম সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। চারদিকে কেরোসিনের আলো জ্বলে উঠেছে। রাস্তায় লোকচলাচল বিশেষ নেই।

ব্যাঙ্ক থেকে একটি লোক আমায় নিতে এসেছিল। আমরা দুজনে সাইকেল-রিকশায় চড়ে বেশ কিছুটা গিয়ে একতলা লাল রঙের বাড়ির সামনে পৌঁছোলাম।

সঙ্গের লোকটি বলল, 'নামুন স্যার, এখানেই আপনার থাকবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

দু-খানা ঘর, মাঝখানে ছোটো উঠান, ওপাশে রান্নাঘর। একজনের পক্ষে যথেষ্ট।

দরজার কাছে একটি লোক বসেছিল। সে আমাদের দেখে উঠে দাঁড়াল।

ব্যাঙ্কের লোকটি বলল, 'স্যার, আপনার রান্নাবান্না, বাসন মাজা, ঘরদোর ঝাড়ামোছার কাজ এ-ই করবে।'

রাত ন-টার মধ্যেই খাওয়া শেষ করে শোবার আয়োজন করলাম। কাজের লোকটা চলে গেছে। এখান থেকে তার বাড়ি চার মাইল দূরে। আবার কাল ভোর ছ-টায় আসবে। শোবার মিনিট দশেকের মধ্যে পেটের যন্ত্রণা শুরু হল। অসহ্য যন্ত্রণা! শরীর একেবারে কুঁকড়ে যায়। মনে হয় দমবন্ধ হয়ে যাবে।

এরকম আমার মাঝে মাঝে হয়। সেইজন্য সবসময় ওষুধ কাছে রাখি।

হ্যারিকেনের শিখাটা বাড়িয়ে দিয়ে সুটকেসটা খুললাম। তন্নতন্ন করে খুঁজলাম। সর্বনাশ! ওষুধের শিশিটা ফেলে এসেছি। বেশ মনে আছে, শিশিতে গোটা আটেক বড়ি ছিল।

এখন উপায়! বিছানায় শুয়ে ছটফট করতে করতে হঠাৎ মনে পড়ে গেল, আসবার সময় কাছেই একটা ডাক্তারখানা চোখে পড়েছিল। ডাক্তারখানার নামটা অদ্ভুত। আরাম ঘর। তখন ডাক্তারখানা বন্ধ ছিল।

হাতঘড়িতে সময় দেখলাম ন-টা চল্লিশ। এত রাতে এই মফসসল শহরে ডাক্তারখানা কি খোলা থাকবে? যাই হোক, আমাকে একবার চেষ্টা করে দেখতেই হবে। যন্ত্রণা ক্রমেই অসহ্য হয়ে উঠছে।

যদি ডাক্তারখানা বন্ধ হয়ে গিয়েই থাকে, তাহলে খোঁজ করে দেখতে হবে ডাক্তার হয়তো ওই বাড়িতেই থাকে। দরজা ধাক্কা দিয়ে তাঁকে উঠিয়ে একটা ব্যবস্থা করতে বলতে হবে।

কোনোরকমে উঠে দরজায় তালা লাগিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম। চারদিক অন্ধকার। রাস্তার বাতিগুলো নিভিয়ে দিয়েছে।

দু-হাতে পেট চেপে প্রায় কুঁজো হয়ে এগিয়ে গেলাম। বরাত ভালো। আরাম ঘর খোলা। টিমটিমে আলো দেখা যাচ্ছে।

ঢুকতেই দেখা হয়ে গেল। পরনে কালো রং-এর সুট। কালো টাই। ময়লায় তেলচিটে অবস্থা। একমাথা পাকা চুল। প্রায় কাঁধ পর্যন্ত নেমে এসেছে। তোবড়ানো মুখ। দুটি চোখ রক্তের মতন লাল।

সূচীপত্রে যান

'কী চাই?'

রোগা চেহারা হলে হবে কী, বাজখাঁই গলার আওয়াজ। পেটের যন্ত্রণার কথা বললাম।

আমার কথা শেষ হবার আগেই ডাক্তার ধমক দিয়ে উঠল, 'বুঝেছি, বুঝেছি, অম্লশূল। বসুন, ওই বেঞ্চটায়।'

বসলাম।

ডাক্তার পিছনের কাচভাঙা আলমারি থেকে একটা শিশি বের করে কাগজে ঢেলে আমাকে দিল, 'খেয়ে নিন।'

তামাকের গুঁড়োর মতন কালো রং। বিশ্রী গন্ধ। ভয় হল, কেমন ডাক্তার জানি না, কী ওষুধ ঠিক নেই। খাওয়া কি ঠিক হবে?

'সন্দেহ হলে ফেলে দিন। খেতে হবে না।'

ডাক্তার গর্জন করে উঠল। টেবিল, বেঞ্চ, আলমারি সেই আওয়াজে থরথর করে কেঁপে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে আমি ওষুধটা গালে ঢেলে দিলাম।

কী আশ্চর্য, মিনিট পাঁচেকও লাগল না, ব্যথাটা একবারে সেরে গেল! জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনাকে কত দিতে হবে?'

আবার বোমা ফাটল।

'কে মশাই আপনি, বিনোদ ডাক্তারকে পয়সা দিতে চাচ্ছেন? কত লাখ টাকার মালিক আপনি? জানেন না, আমি পয়সা নিয়ে চিকিৎসা করি না।'

নিজের দোষ কাটাবার জন্য মৃদুকণ্ঠে বললাম, 'কিছু মনে করবেন না। আমি এখানে নতুন এসেছি। এসব জানা ছিল না। আপনার ডাক্তারখানা কতক্ষণ খোলা থাকে?'

'সারারাত,' বলেই বিনোদ ডাক্তার খিঁচিয়ে উঠল, 'আপনার আর কিছু দরকার আছে? না-থাকে তো উঠে পড়ুন! আমার অন্য রোগীরা আসবে।'

বাড়ি চলে এলাম। অনেক রাত অবধি বিনোদ ডাক্তারের কথা চিন্তা করলাম। ভালো ওষুধ হয়তো দেয়, কিন্তু মেজাজটা রুক্ষ। ভালোভাবে কথা পর্যন্ত বলতে পারে না।

দিন দুয়েক পর ব্যাঙ্কের হিসাব দেখতে দেখতে ম্যানেজার অনিলবাবুকে কথাটা বললাম।

'ছোটো জায়গা হলে কী হবে মশাই, এখানকার ডাক্তার একেবারে ধন্বন্তরি।'

'কার কথা বলছেন?'

'ওই যে আরাম ঘর-এর বিনোদ ডাক্তার।'

আমার উত্তর শুনে অনিলবাবু কিছুক্ষণ আমার দিকে একদৃষ্টে দেখল, তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'বিনোদ ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হল কোথায়?'

বললাম, 'দিন দুয়েক আগে পেটে একটা ব্যথা হয়েছিল। এরকম আমার মাঝে মাঝে হয়। বিনোদ ডাক্তারের একটা বড়িতেই সেরে গেলাম। আশ্চর্য ওষুধ!'

অনিলবাবু আর কিছু বলল না, কিন্তু লক্ষ করলাম সারাটা দিন আমকে যেন এড়িয়ে চলল।

ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না। বিনোদ ডাক্তার তার বদমেজাজের জন্য বোধ হয় এ এলাকায় কারও প্রিয়পাত্র নয়। এইজন্য অনিলবাবুও সম্ভবত তাকে পছন্দ করে না। তাই আমার বিনোদ ডাক্তারের কাছে যাওয়াটা অনিলবাবু ভালো চোখে দেখেনি।

কিন্তু আমার অবস্থা আমিই জানি। সারাটা রাত সেই নিদারুণ যন্ত্রণা সহ্য করে পরের দিনই অনিলবাবুর পছন্দসই ডাক্তারের জন্য অপেক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

দিন কয়েক পর হঠাৎই খেয়াল হল বিনোদ ডাক্তারের সঙ্গে একবার দেখা করে আসি। খাওয়াদাওয়া শেষ। গরমের জন্য ঘুমও আসছে না। আরাম ঘর তো অনেক রাত অবধি খোলা থাকে।

সূচীপত্রে যান

দরজায় তালা দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। রাস্তায় জনমানব নেই। এ সময় থাকবারও কথা নয়।

আরাম ঘর-এর কাছাকাছি যেতেই হাসির শব্দ কানে এল। অনেক লোকের মিলিত কণ্ঠের হাসি। খুব উচ্চরোলে।

তাহলে কি এই সময় বিনোদ ডাক্তারের বন্ধুরা আড্ডা জমায়? আড্ডা দেবার অদ্ভুত সময় তো!

সামনের দিকে কেউ নেই। আওয়াজ আসছে ভিতরের ঘর থেকে। ঘরও ঠিক বলা যায় না। আলমারি দিয়ে একটা ঘরই আলাদা করা।

কৌতূহল হল। দুটো আলমারির ফাঁক দিয়ে ভিতরে উঁকি দিলাম। পিঠের শিরদাঁড়া বেয়ে যেন বরফের স্রোত নেমে গেল। পা দুটো কেঁপে উঠল থরথর করে।

টেবিলের ওপর একটা কঙ্কাল শুয়ে। বিনোদ ডাক্তার স্টেথোসকোপ দিয়ে তার বুক পরীক্ষা করতে করতে বলছে, 'মগ ডালে ডালে বেড়িয়ো না, তোমার বুকের হাড় খুবই দুর্বল। কোনোদিন মট করে ভেঙে যাবে। প্লাস্টার করে শুইয়ে রাখব, তখন মজাটা টের পাবে।'

বিনোদ ডাক্তারের কথা শুনে কঙ্কালটার সে কী হাসি!

ওপরের দিকে চেয়ে দেখি একটা কঙ্কাল শূন্যে দোল খাচ্ছে।

বিনোদ ডাক্তার তার দিকে চেয়ে গম্ভীর গলায় বলল, 'রোজ এইরকম ব্যায়াম করবি, তবে দেহ মজবুত হবে।'

হঠাৎ হাসির শব্দে চোখ ফিরিয়ে দেখলাম, কোণের দিকে বেঞ্চের ওপর বসে একটা কঙ্কাল শিশি থেকে বড়ি নিয়ে অনবরত মুখে ফেলছে আর হাসছে। অদ্ভুত হাসি। ঠিক দুটো হাড়ে ঠোকাঠুকি করলে যেমন শব্দ হয়, তেমনই।

কঙ্কালটা হাসতে হাসতেই বলল, 'বিনোদ ডাক্তার তোমার চোগা চাপকান খুলে আমাদের মতন হালকা হও দেখি। তোমার গরমও লাগে না।'

কঙ্কালটা আচমকা থেমে গেল। আর কথা বলতে পারল না।

বিনোদ ডাক্তার বলল, 'কী হল হে?'

কঙ্কালটা অনেক কষ্টে উচ্চারণ করল, 'গলায় বড়িটা আটকে গেছে।'

বলেই কঙ্কালটা দুটো হাত দিয়ে নিজের গলাটা মোচড়াল। মাথাটা গলাসুদ্ধ তার হাতে খুলে এল।

সেটা বার কয়েক বেঞ্চে ঠুকেই বলল, 'ব্যস, বড়িটা নেমে গেছে।'

ব্যাপার দেখে আমার অবস্থা কাহিল। ভয়ে মুখ থেকে একটা আর্তনাদ বের হয়ে পড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে কঙ্কালগুলো সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, 'কে কে ওখানে?'

আমি আর তিলমাত্র দেরি না-করে ছুটতে শুরু করলাম। প্রাণপণ শক্তিতে। কোনোদিকে না-চেয়ে।

পিছনে অনেকগুলো হাড়ের খটমট শব্দ। ক্রমেই কাছে আসছে।

তাড়াতাড়ি তালা খুলে ঘরের মধ্যে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলাম। বুকটা দুপদুপ করছে। এখনই বুঝি দম বন্ধ হয়ে যাবে।

সারাটা রাত বিছানায় বসে কাটালাম। কেবল মনে হল খটখট শব্দ যেন বাড়ির চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এখনই হয়তো দরজায় কড়া নাড়বে। তারই বা দরকার কী? এরা তো দরকার হলে বন্ধ দরজার মধ্যে দিয়েই চলে আসতে পারে।

আমি খুব ভীতু এমন অপবাদ কেউ দেবে না। ভূত, আত্মা এসবে আমার চিরদিনই আস্থা কম। কিন্তু চোখের সামনে যে দৃশ্য দেখেছি, তাকে অস্বীকার করি কী করে?

ভোরের দিকে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। জোর খটখট শব্দে চমকে জেগে উঠলাম।

না, ভয়ের কিছু নেই। কাজের লোকটা দরজা ঠেলছে।

উঠে দরজা খুলে দিতে সে জিজ্ঞাসা করল, 'বাবুর কি শরীর খারাপ?'

সূচীপত্রে যান

'কেন বলো তো?'

'চেহারাটা কেমন দেখাচ্ছে। তা ছাড়া আপনি তো খুব ভোরে ওঠেন।'

ছোটো করে শুধু বললাম, 'রাত্রে ভালো ঘুম হয়নি।'

একটা সুবিধা, আজ রবিবার। ছুটির দিন। খাওয়াদাওয়ার পর সারাটা দুপুর ঘুমাব। তাহলেই শরীর ঠিক হয়ে যাবে।

কিন্তু আগের রাতে দেখা সেই বীভৎস দৃশ্য চোখের সামনে থেকে তাড়াব কী করে?

বিনোদ ডাক্তারের সম্বন্ধে সবকিছু আমাকে জানতেই হবে।

কাজের লোকটির নাম যোগেন।

যখন দুপুরে যোগেন ভাতের থালা রাখছিল তখন তাকে প্রশ্ন করলাম, 'আচ্ছা যোগেন, তুমি কতদিন এখানে আছ?'

'কোথায় বাবু?'

'এই বিরামপুরে।'

মাথা চুলকে যোগেন বলল, 'তা বিশ-বাইশ বছর হবে বাবু। কেন, বলুন তো?'

'তুমি বিনোদ ডাক্তারকে চেন?'

বিনোদ ডাক্তারের নামটা কানে যেতেই যোগেনের মুখের চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। চোখের দৃষ্টিতে ভয়ের ছাপ।

'চিনতাম বাবু। উনি এলাকার নামকরা ডাক্তার ছিলেন। ওঁর ওষুধ যেন কথা বলত।'

'ছিলেন বলছ কেন? এখন নেই।'

'না বাবু। বছর পাঁচেক হল মারা গেছেন।'

'সেকী!'

'হ্যাঁ, বাবু, চার বন্ধু মিলে পাশা খেলছিলেন, হঠাৎ ঝড় উঠেছিল। যেমন হাওয়ার জোর, তেমনই বৃষ্টির দাপট। কত বাড়ির চাল উড়ে গিয়েছিল, কত গাছ যে উপড়ে পড়েছিল, তার আর ঠিকঠিকানা নেই।

আরাম ঘরের পাশে বিরাট একটা বট গাছ ছিল। সেই বট গাছ শিকড়সুদ্ধ উপরে পড়েছিল আরাম ঘরের ছাদের ওপর। ব্যস, বিনোদ ডাক্তার আর তিন বন্ধু খতম। কেউ একটু চেঁচাবারও অবকাশ পাননি। শিকড়ের মধ্যে এমনভাবে চার বন্ধুর দেহ চাপা পড়ে গিয়েছিল, যে পরের দিন তাঁদের দেহ কেটে বের করতে হয়েছিল।

বাধা দিয়ে বললাম, 'কিন্তু আমি বিনোদ ডাক্তারকে যে দেখেছি।'

'অনেকেই দেখে বাবু। রাত বিরেতে আরাম ঘরের পাশ দিয়ে যাদের যেতে হয়, তারাই দেখেছে, বিনোদ ডাক্তার বন্ধুদের ওষুধ দিচ্ছে, কিংবা চারজনে মিলে পাশা খেলছে। তা ছাড়া দিনের বেলাতেও দেখা যায়, আরাম ঘরের সামনের বেল গাছটা, ঝড় নেই, বাতাস নেই, ডালপালাসুদ্ধু খুব দুলছে। ওই গাছেই ওঁদের বাস কিনা।'

কথা শেষ করে যোগেন দুটো হাত কপালে ঠেকাল।

চুপ করে শুনে গেলাম। অন্যসময় হলে যোগেনের একটা কথাও বিশ্বাস করতাম না, কিন্তু আমি নিজের চোখেই তো সব দেখেছি।

সেদিন বিকাল হতে, সূর্যের আলো থাকতে থাকতে বের হয়ে পড়লাম। উদ্দেশ্য, দিনের আলোয় ভালো করে আরাম ঘরটা দেখব। যদি সম্ভব হয়, বিনোদ ডাক্তারকেও দেখব। ওইখানেই তো ডাক্তারের আস্তানা।

আরাম ঘরের সামনে গিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

আরাম ঘরের দরজাই দেখা গেল না। তার সামনে আগাছার জঙ্গল। আকন্দ আর ফণীমনসার ঝোপে বোঝাই। বুঝতেই পারা যায়, বহুদিন এ দরজা খোলা হয়নি। খোলা সম্ভব নয়।

সূচীপত্রে যান

একটু এগিয়ে যেতে তক্ষক ডেকে উঠল। অস্বাভাবিক রুক্ষ স্বর। ঠিক যেন বিনোদ ডাক্তারের গলা।

পিছিয়ে আসতেই চোখে পড়ল।

চারদিক থমথমে। কোথাও ছিঁটেফোঁটা বাতাস নেই। অথচ সামনের বেল গাছের উঁচু দিকের কয়েকটা ডাল সবেগে দুলছে। ঠিক মনে হল, বিনোদ ডাক্তারের অশরীরী বন্ধুরা ব্যায়াম করছে নিজেদের দেহের খাঁচা ঠিক রাখার জন্য।

বাড়ি ফিরে এলাম। আরাম ঘরের কাছাকাছি থাকতে আর সাহস হল না। বিরামপুরেও নয়।

শরীর হঠাৎ খুব খারাপ হয়ে পড়েছে, এখানে থাকা সম্ভব নয়, এই কথা চিঠিতে লিখে যোগেনকে বললাম পরের দিন সকালে চিঠিটা ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের হাতে দিতে।

সন্ধ্যার ঝোঁকেই সাইকেল-রিকশা ডেকে বিছানা সুটকেস নিয়ে স্টেশনের দিকে রওনা হয়ে পড়লাম।

আমার পক্ষে বিরামপুরে থাকা আর সম্ভব নয়। আবার যদি কোনো রাতে পেটের যন্ত্রণা শুরু হয়, তাহলে যন্ত্রণায় পাগল হলে হয়তো সব ভুলে বিনোদ ডাক্তারের কাছে গিয়েই দাঁড়াব।

কিন্তু তার দেওয়া ওষুধ কি আর খেতে পারব? খেতে সাহস হবে?

সূচীপত্রে যান

রাত গভীর

দোষ আমারই। বন্ধুর বোনের বিয়ে। যাব আর খেয়ে চলে আসব, এই ঠিক ছিল। কিন্তু গিয়েই মুশকিলে পড়লাম। বন্ধু একান্তে ডেকে হাত দুটো ধরে বলল, 'উদ্ধার করে দে ভাই ভীষণ বিপদে পড়েছি।'

'কী আবার হল?'

'পাড়ার ছেলের দল পরিবেশন করবে ঠিক ছিল, কিন্তু তাদের মধ্যে একদল বেপাড়ায় জলসা শুনতে চলে গেছে। লোক কম। তোদের হাত লাগাতে হবে।'

'ঠিক আছে।' পাঞ্জাবি খুলে ফেললাম। তারপর কোমরে গামছা বেঁধে লেগে গেলাম কাজে। সব যখন শেষ হল, রাত বারোটা বেজে গেছে। নিজের আর কিছু মুখে দেবার ইচ্ছা ছিল না। একটু দই খেয়ে রাস্তায় যখন পা দিলাম তখন রাত বারোটা। বন্ধু বলছিল, নিমন্ত্রিদের কারও মোটরে উঠিয়ে দেবে।

কিন্তু রাস্তায় নেমে দেখা গেল, সবাই চলে গেছে। কোনো মোটর নেই। বন্ধুকে আশ্বাস দিলাম, আমি বড়ো রাস্তা থেকে একটা ট্যাক্সি ধরে নেব। সাড়ে বারোটা কলকাতার পক্ষে আর এমন কী রাত!

রাস্তার মোড়ে গিয়ে দেখলাম, এদিক-ওদিক ফাঁকা। যানবাহন তো নেই-ই, রাস্তা জন-মানবশূন্য। বরাত। আচমকা ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি শুরু হল। বিরক্তিকর বৃষ্টির ফাঁকে রাস্তার আলোগুলো বেশ নির্জীব। নিষ্প্রভ। পিছিয়ে একটা দোকানের আড়ালে দাঁড়াতে গিয়েই বিপত্তি।

একটা কালো কুকুর শুয়েছিল। দেখতে না পেয়ে একেবারে তার পেটের ওপর পা চাপিয়ে দিতেই কুকুরটা বিকট স্বরে চিৎকার করে উঠল। গেছি রে বাবা! লাফিয়ে রাস্তার কাছে আসতেই চোখে পড়ে গেল। অনেক দূরে থেকে একজোড়া আলো এগিয়ে আসছে। মরিয়া হয়ে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়ালাম। বাস, লরি, ট্যাক্সি প্রাইভেট গাড়ি যাই হোক না কেন, দু-হাত তুলে থামাব। তা না হলে সারাটা রাত এইখানে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, কিংবা পিছু হেঁটে নিমন্ত্রণ বাড়ি গিয়ে বন্ধুকে ঘুম তুলে বিব্রত করতে হবে।

আলো দুটো খুব ধীরে এগিয়ে আসছে। মাঝে মাঝে সন্দেহ হল, বুঝি-বা থেমেই আছে। আর এদিকে আসবেই না। পকেট থেকে রুমাল বের করে সবে ভিজে মাথাটা মুছে নিচ্ছি, আচমকা কর্কশ কণ্ঠস্বরে চমকে উঠলাম।

'কী মশাই, রাস্তার মাঝখানে নটরাজ নৃত্য দেখাচ্ছেন নাকি, তারপর চাপা দিলেই চটে যাবেন!' তাড়াতাড়ি রাস্তা থেকে সরে এসেই লক্ষ করলাম, একটা মিনিবাস। দূরের আলোজোড়া আর দেখা গেল না। তার মানে দূরের আলো দুটো এই মিনিবাসেরই। হঠাৎ খুব দ্রুত এসে পড়েছে।

'দাঁড়াও, দাঁড়াও, আমি উঠব।' মিনিবাস থামল। হাতল ধরে উঠে পড়লাম।

মিনিবাস একেবারে ফাঁকা। অবশ্য এই মাঝরাতেরও পরে যাত্রী আর পাবে কোথায়? পিছনের সিটে বসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। মাথাটা ভালো করে মোছা হয়নি। কোঁচার খুঁট খুলে জোরে জোরে মুছে নিলাম। আমার আবার সর্দির ধাত, মাথায় জল বসলেই বেদম কাশি শুরু হয়। মুখ তুলে দেখলাম, একটা ছোকরা আমার হাতে টোকা দিচ্ছে। দাদা টিকিটটা করবেন।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'ঢাকুরিয়া যাবে তো!'

'হ্যাঁ যাবে। যেতেই হবে।'

'কত ভাড়া?'

'তিন টাকা।'

সূচীপত্রে যান

'তিন টাকা! নব্বুই পয়সা করে যাই যে!' কথাটা বলেই বুঝতে পারলাম ঠিক বলিনি। দিনের বেলা যা রেট, এই মাঝরাতে দুর্যোগে সে রেট কখনো হতে পারে! বাড়তি পয়সা বোধ হয় ড্রাইভার কনডাক্টরের পকেটে যাবে। কোনো কথা না-বলে তিনটে টাকা এগিয়ে দিলাম। টিকিট দিতে দিতে লোকটা বলল, 'এ মিনিবাসে যেখানে যাবেন এক ভাড়া। সামনের স্টপেজে নামলে ওই তিন টাকা।' লোকটার সঙ্গে তর্ক করতে ইচ্ছা হল না। বলুক যা ইচ্ছে, মাঝরাতে যে পৌঁছে দিচ্ছে এই আমার ভাগ্য। সিটে হেলান দিয়ে বাইরের দিকে দেখলাম। সব ঝাপসা। কিছু দেখা যাচ্ছে না। মিনিবাস খুব জোরে ছুটছে। এত রাতে পথিক নেই, ট্রাফিক সিগন্যালের বালাই নেই, তাই এই বেপরোয়া গতি।

কিছুক্ষণ পর ঘুমে চোখ বুজে গেল। ঘুমিয়ে পড়লেও অসুবিধা নেই। লোকটা আমি কোথায় নামব জানে। ঢাকুরিয়া এলে ঠিক ডেকে দেবে। একসময় ঘুম ভাঙল। মিনিবাস একভাবে ছুটছে। চোখ হাতঘড়ির দিকে পড়তেই চমকে উঠলাম।

রাত আড়াইটে। যেভাবে মিনিবাস ছুটছে এতক্ষণে ঢাকুরিয়া পৌঁছে যাবার কথা। জিজ্ঞাসা করার জন্য এদিক-ওদিক দেখেই অবাক হলাম। মিনিবাস খালি। কেউ কোথাও নেই। 'অ মশাই, শুনছেন, ঠিক রুটে যাচ্ছেন তো? ঢাকুরিয়া পিছনে ফেলে এলেন নাকি?'

কোনো উত্তর নেই। আশ্চর্য, গেল কোথায় লোকটা! আমি যখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, তখন বোধ হয় মিনিবাস থামিয়ে লোকটা নেমে গেছে। কিন্তু এভাবে মাঝপথে কি নেমে পড়তে পারে?

ঝড়ের বেগে মিনিবাস ছুটছে। মনে হচ্ছে, মাঝে মাঝে চাকাগুলো যেন রাস্তাই ছুঁচ্ছে না। ঢাকুরিয়া কখন পার হয়ে গেছে। নীচু হয়ে দেখলাম। দু-পাশে ঘনজঙ্গল। জোনাকির বাহার। শহর ছাড়িয়ে গাঁয়ের মধ্যে দিয়ে কোথায় চলেছে মিনিবাস। আমি এগিয়ে সামনের সিটে গিয়ে বসলাম। ঝুঁকে পড়ে ড্রাইভারকে বললাম, 'দাদা, কোথায় চলেছেন জায়গাটার নাম কী?'

ড্রাইভার পিছন ফিরল না। গম্ভীর গলায় বলল, 'আমি বলব কী করে, কনডাক্টর ঘণ্টা না-দিলে আমি বাস থামাই কী করে?'

'কিন্তু ঘণ্টা দেবে কে? কনডাক্টর তো কখন নেমে গেছে।' এবার ড্রাইভার পিছন ফিরল।

'এই পেঁচি ভূতগুলোর কথা আর বলবেন না মশাই। এই আছে, এই নেই। এদের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করাই ঝকমারি।'

আমার মেরুদণ্ড বেয়ে শীতল প্রবাহ।

সমস্ত শরীর কেঁপে উঠল থরথরিয়ে। মানুষ নয়, নরকঙ্কাল! চোখের দুটো গর্তের মধ্যে লাল আলো শিখা। কথা বলবার সময় দাঁতগুলো মড় মড় করে উঠল। গলা দিয়ে ভয়ার্ত স্বর বের হল, 'আপনি?'

আবার ড্রাইভার হেসে উঠল। দু-হাতে পাশা নড়লে যেমন শব্দ হয় তেমনই আওয়াজ।

কঙ্কাল হাত দিয়ে ড্রাইভার একটা পৈতা তুলে ধরল, খানদানি ব্রহ্মদত্যি। বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ছিলাম। আমার সঙ্গে ওদের তুলনা। মরেওছি ব্রাহ্মণের হাতে। ড্রাইভার মুখ ফিরিয়ে আবার স্টিয়ারিং-এর দিকে নজর দিল।

'কী দাদা, লাফিয়ে বেড়াচ্ছেন কেন? টিকিট করেছেন?'

পিছন থেকে কনডাক্টরের কণ্ঠ।

লোকটা হঠাৎ এল কোথা থেকে। কিন্তু কোথায় লোকটা? শার্ট, প্যান্ট, কাঁধে ব্যাগ সব ঠিক আছে, শুধু লোকের চিহ্ন নেই। আচ্ছা মিনিবাসে উঠেছি তো! ভূতুড়ে বোধ হয়। এখন প্রাণ নিয়ে বাড়িতে ফিরতে পারলে হয়! পকেট থেকে টিকিট বের করে দেখালাম। গলায় সাহস এনে বললাম, 'কোথায় ছিলেন এতক্ষণ?'

'কোথায় থাকব? সিটের তলায় একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছিলাম। ঘুম হবার কী আর জো আছে!' তারপর লোকটা পাশে বসল। লোকটা বসল মানে, তার জামাকাপড় বসবার ভঙ্গি করল। 'আপনাকে কী বলছিল ভৈরব ভটচাজ?'

সূচীপত্রে যান

আমি অবাক। দেহ অদৃশ্য অথচ কণ্ঠস্বর কানে আসছে। জিজ্ঞাসা করলাম, 'ভৈরব ভটচাজ কে?'

'ওই যে বাস চালাচ্ছে। বামনাই দেখাচ্ছিল বুঝি? যে আসে তাকেই পৈতা তুলে দেখায়। আজকাল পৈতার কোনো মানসম্মান আছে না কি? ওর জন্যই তো আমার এই অবস্থা।'

'কী রকম?'

লোকটা ব্যাগটা কাঁধ থেকে কোলের ওপর রাখল। বেশ জুতসই হয়ে যেন বসল।

তারপর বলতে শুরু করল।

'স্টিয়ারিং ধরলে ভৈরবের আর জ্ঞান থাকে না। তখন মিনিবাস না উড়োজাহাজ কী চালাচ্ছে, ভুলেই যাই। কতবার সাবধান করেছি, কিন্তু কে শোনে কার কথা! পাঁচ-ছ-বছরের বাচ্ছার হাতে মুড়ির ঠোঙা, রাস্তা পার হচ্ছিল, দিলে তাকে চাপা। ব্যস, চারদিক থেকে লোক ঘিরে ফেলল। আধলা ইঁটের বৃষ্টি শুরু হল মিনিবাসের ওপর। চায়ের দোকান থেকে এক টিকিওলা বামুন বের হয়ে এল, হাতে লোহার রড, একেবারে সোজা ভৈরবের মাথায়। আর শব্দটি করতে হল না। স্টিয়ারিং-এর ওপর নেতিয়ে পড়ল। আমি দরজা দিয়ে পালাবার চেষ্টা করছিলাম, থান ইট এসে লাগল আমার চোয়ালে। বাপ বলে ডিগবাজি খেয়ে রাস্তার ওপর পড়লাম। সেই থেকে এই অবস্থা।

ভৈরব বামুনের হাতে গেছে, নিজে বামুন, তাই ব্রহ্মদত্যি। আর আমি—'

কথা আর শেষ হল না।

ভৈরব ভটচাজ হুংকার দিয়ে উঠল, 'দেখ গুপে, প্যাসেঞ্জারকে যা তা বোঝাতে যাস না। তুই তো বললি, সব ঠিক আছে, চালাও জোরে। বাবুদের অফিসের দেরি হয়ে যাবে।'

'খবরদার! কপালের নীচে অমন ড্যাবডেবে একজোড়া চোখ রয়েছে কীসের জন্য? রাস্তার লোকজন দেখতে পাও না? আমি বলব, তবে থামবে?'

এবারে ওদের চেহারা দেখা গেল। চেহারা মানে কঙ্কাল। চোঁচামেচি, হইচই শেষকালে হাতাহাতি। সর্বনাশ, ভৈরব ভটচাজ স্টিয়ারিং ছেড়ে বাসের ভিতরে হাত বাড়াল!

'আজ তোর একদিন, কী আমার একদিন। একবার ইটের ঘায়ে কাবার হয়েছিস, এবার আমার হাতে মরবি।'

গুপেও আস্তিন গুটিয়ে রুখে দাঁড়াল। আঙুলের হাড়গুলো মড় মড় করে উঠল। ব্যাগটা ছুড়ে ফেলে দিল বাসের মেঝের ওপর। 'বেশ, হয়ে যাক। দাদা বলে এতদিন কিছু বলিনি, কিন্তু আর মানুষ নই যে মিথ্যা কথা সহ্য করব অপমান গায়ে মাখব না। দেখি কার হাড়ে কত শক্তি।'

আমি মহা মুশকিলে পড়লাম। দুই কঙ্কালের মাঝখানে আমি। লড়াই হলে বেশিরভাগ চোট আমার ওপর দিয়েই যাবে।

স্টিয়ারিং ছেড়ে ভৈরব ভটচাজ ভেতরে চলে এসেছে। স্টিয়ারিং-এ কেউ নেই, অথচ ভূতুড়ে বাস উদ্দাম বেগে ছুটেছে। বুঝতে পারলাম, এখনই আশেপাশের দোকানের সঙ্গে কলিশন হবে। মিনিবাস চুরমার, সেই সঙ্গে আমিও।

অনেকগুলো উত্তেজিত কণ্ঠস্বর। কেউ ভৈরব ভটচাজের পক্ষ সমর্থন করছে, কেউ গুপীর। কিন্তু বাস তো খালি ছিল, এতগুলো লোক এল কোথা থেকে। মুখ ফিরিয়ে যা দেখলাম, তাতে আমার মাথার চুল সজারুর কাঁটার মতন খাড়া হয়ে উঠল। মনে হল বুকের টুকটুক শব্দ বুঝি বন্ধ হয়ে যাবে। একেবারে সামনের সিটে, আমার পাশে তখন হালদারের দাদামশাই। মাস দুয়েক আগে যিনি বাজার থেকে আসবার সময় বাসের চাকার তলায় একেবারে থেঁতলে গিয়েছিলেন। তার পিছনের লোকটিও আমার খুব চেনা। আমার অফিসের দপ্তরী। সে ক-দিন আগে অফিসের সামনে ট্রাম থেকে নেমে রাস্তা পার হবার সময় বাসের তলায় গুঁড়িয়ে ছাতু হয়ে গিয়েছিল। আর একজনকে চিনতে পারলাম। আমাদের ঝিয়ের সাত বছরের ছেলে রতন। সেও

সূচীপত্রে যান

মারা গেছে বাসের চাকায়। বাকি লোকগুলোকে ঠিক বুঝতে পারলাম না। তবে রক্তমাংসের মানুষ কেউ নয়, সবাই কঙ্কাল। বিকট চিৎকার আর হাড়ের হাততালির কানে তালাধরা শব্দ।

লড়ে যা ভৈরব। গুপী দেখি তোর মুরোদ। আর একদল চেঁচাচ্ছে, সাবাস গুপী, একটা আপার কাট। ভৈরবকে ঠান্ডা করে দে। একবার ভাবলাম, যা থাকে কপালে, বাস থেকে দিই এক লাফ। কিন্তু ছুটন্ত এই বাস থেকে লাফ দিলে নির্ঘাৎ মৃত্যু। তা ছাড়া নামবার জায়গা আটকেই তো যত মারামারি। হঠাৎ প্রচণ্ড একটা শব্দ। মনে হল, মিনিবাসটা দু-হাতে তুলে কে যেন আছড়ে ফেলল। হাড়ের খটাখট, কলকবজার ঝনঝনাৎ, সব লোকগুলো বুঝি তালগোল পাকিয়ে গেল।

আমি বিদ্যুৎগতিতে ছিটকে বাইরে গিয়ে পড়লাম। কতক্ষণ পড়েছিলাম জানি না। জ্ঞান হতে ব্যাঙের কর্কশ ঐক্যতান কানে এল। বুঝতে পারলাম, দেহের কোথায় চোট লেগেছে হাত বুলিয়ে দেখতে গিয়েই চমকে উঠলাম। একতিল মাংস কোথাও নেই, কেবল হাড় আর হাড়। স্বপ্ন দেখছি নাকি। চোখে হাত দিতেই হাত ভিতরে ঢুকে গেল। চোখ নেই, বিরাট দুটি গর্ত। অনেক কষ্টে কঙ্কাল দেহটা নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম।

সূচীপত্রে যান

সামন্ত বাড়ি

বাড়িটার দিকে চোখ পড়লেই গা ছম ছম করে। সমস্ত দরজা-জানলার কবজাগুলো বোধ হয় ভেঙে গেছে। একটু বাতাস হলেই বিচিত্র শব্দ হয়। ক্যাঁচ কোঁচ ক্যাঁচ।

বাড়িটার আদিকালে কী রং ছিল বলা মুশকিল। এখন বাইরের আস্তরণ খসে পাঁজর-প্রকট চেহারা। রন্ধ্রে রন্ধ্রে বট-অশত্থের চারা। ছাদের একদিকের কার্নিস সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে।

সামনে অনেকখানি জায়গা। গাঁয়ের বুড়ো লোকেরা বলে একসময়ে খুব চমৎকার ফুলের বাগান ছিল। সামন্তরা দেশবিদেশ থেকে নানা জাতের ফুলের গাছ এনে লাগিয়েছিল।

এখন ফুলের গাছের একটিও অবশিষ্ট নেই। হতশ্রী চেহারা। ভেরাণ্ডা, ঘেঁটু আর আকন্দ গাছের রাজত্ব। দু-একটা ঘোড়া-নিমও আছে।

আগে এই বাড়ি জমজমাট ছিল।

সামন্তর দুই ছেলে, দুই বউ, একঘর নাতিপুতি। এ ছাড়া কর্তা আর গিন্নি তো ছিলই।

সাতদিনে প্রায় সবাই উজাড়।

সামন্তর ছোটো ছেলে বউ নিয়ে বিদেশে ছিল, তাই কেবল তারাই বাঁচল। বাকি সবাই কলেরায় খতম। সাতদিনে এগারো জন, চাকরবাকর নিয়ে।

শুধু সামন্ত বাড়িরই নয়, গাঁয়ের বহু বাড়িতেই এক অবস্থা।

মড়া পোড়াবার লোক নেই। ঘরে ঘরে মড়া পচতে লাগল। গন্ধে টেকা দায়। দিন-দুপুরে শেয়াল আর কুকুর আধমরাদের নিয়ে টানাটানি শুরু করল।

তারপর অনেক দিন কেটে গেছে, সামন্তর ছোটো ছেলে আর দেশে ফিরে আসেনি। বাড়ি অযত্নে, সংস্কারের অভাবে একটু একটু করে আজকের অবস্থায় দাঁড়িয়েছে। এদিক দিয়ে পারতপক্ষে কেউ হাঁটে না।

অবশ্য এটা ঠিক যাওয়া-আসার পথও নয়। কেবল শনি আর মঙ্গলবার যে দু-দিন হাটবার, হাটে যারা কমলপুর থেকে জিনিস নিয়ে আসে তারা সামন্ত বাড়ির পাশ দিয়ে ফেরে। কমলপুরে ফেরবার তাদের আর একটা পথ আছে। কিন্তু সে অনেক ঘুরপথ। প্রায় অর্ধেক গ্রাম ঘুরে যেতে হয়। তাদের ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে যায়। সামন্ত বাড়ির পাশ দিয়ে তারা কোনোরকমে ছুটে পালায়। তবু কি নিস্তার আছে! সব কানে যায়।

হঠাৎ একতলার ঘরে আলো জ্বলে ওঠে। জোর আলো নয়, নীলচে দীপ্তির মৃদু আলো। হা হা করে হাসির আওয়াজ শোনা যায়। সেই হাসি শুনলে সাহসী জোয়ানেরও বুকের রক্ত শুকিয়ে যায়। অশরীরী হাসি। এ যেন কোনো মানুষের নয়। লোকেরা দু-কানে আঙুল দিয়ে প্রাণপণে জায়গাটা দৌড়ে পার হয়।

একবার বছর দুয়েক আগে সহদেব জেলে সাহস করে দাঁড়িয়ে পড়ে ব্যাপারটা দেখবার চেষ্টা করেছিল। ভাঙা পাঁচিল পার হয়ে একটু এগিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল।

বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনি। গোঁ গোঁ শব্দ করে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। সঙ্গীরা কেউ এগিয়ে আসেনি।

পরের দিন সকালে তার আত্মীয়স্বজন এসেছিল। সহদেবের ঠোঁটের দু-পাশে ফেনার রাশ। দেহে এত তাপ যে হাত রাখা যায় না।

কোনোরকমে ধরাধরি করে সহদেবকে বাড়ি নিয়ে গিয়েছিল।

তারপর সহদেব তিনদিন বেঁচে ছিল। এ তিনদিন চোখ খোলেনি। মাঝে মাঝে শুধু সারা দেহ কেঁপে উঠেছিল। মুখ দিয়ে অস্পষ্ট স্বর বের হয়েছিল— 'ভূ-ভূত! ভূ-ভূ-ত!'

সূচীপত্রে যান

তারপর বহুদিন কেউ আর ওপথ দিয়ে চলেনি। ঘুরে অন্য পথ দিয়ে যাওয়া-আসা করত।

অনেক দিন পর আবার কিছু স্বাভাবিক হয়ে এসেছিল। কিন্তু লোকেরা সন্ধ্যার আগেই সমান্ত বাড়ি পার হবার চেষ্টা করত।

সহদেব যে কী দেখেছিল, কেউ জানে না। জানবার কোনো উপায় ছিল না।

একবার কলকাতার এক ভদ্রলোক সামন্ত বাড়ি কেনবার জন্য এসেছিল। তার ইচ্ছা ছিল আশপাশের জমিতে ছোটোখাটো এক কারখানার পত্তন করবে আর বাড়িতে অফিস। তার সঙ্গে ম্যানেজার ছিল। দুজনে মিলে জমিজমা দেখতে দেখতে সন্ধ্যা হয়ে এসেছিল।

তাদের প্রথম সমস্যা হয়েছিল, সামন্ত বাড়ি যদি কেনাই ঠিক করে, তাহলে টাকাটা দেবে কাকে। প্রকৃত মালিক কে?

এক ভাগনে অবশ্য এসে খাড়া হয়েছে, কিন্তু সে প্রকৃত মালিক কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে।

কিন্তু কেনবার প্রশ্ন আর উঠল না।

বাগান পার হয়ে বাড়ির মধ্যে আসতে গিয়েই দুজনে থেমে গেল। একটা ঘোড়া নিম গাছের তলায় দাঁড়িয়ে একটা কঙ্কাল! তার একটা হাত ধীরে ধীরে আন্দোলিত হচ্ছে। কাছে ডাকছে— এইরকম ভাব।

তারপর দুজনে আর দাঁড়াতে সাহস পায়নি। দ্রুতবেগে ভাঙা পাঁচিলের ফাঁক দিয়ে রাস্তায় এসে পড়েছিল। কাঁটাগাছে দেহ ক্ষতবিক্ষত, পোশাক ছিন্নভিন্ন। বাড়ি কেনা তো দূরের কথা, তারা একেবারে স্টেশনে এসে থেমেছিল।

তারপর থেকে বাড়িটাকে কেউ আর সামন্ত বাড়ি বলত না, বলত— ভূতুড়ে বাড়ি।

সমস্ত গ্রাম নিস্তব্ধ হয়ে গেলে ভূতুড়ে বাড়ি থেকে আওয়াজ ভেসে আসত— খুট, খাট, খুট, খুট, খাট, খুট।

গ্রামের জনার্দন খুড়ো হাঁপানির জন্য রাতে ঘুমাতে পারতেন না। প্রায় সারা রাত দাওয়ায় বসে তামাক খেতেন। সেই শব্দ কানে যেতে বলতেন, 'ওই ভূতের নাচ শুরু হল। ওদের গায়ে তো এক তিল মাংস নেই, কেবল হাড়সম্বল। তাই খুট খুট আওয়াজ হচ্ছে।'

কথাগুলো তিনি বলতেন দিনের আলোয় চণ্ডীমণ্ডপে বসে। গ্রামের আর পাঁচজন মুরুব্বির সামনে, 'আরে বাপু, এরকম যে হবে, এ তো জানা কথা। নকুল সামন্তর বাড়ির কোনো মড়ার তো আর সদগতি হয়নি। করবে কে? তখন গাঁয়ের সব ঘরে এক অবস্থা। কে কাকে দেখে ঠিক আছে! মুখে জল দেবার যেমন লোক নেই, তেমনই মারা গেলে মুখে আগুন দেবার লোকেরও অভাব। সব মড়া ওই বাড়িতে পচেছে। কাজেই বাড়ির মায়াও ত্যাগ করতে পারছে না।'

মুখুজ্জেদের ত্রিলোচনদা বললেন, 'এক কাজ করলে হয়—'

'কী?

'পাড়ার চাঁদা তুলে গয়ায় পিণ্ড দিয়ে এলে হয়।'

চাঁদার কথা শুনে হারু মজুমদার হঠাৎ, 'কে রে? কে আম গাছে ঢিল ছোড়ে,' বলে পালিয়ে গেলেন।

অন্য সবাই বললেন, উত্তম প্রস্তাব।

বিধুবাবু প্রশ্নের খোঁচা তুললন, 'কিন্তু গয়া যাবে কে? তার খরচ?'

জনার্দন খুড়ো সে সমস্যারও সমাধান করে দিলেন, 'কেন, পরাশর গার্ড রয়েছে। মাসে দু-বার সে গয়া যায়। তার হাতে টাকাটা তুলে দিলেই হয়।'

আর এক ঝামেলা। ওই বিধুবাবুই তুললেন, 'কিন্তু পিতৃপুরুষের নামধাম কিছু তো জানা নেই, পিণ্ডদান হবে কী করে?'

সূচীপত্রে যান

'আরে পুরোহিতকে মূল্য ধরে দিলে সব ঠিক হয়ে যাবে। অন্য কারও পিতৃপুরুষ প্রক্সি দিয়ে দেবে। পিণ্ড দান নিয়ে কথা। প্রেতলোকে সবাই হাঁ করে আছে, একবার পিণ্ড পড়লেই দেখবেন ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে।'

তাই ঠিক হল। চাঁদাই তোলা হবে। কিন্তু কীভাবে? এখনই লোকের দরজায় খাতা নিয়ে ঘুরলে কেউই উপুড় হস্তও করবে না। পূজাপার্বণে দেখা গেছে বিশেষ চাঁদা ওঠে না। তবু সেখানে দেবদেবীর রোষের ব্যাপার আছে। এক্ষেত্রে সে সব আশঙ্কা নেই। সামন্তদের প্রেতাত্মা সামন্ত বাড়ি ছেড়ে গ্রামে চড়াও হবে এমন সম্ভাবনা কম।

সকলে ভেবেচিন্তে স্থির করল, সংকীর্তনের দল বের করবে। গ্রামে এরকম দল ছিলই। তারাই কাপড় পেতে গান গেয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরবে।

তাই করল।

মোট উঠল তিন টাকা বাইশ পয়সা। দুটো শশা, একটা কাঁঠাল, গোটা পাঁচেক আম। তাও সেই বাইশ পয়সার মধ্যে দুটো দশ পয়সা আবার অচল।

গ্রামের মাতব্বররা যখন এ ব্যাপারে চিন্তিত, সেই সময়ে ঢাকের শব্দ কানে এল।

এখন আবার ঢাকের আওয়াজ কেন?

পালাপার্বণের সময় নয়। শীতলা, মনসা পূজা হলে মাতব্বররা আগেই জানতে পারতেন। সবাই উৎকর্ণ হয়ে রইলেন।

গোটা চারেক গোরুর গাড়ি আলের পথ ধরে চলেছে। ঢাকের শব্দ আসছে প্রথম গোরুর গাড়ি থেকে।

মাতব্বররা এগিয়ে গেলেন।

গোরুর গাড়ির ছই-এর ওপর কাগজ লটকানো। দি দিগ্বিজয় যাত্রা পার্টি। প্রোপ্রাইটর পশুপতি ধাড়া।

এক গ্রাম থেকে বায়না সেরে কালনা ফিরে যাচ্ছে। ঢাকের আওয়াজ হচ্ছে বিজ্ঞাপন। পথে যদি কেউ বায়না করে। জনার্দন খুড়োই বললেন, 'এদের বায়না করলে হয়। আমোদপ্রমোদের ব্যাপারে তবু লোকে টাকা খরচ করে। আর এই অজ পাড়াগাঁয়ে কীই-বা আছে!'

বিধুবাবু হাত তুলে প্রথম গোরুর গাড়িটা থামালেন। বললেন, 'প্রোপ্রাইটর কোথায়? দেখা করব।'

গাড়ি থেকে একটি কয়লার বস্তা নামল। মাথায় চার ফিট, করমচালাল দুটি চোখ, পরনে ফতুয়া, ধুতি হাঁটুর ওপর। হেঁড়ে গলা যথাসম্ভব মিহি করে বলল, 'অনুমতি করুন আজ্ঞে। আমিই পশুপতি ধাড়া। প্রোপ্রাইটর, দি দিগ্বিজয় যাত্রা পার্টি।'

'কোথা থেকে আসছেন?'

'আসছি বীজপুর থেকে। মরবার সময় নেই। কেবল বায়নার পর বায়না। আমাদের মহীরাবণ বধ, সুরথ উদ্ধার, কুরুক্ষেত্র, কমলে কামিনী একেবারে বাছা বাছা পালা। লোকে এক রাতের জন্য বায়না করে নিয়ে যায়, সাত রাতের আগে ছাড়ে না।'

'আপনাদের রেট কীরকম?'

পশুপতি ধাড়া এদিক-ওদিক চোখ ফিরিয়ে বলল, 'এখানে কোথাও বসবার জায়গা নেই আজ্ঞে? এসব বৈষয়িক কথাবার্তা এভাবে দাঁড়িয়ে—'

কাছেই একটা বট গাছ ছিল। তলায় লাল সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো। বিধুবাবু বললেন, 'আসুন পশুপতিবাবু এখানে বসা যাক।'

সকলে বট গাছতলায় বসল।

'আমাদের রেট আজ্ঞে দু-শো টাকা।' পশুপতি কাজের কথা পাড়ল।

ত্রিলোচনবাবু চোখ কপালে তুললেন, 'বলেন কী? এ টাকায় তো কলকাতার দল আনা যায়।'

পশুপতি ধাড়া দু-হাতে পেট চেপে ধরে হাসতে হাসতে বলল, 'কলকাতার দল আর আমার দলে তফাতটা কোথায়? আপনারা পালা দেখুন তারপর টাকা দেবেন।'

সূচীপত্রে যান

অনেক দর কষাকষির পর এক-শো টাকায় রফা হল। এক-শো টাকা আর পালা ভালো লাগলে প্রোপ্রাইটরকে পান খেতে আরও দশ।'

পশুপতি ধাড়া হাঁক দিল, 'বিজে, এই বিজে!'

সারসের মতন লম্বা, শীর্ণকায় এক ছোকরা লাফ দিয়ে গোরুর গাড়ি থেকে নামল, গজ গজ করতে করতে। 'বিজে, বিজে, কেন আমার কি একটা ভালো নাম নেই?'

পশুপতি ধাড়া বলল, 'বাবুদের খান কয়েক প্রোগ্রাম দিয়ে দে।'

শীর্ণকায় পকেট থেকে প্রোগ্রামের বান্ডিল বের করে গোটা চারেক প্রোগ্রাম বিলি করল।

পশুপতি ধাড়া সকলকে একবার দেখে নিয়ে বলল, 'ওতে আমাদের ঠিকানা আছে। একটা পোস্টকার্ড ফেলে দিলেই পেয়ে যাব। যেদিন আপনাদের দরকার তার অন্তত মাস খানেক আগে আমাকে জানাবেন, নইলে সম্ভব হবে না, বায়নার পর বায়না কিনা।'

জনার্দন খুড়ো বললেন, 'আমরা এ মাসের শেষে, ধরুন সতেরোই রাত্রে চাই। শনিবার আছে, শহরে যেসব বাবুরা কাজ করে সবাই বিকেলে চলে আসবে। আসর ভরে যাবে। কোন পালাটা আপনাদের ভালো?'

'বললাম যে আমাদের সব পালাই এসকেলেন্ট।'

'এক্সসেলেন্ট।' জনার্দন সংশোধন করে দিলেন।

'ওই আজ্ঞে। আসরে বাবুরা বলেন কিনা। একটু থেমে পশুপতি ধাড়া আবার বলে, 'কুরুক্ষেত্রই দেখুন তা হলে। আমার দুর্যোধনের পার্ট যারা একবার দেখেছে, তারা জীবনে ভুলবে না। আসরে হইচই পড়ে যায়।'

শীর্ণকায় বলল, 'আর আমার ছিকেষ্ট? পার্ট দেখে কোতলপুরের বাবুরা একবার বাঁশ দিয়েছিলেন।'

'বাঁশ? বাঁশ কেন?' ত্রিলোচনবাবু ঊর্ধ্বলোচন হয়ে শুধান।

বিজে ব্যাখ্যা করল, 'মানে বাঁশি তৈরি করার জন্য। সবাই বললে, এ একেবারে আসল ছিকেষ্ট। বাঁশি ছাড়া মানায় না।'

'আঃ বিজে, ভদ্রলোকদের কথার মধ্যে তোর নাক গলাতে আসা কেন?' পশুপতি বিরক্ত।

'আবার বিজে! আপনি কি আমাকে বিজিতেন্দ্র মোহন বলে ডাকতে পারেন না?'

পশুপতি ধাড়া রুখে উঠল, 'হ্যাঁ, ডাকব ওই নামে। আমার একে বাঁধানো দাঁত!'

'ঠিক আছে আমাদের কী করতে হবে বলুন?' জনার্দন বুড়ো মনে করিয়ে দিলেন।

পশুপতি বললে, 'এই, খাতাটা গাড়ি থেকে নিয়ে আয়।'

শীর্ণকায় গাড়ির দিকে ছুটল।

ইতিমধ্যে গাড়ি থেকে অনেক লোক নেমে দাঁড়িয়েছে। কেউ আলের ওপর। কেউ গাছের ছায়ায়। খেরো বাঁধানো লাল খাতা এল। গ্রামের তরফ থেকে জনার্দন খুড়ো সই করলেন। তখন পশুপতি ধাড়া বলল, 'এবার কিছু অগ্রিম দিতে হবে আজ্ঞে।'

'অগ্রিম?'

'এই রেওয়াজ।'

গ্রামের মাতব্বররা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করলেন। বিধুবাবু বললেন, 'কার কাছে কত আছে?'

কুড়িয়ে বাড়িয়ে পাঁচ টাকা হল। সেই পাঁচ টাকাই জনার্দন খুড়ো এগিয়ে দিলেন। বললেন, 'নিন, আগাম রাখুন।'

হাত থেকে টাকাটা নিয়ে পশুপতি ধাড়া বলল, 'বড্ড কম হয়ে গেল আজ্ঞে। দলের বিড়ির খরচও হবে না।'

'ঠিক আছে। বাকিটা যাত্রা শেষ হলে ভোর রাতে দেব।'

পশুপতি ধাড়া দু-হাত জোড় করে সকলকে নমস্কার করে উঠে পড়ল।

চারটে গোরুর গাড়ি আবার চলতে শুরু করল।

সূচীপত্রে যান

গ্রামের মাতব্বররা কোমর বেঁধে চাঁদা আদায় শুরু করল।

তারা ঠিক করেছিল, কোনোরকমে দেড়-শো টাকা যদি ওঠাতে পারে, তাহলে যাত্রা পার্টিকে এক-শো টাকা দিয়ে, পঞ্চাশ টাকা থাকবে পিণ্ডদানের জন্য।

বরাত ভালো, প্রায় দু-শো টাকা উঠে গেল।

প্রথমে অনেকেই ভেবেছিল, টাকা পয়সা দেবে না, ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে যাত্রা শুনবে। তারপর শুনল কড়াকড়ি ব্যবস্থা হবে, বিনামূল্যে দেখার সুবিধা নেই। তা ছাড়া উদবৃত্ত অর্থ গয়ায় পিণ্ডদানে খরচ হবে, তখন আর কেউই দ্বিরুক্তি করল না।

জনার্দন খুড়ো প্রোপ্রাইটরকে পোস্টকার্ড ছেড়ে দিলেন।

যেখানে হাট বসে, বিলের ধারের মাঠ, সেখানটাই পরিষ্কার করা হল যাত্রার আসরের জন্য। পাড়ার উৎসাহী ছেলেরা গাছে গাছে হাতে লেখা প্ল্যাকার্ড আটকে দিল :

আসিতেছে, আসিতেছে, আসিতেছে!

বহুদিন পরে আনন্দ সংবাদ!

দি দিগ্বিজয় যাত্রাপার্টির যুগান্তকারী সৃষ্টি

'কুরুক্ষেত্র'!!

আগামী সতেরই বৈশাখ, হাটতলার মাঠে।

সবই ঠিক হল, শুধু একটু ভয় ছিল। কালবৈশাখীর সময় ঝড়বৃষ্টি হলেই মুশকিল।

তবে একটা ভরসার কথা এই যে, এবার ঝড়বৃষ্টির জোর কম।

আসরের দিন তিনেক আগে পশুপতি ধাড়া একবার সরেজমিনে তদারকে এল।

পোস্টার দেখে একটু গম্ভীর। বলল, 'সবই করলেন, প্রোপ্রাইটরের নামটা দিলেন না? দি দিগ্বিজয় যাত্রা পার্টির পরিচয়ই তো এই পশুপতি ধাড়া।'

তারপর যাত্রার আসর কোথায় হবে, কোথায় সাজঘর, সব দেখল। জনার্দন খুড়োকে বলল, 'খাবার ব্যবস্থা কী হবে? আমাদের লুচি মাংস ছাড়া গলা খোলে না।'

জনার্দন খুড়ো পরিষ্কার বললেন, 'লুচি মাংস পারব না। ঢালাও খিচুড়ির বন্দোবস্ত করব। তার সঙ্গে মাছ ভাজা। আপনাদের লোক ক-জন?'

'তা সব নিয়ে সাতাশ-জন।'

'ঠিক আছে, অসুবিধা হবে না। আরম্ভ করবেন ন-টায়?'

'উঁহু ন-টায় নয়, দশটা। দশটা থেকে ভোর চারটে। একেবারে জমজমাট ব্যাপার। দেখবেন এই সময়ের মধ্যে লোকে হাঁ করতে ভুলে যাবে। বিশেষ করে মহামানী দুর্যোধনের পার্ট দেখে।'

'দুর্যোধনের পার্ট কে করে?'

পশুপতি ধাড়া পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে হাসল। কোনো উত্তর দিল না।

সতেরোই বৈশাখ। রাত দশটায় যাত্রা আরম্ভ, সাতটা থেকে হ্যারিকেন হাতে লোক আসতে শুরু করল দলে দলে। ভিন গাঁয়ের লোকেরাও এসে ভিড় করল। তাদের আটকানো গেল না।

যাত্রার লোকেরা সাজতে শুরু করেছিল ছ-টা থেকে। নির্বিবাদে সাজবার জো আছে। গাঁয়ের ছেলের পাল সাজঘরে উঁকিঝুঁকি দিয়ে বিরক্ত করছিল। দুর্যোধনের গোঁফই পাওয়া গেল না। পাড়ার কোন ছেলে সরিয়ে ফেলেছিল। আবার গোঁফের ব্যবস্থা হল।

প্রায় সকলের সাজ হয়ে যেতে পশুপতি ধাড়ার খেয়াল হল, আরে বিজেটা গেল কোথায়; তার ছিকেষ্টর মেক-আপ বেশ টাইম নেবে।

খোঁজ, খোঁজ, এদিক-সেদিক সবাই খুঁজতে লাগল।

সূচীপত্রে যান

বেশ কিছুক্ষণ পর পাওয়া গেল। গাঁয়ের এক ছেলেই আবিষ্কার করল। এক পাকুড় গাছতলায় নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাচ্ছে।

পশুপতি ধাড়া প্যাকিং বাক্সের ওপর বসে বিড়ি খাচ্ছিল, খবর শুনে তেতে লাল। বললে, 'বালতি করে জল নিয়ে বিজেটার মাথায় ঢেলে দাও। নির্ঘাৎ গাঁজা টেনে মরেছে।'

জল ঢালতে হল না। দুঃশাসন আর ভীম তার দুটো হাত ধরে হেঁচকা টান দিয়ে তুলল। বিজে জড়ানো গলায় বলল, 'একী বাবা, স্বর্গেও অশান্তি? বিষ্টুর সঙ্গে একটু প্রাইভেট কথা বলছিলাম, তাতেও বাধা?'

অবশ্য কিছুক্ষণের মধ্যেই বিজে ধাতস্থ হল। মেক-আপ নিতে বসে গেল।

দশটায় যাত্রা আরম্ভ হবার কথা, শুরু হল সাড়ে দশটায়।

যাত্রা বেশ জমে উঠেছিল। দুর্যোধন বার দুয়েক হাততালি পেল। তা পশুপতি ধাড়াকে মানিয়েছেও চমৎকার। বাজখাঁই গলায় খুব চেঁচাচ্ছে।

গোলমাল শুরু হল শ্রীকৃষ্ণ আসরে ঢুকতে। ঢোকা ঠিক নয়, শ্রীকৃষ্ণ শুয়েই ছিল। পায়ের কাছে অর্জুন, শিয়রে দুর্যোধন।

পালায় আছে শ্রীকৃষ্ণ কপট নিদ্রা ত্যাগ করে উঠে প্রথমে অর্জুনকে দেখতে পাবে, যদিও দুর্যোধন আগে থেকে বসে আছে।

কনসার্ট চলছে।

বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল। শ্রীকৃষ্ণের ওঠার কোনো লক্ষণ নেই।

লোকেরা অধৈর্য হয়ে উঠছে।

দুর্যোধন সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে প্রমাদ গনল। কপট নয়, শ্রীকৃষ্ণের আসল নিদ্রা চলেছে! নাসিকা গর্জনের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। কনসার্টের জন্য সে আওয়াজ অবশ্য আসরে পৌঁছাচ্ছে না। কনসার্ট থামলেই শোনা যাবে।

ফিস ফিস করে দুর্যোধন বলল, 'এই বিজে, বিজে, উঠবে না কি? লোক কতক্ষণ বসে থাকবে?'

শ্রীকৃষ্ণ গভীর নিদ্রামগ্ন।

দুর্যোধন আর পারল না। এভাবে চললে তো রাত কাবার হয়ে যাবে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধটা আর হবে কখন? হাতটা বাড়িয়ে শ্রীকৃষ্ণের ঘাড়ে মোক্ষম এক চিমটি কাটল সে।

'ওরে বাপ, কী ছারপোকা! ঘুমোবার উপায় আছে!' শ্রীকৃষ্ণ লাফ দিয়ে উঠল।

সারা আসর হেসে খুন।

দুর্যোধনবেশী পশুপতি ধাড়া পাকা অভিনেতা। মানিয়ে নেবার চেষ্টা করে বলল, 'কেন পরিহাস করছেন যদুপতি, আমি আপনার দেহে অঙ্গ সঞ্চালন করছিলাম।'

কিন্তু যদুপতি তখন নেশায় মশগুল। বললে, 'বাপস, ওর নাম অঙ্গ সঞ্চালন! আমার শরীরে কালসিটে পড়ে গেছে!'

আসর হেসে গড়িয়ে পড়ল।

এরপর সে দৃশ্য আর জমবার কথা নয়। কোনোরকমে শেষ করা হল।

সাজঘরে গিয়ে পশুপতি ধাড়া বিজের গলা টিপে ধরল, 'তোকে আজ খুন করে ফেলব। কতদিন না বলেছি গাঁজা টেনে আসরে নামবি না। দিগ্বিজয় যাত্রা পার্টির একটা প্রেস্টিজ নেই?'

সবাই মিলে বিজেকে ছাড়িয়ে নিল। টিপুনির চোটে বিজুরও কিছুটা জ্ঞান ফিরে এসেছিল। সে বলল, 'আর এমনটি হবে না। দেখ না, সব সিন কেমন জমিয়ে দিই!'

তারপর গোটা দুয়েক সিন শ্রীকৃষ্ণ ভালোই করল।

সূচীপত্রে যান

এক জায়গায় একটু গোলমাল করে ফেলেছিল, কিন্তু সামলে নিয়েছে। সেই যেখানে অর্জুন মুহ্যমান, সামনে আত্মীয়কুটুম্ব দেখে কিছুতেই লড়াই করতে চাইছে না, আর শ্রীকৃষ্ণ তাকে উত্তেজিত করছে, তাতেও সফল না-হয়ে জ্ঞানের বাণী আওড়াবে, সেই দৃশ্যটায়।

অর্জুন তো যথারীতি একেবারে ঠান্ডা। গাণ্ডীব ফেলে দিয়ে হেঁটমুণ্ডে দণ্ডায়মান। তখন শ্রীকৃষ্ণ হাঁ করল। বিরাট এক হাঁ।

পালায় আছে, সেই হাঁ দেখে অর্জুন বিহ্বল। সৃষ্টি-লয় সবকিছু সেই মুখের গহ্বরে। সবকিছুর কারণ শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন নিমিত্ত মাত্র। এইখানে অর্জুনের বেশ লম্বা বক্তৃতা ছিল।

শ্রীকৃষ্ণ, 'কী দেখছ?' বলার পর অর্জুন 'পোজ' নিয়ে দাঁড়িয়েছিল মুখের বিস্মিত ভঙ্গি করে। বিশ্বরূপ দর্শন করছে!

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের নেশা বোধ হয় তখনও পুরো কাটেনি। তাই সে আবার বলল, 'কী দেখছ ধনঞ্জয়, টনসিল?'

বলেই তার চেতনা হল। সামলে নিয়ে নিজের পার্ট বলতে আরম্ভ করল। ভাগ্য ভালো, জোর বাজনা চলায় টনসিলটা আসরের কেউ শুনতে পেল না।

এ সিনটা উতরে গেল।

এরপর শ্রীকৃষ্ণের লম্বা বিরাম। দুর্যোধনের ঊরু-ভঙ্গের সিন, তাকে আসরে নামতে হবে। ভীমকে ইঙ্গিত করবে দুর্যোধনের ঊরুতে অন্যায়ভাবে গদা দিয়ে আঘাত করতে।

গরম পড়েছে অসহ্য। গাছের একটি পাতাও নড়ছে না। ময়ূরের পাখা লাগানো মুকুটটা খুলে রেখে বিজে একটা টুলের ওপর বসল। একটা হাতপাখা নিয়ে নিজেকে বাতাস করতে লাগল। ঠিক সেইসময়ে সামনে দ্রৌপদী। তার আর বিশেষ পার্ট নেই। একেবারে শেষ সিনে শুধু দাঁড়ানো। দ্রৌপদীর হাতে কলকে। শ্রীকৃষ্ণের দিকে ফিরে বলল, 'হবে নাকি এক ছিলেম?'

বিজের মনশ্চক্ষে পশুপতি ধাড়ার মূর্তি ভেসে উঠল। সে মাথা নেড়ে বলল, 'না ভাই, পার্ট গোলমাল হয়ে যাবে।'

দ্রৌপদী হেসে উঠল, 'দূর চাষা কোথাকার! এতে পার্ট আরও খোলে। গলার আওয়াজ ভরাট হয়।'

'তাই নাকি, তবে দাও, একটান টানি।' বলে শ্রীকৃষ্ণ হাত বাড়িয়ে কলকেটা নিল।

এক টান নয়, বেশ কয়েক টান দিয়ে দ্রৌপদীকে যখন কলকে ফেরত দিল, তখন শ্রীকৃষ্ণের অবস্থা কাহিল। তার ধারণা হল, সে এ গাঁয়ের জমিদার। দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। তারই আনন্দের জন্য সখীরা নাচগান করছে।

বেশিক্ষণ চোখ খুলে থাকতেও পারল না। চোখ বুজে ফেলল।

হঠাৎ মনে হল কে যেন তাকে জোরে জোরে ধাক্কা দিচ্ছে। অস্পষ্ট কার কণ্ঠস্বর। 'এই বিজে, তোর সিন এসেছে রে। ঊরুভঙ্গের সিন।'

'অ্যাঁ!' বিজে চোখ খুলল।

'নে ওঠ, গদাযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে।'

ঠক, ঠকাস ঠক।

ভীম আর দুর্যোধন গদাযুদ্ধ চালিয়েছে। সেই সঙ্গে আস্ফালন।

এতক্ষণে বিজে উঠে দাঁড়াল। বিজেকে উঠে দাঁড়াতে দেখে যে ধাক্কা দিয়েছিল সে সরে গেল।

দাঁড়িয়ে উঠে বিজের মাথাটা বড়ো হালকা লাগল। মাথায় শিখিপুচ্ছসুদ্ধু মুকুট ছিল, সেটা খেয়াল হল। সামনে থেকে মুকুটটা তুলে নিয়ে মাথায় পরে শ্রীকৃষ্ণ দ্রুতপায়ে আসরে গিয়ে দাঁড়াল।

সঙ্গে সঙ্গে হা হা হো হো দর্শকদের মধ্যে যেন হাসির বন্যা বইতে লাগল। থামবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না।

সূচীপত্রে যান

এই ঘোরতর গদাযুদ্ধে হাসির কী খোরাক থাকতে পারে সেটা ভীম আর দুর্যোধনের কেউ বুঝতে পারল না।

গদাযুদ্ধটা খুব জমেছিল। আসর একেবারে নির্বাক। সূচ পড়লেও বুঝি শব্দ শোনা যেত।

কায়দা করে দুর্যোধন গদাটা তুলে কয়েক পা পিছিয়ে গেল হাসির কারণ জানবার জন্য। শ্রীকৃষ্ণের দিকে দৃষ্টি পড়তেই দুর্যোধনের দুটো চোখ ছানাবড়ার সাইজ হয়ে গেল।

ছলনাময় শ্রীকৃষ্ণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মৃদু মৃদু হাসছে। মাথায় প্লাস্টিকের বালতি।

যাত্রার শেষে মুখের রং তোলবার ব্যবস্থা। গোটা তিনেক বালতি বসানো ছিল। দরকারের সময় পুকুর থেকে জল নিয়ে আসতে হবে। নেশার ঘোরে শিখিপুচ্ছের মুকুট ভেবে বিজে নীল রঙের প্লাস্টিকের বালতিটা মাথায় পরেছে।

এই সিনে দুর্যোধনের দারুণ পার্ট। পশুপতি ধাড়া তিনবার যে মেডেল পেয়েছিল, এই সিনের জন্য। শ্রীকৃষ্ণের ইঙ্গিতে ভীম অন্যায়ভাবে তার ঊরুভঙ্গ করবে, সেইসময় শ্রীকৃষ্ণের প্রতারক, মিথ্যাচারী, কপট, ঈশ্বর নামের কলঙ্ক প্রভৃতি বলে দুর্যোধন দীর্ঘ বক্তৃতা দেবে। সারা আসর হাততালিতে ফেটে পড়ে।

হতভাগা বিজের জন্য সব মাটি!

দুর্যোধন আর পারল না। গদা উঁচিয়ে বলল, 'তবে রে কুষ্মাণ্ড, আজ তোর একদিন কী আমার একদিন! তোকে খুন করে ফাঁসি যাব!'

গদাটা তুলোর নয়। পশুপতি ধাড়া অনেক যত্ন করে কাঠের গদা তৈরি করিয়েছে। তার ওপর কালো রংয়ের প্রলেপ।

বিজে জানে, ওই গদার এক ঘা পিঠে পড়লে মেরুদণ্ড একেবারে ছাতু হয়ে যাবে।

বিজে 'ওরে বাবারে, মেরে ফেলবে রে!' বলে ঝাঁপ দিয়ে আসরে পড়ল। জনার্দন খুড়ো আর বিধুবাবু বসেছিলেন মঞ্চের আসনের দিকে। দুজনের মাঝখানে গড়গড়া। নলটা জনার্দন খুড়োর কোলের ওপর। বিজে গিয়ে পড়ল গড়গড়ার ওপর। গড়গড়া কাত। কলকে ছিটকে পড়ল বিধুবাবুর ফতুয়ার ওপর। তুবড়ির মতন আগুনের ফুলকি ছড়িয়ে পড়ল।

'ওরে বাপস! বলে বিধুবাবু লাফাতে আরম্ভ করলেন। বিজে ততক্ষণে পগার পার!

পশুপতি ধাড়াও ছাড়বার পাত্র নয়। গদা ঘোরাতে ঘোরাতে সগর্জনে তার পিছনে ছুটল।

গাঁয়ের মাতঙ্গিনী দিদি তখন গোলমেলে ব্যাপার দেখে সরে পড়বার চেষ্টা করছিল। তার পক্ষে সরে পড়া একটু কষ্টকর। কারণ, ওজন প্রায় সাড়ে তিন মণ। রাস্তা দিয়ে গেলে দূর থেকে মনে হত যেন একটা জালা গড়াতে গড়াতে চলেছে। ছেলেরা একবার তাকে শহরে নিয়ে গিয়েছিল সিনেমা দেখানোর জন্য। কিন্তু টিকিট কেটে বিপদ। মাতঙ্গিনী একটা সিটে ধরে না। নানানরকম কসরত করা সত্ত্বেও। তারপর ম্যানেজারকে বলে একটা টুলের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সেই মাতঙ্গিনীর সঙ্গে পশুপতি ধাড়ার ধাক্কা।

দুজনে দু-দিকে ছিটকে পড়ল!

ধুলো ঝেড়ে পশুপতি ধাড়া যখন উঠে বসল, তখন বিজে বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে। মাতঙ্গিনীর মুখ দিয়ে গালাগালির ফোয়ারা ছুটল, 'মুখপোড়া, চোখের মাথা খেয়েছিস? ভীমের সঙ্গে লড়ছিলি, নেমে এসে মেয়েমানুষের সঙ্গে লড়াই করতে লজ্জা করে না? লড়বি তো আমাকেও একটা গদা দে, দেখি তোর কত হিম্মত!'

এসব কথা পশুপতি ধাড়া কানে নিল না। এখানে দেরি হলে বিজেটা চোখের আড়ালে চলে যাবে। গদা ঘোরাতে ঘোরাতে পশুপতি ধাড়া ছুটল।

বিজে দাঁড়িয়ে একটু দম নিচ্ছিল, হঠাৎ পশুপতি ধাড়াকে আসতে দেখে সে আবার ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াল।

সামনেই সামন্ত বাড়ি।

ভিতর থেকে শব্দ আসছে খুট, খুট, খুট।

সূচীপত্রে যান

সামন্ত বাড়ির ভৌতিক ব্যাপার সম্বন্ধে বিজের কিছুই জানা ছিল না। সে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ভাঙা পাঁচিলের মধ্যে দিয়ে ভিতরে গিয়ে ঢুকল।

পিছনে গদা হাতে পশুপতি ধাড়া।

দরজাটা বোধ হয় ভেজানো ছিল। ঠেলতেই খুলে গেল।

এদিকে যাত্রার আসরে বিরজা মল্লিক বসেছিল। থানার অফিসার-ইন-চার্জ। অর্জুন, কুন্তী আর দ্রৌপদী তাঁকে এসে ধরল, 'স্যার, বিজেকে বাঁচান! প্রোপ্রাইটর খেপলে জ্ঞান থাকে না। একেবারে খতম করে দেবে। আপনি দয়া করে উঠুন, স্যার!'

বিরজা মল্লিক উঠল। শুধু ওঠা নয়, ছুটতে আরম্ভ করল। বিরজা মল্লিক ছুটতে, যাত্রার আসরে পিছনে বসা দুজন পুলিশও ছুটল। স্যারের পিছনে ছোটা তাদের চিরকালের অভ্যাস।

সামন্ত বাড়ির সামনে এসে বিরজা মল্লিক একটু ইতস্তত করল, তারপর বিজে আর পশুপতিকে ঢুকতে দেখে, ঢুকে পড়ল। অগত্যা পুলিশ দুজনও।

বিজে ঢুকতেই দেখল সামনে একটা কঙ্কাল। কঙ্কালের দুটো চোখে আগুনের শিখা। কঙ্কাল ঠেলে বিজে পিছনে চলে গেল।

এদিকে বিজেকে দেখেই পশুপতি ধাড়া যে গদা ছুড়ে মেরেছে, সেটা তীব্রবেগে কঙ্কালের ওপর এসে পড়ল। কঙ্কাল গুঁড়িয়ে চূর্ণবিচূর্ণ।

এতক্ষণ ঘরের মধ্য থেকে যে খুটখাট শব্দ আসছিল, সেটা বন্ধ হয়ে গেল।

'তুই কোথায় পালাবি দেখি। পাতালে ঢুকলেও তোকে আমি টেনে বের করব। তোর জন্য দি দিগ্বিজয় যাত্রাপার্টির ইজ্জত আজ ধুলোয় মিশেছে। তোকে শেষ করে তবে আমি অন্নজল স্পর্শ করব!'

এ ঘরে হ্যাজাকের আলো জ্বলছিল, চেঁচামেচি হতেই কে আলো নিবিয়ে দিল। সব অন্ধকার।

ভিতরে অনেকগুলো লোকের পায়ের শব্দ। মাঝে মাঝে পশুপতি ধাড়ার গদার আঘাত। সেই সঙ্গে আর্তনাদ, 'ওরে বাবারে, গেলুম রে!'

বিরজা মল্লিক বিপদে পড়ল। বিজে হয়তো খুনই হয়ে গেল। পশুপতি ধাড়া যেভাবে গদা ঘোরাচ্ছে, কিছুই বিচিত্র নয়।

হঠাৎ তার নিজের কোমরে গোঁজা টর্চ আর রিভলবারের কথা মনে পড়ে গেল। এক হাতে টর্চ টিপল। অন্য হাতে রিভলবার বাগিয়ে ধরল। টর্চের আলোতে সব দেখে বিরজা মল্লিকের চক্ষুস্থির।

বিজে কোথাও নেই। গদার আঘাতে জনতিনেক লোক পড়ে আছে। তাদের পরনে কালো গেঞ্জি আর কালো পাজামা। পশুপতি ধাড়ার জ্ঞান নেই। সবেগে গদা ঘুরিয়ে চলেছে সে।

টর্চের আলো ঘুরিয়ে বিরজা মল্লিক এদিক-ওদিক দেখল।

এক কোণে কালো রঙের একটা মেশিন। পাশে ছোটো সাইজের অনেক বাক্স। গোলমেলে ব্যাপার বুঝতে বিরজা মল্লিকের একটুও দেরি হল না। লোকগুলোর দিকে রিভলবার লক্ষ করে বলল, 'উঠে দাঁড়াও তিনজনে, যদি বাঁচতে চাও।'

তিনজনে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল। ততক্ষণে মোটা লাঠি হাতে পুলিশ দুজনও এসে হাজির হয়েছে।

'কীসের মেশিন ওটা?'

একজন ভীত কণ্ঠে বলল, 'আজ্ঞে নোট ছাপাবার।'

'ও, এখানে তাহলে নোট ছাপানো হয়। তাই লোককে ভূতের ভয় দেখিয়ে তাড়াবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কঙ্কালের চোখে লাল কাগজ আটকে ভয় দেখাবার চেষ্টা! জাল নোট ছাপাবার কারবার চলেছে।'

'আমরা কিছু জানি না হুজুর, মালিক জানে।'

'চোপরাও! এই, বাঁধো তিনজনকে পিছমোড়া করে।'

পুলিশরা এগিয়ে গিয়ে তিনজনকে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে ফেলল। পশুপতি ধাড়া তখনও গদা ঘুরিয়ে চলেছে।

সূচীপত্রে যান

'আঃ, কী হচ্ছে মশাই, গদা থামান!' বিরজা মল্লিক কড়া ধমক দিল। পশুপতি থতমত খেয়ে গেল।

বিরজা মল্লিক এগিয়ে গিয়ে ছোটো বাক্সগুলো খুলল।

কোনোটাতে পাঁচ টাকার নোট, কোনোটাতে দশ। সবই অবশ্য জাল।

বিরজা বলল, 'পশুপতিবাবু, আপনি এ সবের সাক্ষী। জবর একটা কেস পাকড়াও করা গেছে। কিন্তু আর একজন সাক্ষী পেলে হত। বিজুবাবু কোথায়?'

'বিজেটাকে আমিও খুঁজে পাচ্ছি না।' পশুপতির স্বীকারোক্তি।

বিরজা মল্লিক পশুপতি ধাড়ার কথায় চিন্তিত হয়ে পড়ল। 'তাই তো, এ ঘরের একটাই তো দরজা। সে দরজা আগলে আমরা দাঁড়িয়ে আছি। কোথায় যেতে পারেন বিজুবাবু?'

টর্চের আলো ঘরের চারদিকে ফেলে বিরজা মল্লিক চেঁচাল, 'বিজুবাবু, কোথায় আপনি?'

ক্ষীণকণ্ঠ ভেসে এল, 'এই যে আমি ওপরে।'

বিরজা মল্লিক চমকে উঠে টর্চের আলো ওপর দিকে ফেলে দেখল, কড়িকাঠে বাঁধা একটি দড়ি ধরে বিজে বিপজ্জনকভাবে ঝুলছে।

'নেমে আসুন মশাই!'

'কী করে নামব?'

'যেভাবে উঠেছেন।'

'কীভাবে উঠেছেন জানি না। গদার ভয়ে উঠে পড়েছি।'

এদিক-ওদিক দেখে বিরজা মল্লিক দেখতে পেল, জানলার পাশে মোটা একটা পাইপ ছাদ পর্যন্ত উঠেছে। বোঝা গেল, ভয়ে জ্ঞানশূন্য হয়ে এই পাইপ বেয়ে বিজে উঠে পড়ে ওই দড়ি আশ্রয় করেছে। বিরজা মল্লিক পুলিশদের দিকে ফিরে বলল, 'এই, ওকে নামাবার ব্যবস্থা করো।

বিরজা মল্লিক তো বলে খালাস, কিন্তু কড়িকাঠ থেকে বিজেকে নামাবে কী করে?'

বুদ্ধি করে একজন পুলিশ মেশিনের ওপর উঠে পড়ল। আর একজন তাকে চেপে ধরল। মেশিনের ওপর দাঁড়ানো পুলিশ দুটো হাত বাড়িয়ে বলল, 'নিন, ঝাঁপ দিন, কোনো ভয় নেই।'

বিজে চেঁচাল, 'রাম, দুই, তিন।'

তারপর হাত ছেড়ে দিয়ে একেবারে পুলিশের কোলে।

বিরজা মল্লিক বলল, 'এই যে বিজুবাবু, আপনিও একজন সাক্ষী। এখানে একটা সই করুন।'

বিজে বলল, 'আমার নাম বিজিতেন্দ্র মোহন নায়ক। কোথায় সই করতে হবে বলুন।'

পুলিশ দুজনকে সামন্ত বাড়িতে রেখে বিরজা মল্লিক তিনজনকে বেঁধে নিয়ে গেল। পিছন পিছন পশুপতি ধাড়া আর বিজে।

কিছুটা এসে পশুপতির খেয়াল হল, 'আরে আমার গদাটা ফেলে যাচ্ছি যে। আমার এত সাধের গদা।'

বিজে বলল, 'আর আমার শিখিপুচ্ছ, মানে প্লাস্টিকের বালতি।'

সূচীপত্রে যান

লাল নিশানা

কচুপাতার ওপর ঘন মাকড়সার জাল। মাদার গাছের তলাটা ঝুপসি অন্ধকার। কচুরিপানা ঢাকা মজা ডোবাটার ওপর বাঁশঝাড়গুলো নুয়ে নুড়ে পড়েছে। দু-একটা বাঁশ জলের বুকও ছুঁয়েছে। ডোবাটার ধারে ধারে কলমিদামের জঙ্গল।

তিনদিন ধরে সমানে বৃষ্টি শুরু হয়েছিল। জুইফুলি বৃষ্টি নয়, একেবারে মুষলধারায়। জল পেয়ে মানগুলো দিব্যি লকলকিয়ে উঠেছে। পিঁপড়ের সার চলেছে ডিম মুখে নিয়ে। এখনও আকাশের মুখ অভিমানের মেঘে ভরা। মনে হচ্ছে, একটু নাড়া পেলেই বুঝি ঝরঝর করে বর্ষণ শুরু করবে। সন্ধ্যার অনেক আগেই সন্ধ্যার অন্ধকার নেমেছে চারপাশে। ঝিঁঝি ডাকছে একটানা। ব্যাঙের গোঙানি মাঝে মাঝে। একটু পরেই জোনাকিরা বেরোবে আলোর পশরা নিয়ে।

বসে বসে থেকে শিবানীর আর ভালো লাগল না। উঠে পড়ল ঘাস বন থেকে। দুটো হাত মাথার ওপর তুলে একবার আড়মোড়া ভাঙল। ঝোপের পাশ দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখল। সদরের উঁচু পাঁচিলটা দেখা যাচ্ছে। সদরের দরজার কিছুটা। ওপরের ঘরে আলো জ্বলছে। টিমটিমে আলো। ভালো করে দেখাও যায় না।

এক হাতে ঘাসগুলো সরাতে সরাতে শিবানী আরও একটু এগিয়ে এল। ডোবার ঘাট বরাবর।

ঘাট মানে শান-বাঁধানো চাতাল নয়, নারকোলের গুঁড়ি ফেলা। গুঁড়িগুলো শ্যাওলায় সবুজ হয়ে আছে। একটু পা পড়লে আর দেখতে হবে না। একেবারে কাদায় পুঁতে যাবে। ডোবার মতন জল ডোবাটায় নেই এই বর্ষকালেও নয়।

খুব চেনা পথ। কতবার বাসনের গোছা নিয়ে বউটি এই ডোবায় এসেছে। ঝি কামিনি না এলে বউটিই আসত বাসন মাজতে। তা না হলে, আর কে আসবে। বুড়ি শাশুড়ি ভালো করে চোখে দেখতে পেতেন না। একটা চোখে ছানি পড়েছে। ওপর-নীচে চলাফেরা করতেই মুশকিল হত।

ভাঙাচোরা বাড়ি। শ্বশুরের আমলের না মেরামত, না কলি ফেরানো। মেরামত করবেই বা কে? এই একটি মাত্র ছেলে। শিবরাত্রির সলতে। তেজও সলতেরই মতন। মিটমিটে আলো। পার্কিনসন কোম্পানির একেবারে ঘনিষ্ঠ কেরানি। দুনিয়ার যত চিঠিপত্র এসে জমা হয়। সেগুলো খাতায় টুকে সেকশনে সেকশনে পাঠাতে হয়। মাইনে পঁচাশি, তার মধ্যে ট্রেনের মান্থলি বাবদ যায় সাত টাকা। তার ওপর জলখাবারের ব্যাপার আছে। যেটুকু বাকি থাকে, তাতে তিনজনের গ্রাস আর আচ্ছাদন দুটো চলে না।

আর কিছু না থাক, নামের জোর আছে। নাম বাসব। চেহারা আর ঐশ্বর্য কোনোটাতেই ইন্দ্রত্বের ছাপ নেই। কাজেই ও বাড়ি মেরামত করা বাসবের সাধ্য নয়। তিনটে লোকের ভরণপোষণ চলে না ভালো করে, অথচ শাশুড়ির দিনরাত নাকে-কাঁদুনির কামাই নেই। আর একটা বাড়তি প্রাণীর দরকার। আর একজন না হলে সংসার বেমানান।

প্রথম প্রথম বউকে আড়ালে ডেকে শাশুড়ি জিজ্ঞাসা করতেন। খোঁজখবর নিতেন। নতুন অতিথির আসার সম্ভাবনাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করতেন। বউয়ের মাথা নাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজের কপাল চাপড়াতেন।

এ হল প্রথম পর্ব।

গাব গাছে হেলান দিয়ে শিবানী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল। দ্বিতীয় পর্বের অবস্থা আরও মারাত্মক। রাজ্যের শিকড়-বাকড়, মাদুলি-তাবিজ বউয়ের হাতে উঠল। হাত নাড়াই দুষ্কর। প্রতিবাদ করা বৃথা।

গাঁয়ের কোনো সাধু সন্ন্যাসী এসেছেন খবর পেলেই শাশুড়ি টেনে নিয়ে যেতেন বউকে। ছানির অস্পষ্টতা কোনো বাধার সৃষ্টি করতে পারত না।

সূচীপত্রে যান

কিন্তু তবু কিছু হল না। এবারে অন্তিম পর্ব। সে পর্বের চেহারা দেখে বউটি শিউরে উঠল। এতদিন শুধু শাশুড়ি পিছনে লেগে ছিলেন, এবার তাঁর ছেলেও তৎপর হয়ে উঠল।

চায়ের কাপ নিয়ে ঢুকতে গিয়েই বউটি চৌকাঠের কাছে দাঁড়িয়ে পড়ল। ঘরের মধ্যে মা আর ছেলের তাকে নিয়েই আলোচনা চলেছে।

'তুমি আর কী করবে বা, মাদুলি-তাবিজ কত আর বাঁধবে হাতে? বউ তোমার বাঁজা, আমি কলকাতার ডাক্তার বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ করেছি।'

ডাক্তার বন্ধু মানে লেজার সেকশনের পীতাম্বর মুখুটি। লেজারও লেখে আবার অবসর সময়ে হোমিয়োপ্যাথি করে। একেবারে অব্যর্থ। বড়োবাবুর মেজোছেলের নাকের ওপর বিশ্রি একটা আঁচিল গজাচ্ছিল; ক-ডোজ থুজায়ে সে আঁচিল নিশ্চিহ্ন হল। নিবারণবাবুর শাশুড়ির হাঁপানি, যায় যায় অবস্থা, ছ-ফোঁটা ডিজিটালিসে একেবারে অসাধ্যসাধন। ওষুধ পেটে পড়বার পরের দিনই সেই শাশুড়ি হাওড়া থেকে হেঁটে মেয়ের বাড়ি বালিতে গিয়ে উঠেছিলেন।

আলাপটা বাসর তাঁর সঙ্গেই করেছিল। পীতাম্বর মুখুটি বাসবের বউয়ের চেহারার বর্ণনা, চলাফেরা, কথাবার্তার ধরন সব শুনে গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন। অনেক পীড়াপীড়ির পর শুধু বলেছিলেন, ওই স্ত্রীর দ্বারা তোমার বংশ রক্ষা হবে না বাসু। তুমি অন্য পত্নী গ্রহণ করো। ক্ষুণ্ণ হবার কিছু নেই। এ বিষয়ে শাস্ত্রে বিধান আছে।

পীতাম্বর মুখুটি শাস্ত্রও আওড়েছিলেন। অফিসশুদ্ধ সবাই অবাক। এই একটি অসাধারণ লোক, লেজারের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। হানেমাতা, চন্দ্রশেখর, কালী, মহেশ ভট্টাচার্য, বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ সব একেবারে নখদর্পণে। তামাম শ্লোক কণ্ঠস্থ।

ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি শুরু হল। ডোবার কচুরিপানার পাতায় পাতায় টুপটাপ শব্দ। বাঁশের বনে ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ। সে সন্ধ্যায় বউটি চায়ের কাপ সামলে ধীরে পায়ে রান্নাঘরে ফিরে এসেছিল।

চা না-পেয়ে কিছুক্ষণ পর বাসব চায়ের খোঁজে যখন রান্নাঘরে ঢুকেছিল তখন বউটি বলেছিল, 'ওগো আমাকে একবার কলকাতায় নিয়ে যাবে?'

'কলকাতায় কেন?' বাসব ভ্রূ কুঁচকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল।

'একবার ডাক্তার দেখাব।'

'ডাক্তার?' বুঝেও না বোঝার ভান করল বাসব।

'হ্যাঁ, কেন আমার এমন অবস্থা তাই দেখাব। আমার স্বাস্থ্য তো এমনিতে খারাপ নয়। কোনো শক্ত অসুখবিসুখও নেই। তবে?'

বাসব হেসেছিল, 'ভগবানের সঙ্গে লড়াইয়ে ডাক্তারকে হারতেই হবে।'

'তার মানে?'

মানেটা আর বাসব খুলে বলেনি। আস্তে আস্তে সরে গিয়েছিল সেখান থেকে। বউটি অনেকক্ষণ আর মুখ তুলতে পারেনি।

লজ্জা নয়, সংকোচ নয়, একটা দারুণ দাহে অস্থি পুড়ে যেন ছাই হয়ে গিয়েছিল।

অনেকদিন দুজনের মধ্যে কথা বন্ধ ছিল। বউটি যাও-বা দু-একবার কথা বলতে চেষ্টা করেছিল, দারুণ ঔদাসীন্যের ভাব দেখিয়ে বাসব তাকে এড়িয়ে গেছে।

সারাটা দুপুর তক্তপোশে উপুড় হয়ে বউটি কেঁদেছে। নামজানা সমস্ত দেবতাকে স্মরণ করেছে মনে মনে। একটি পৃথক সত্ত্বা, দুজনের মিলিত স্পর্শে আর একটি প্রাণের দীপ্তি প্রার্থনা করেছে আকুলভাবে।

কিন্তু আকুল আবেদনের সাড়া মেলেনি।

চুপি চুপি ঠাকুরঘরে গিয়ে মাথা খুঁড়েছে। পাষাণ বিগ্রহের ভাবান্তর ঘটেনি।

সূচীপত্রে যান

বুকের ব্যথা বুকে চেপে সংসার করেছে বউটি। শাশুড়ির সেবা, স্বামীর সোহাগ খেতে খেতে চমকে উঠেছে মাঝে মাঝে। অন্য কথা মনে এসেছে। ভেবেছে, যে লোকটি এত কাছে এসে একান্ত হয়ে ভালোবাসার মিষ্টি কথা শোনাচ্ছে, সেই একদিন চোখের সামনে দিয়ে অন্য লোকের হয়ে যাবে। আর একজনকে সোহাগ করবে ঠিক এমনিভাবে। ভাবতে ভাবতে দু-চোখ ভরে গেছে জলে। আঁচল দিয়ে চোখ চেপে স্বামীর আলিঙ্গন থেকে অব্যাহতি পাবার চেষ্টা করেছে।

শিবানী আরও একটু এগিয়ে এল। এখান থেকে সদর দরজাটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করা। এ ছাড়া আরও একটি দরজা আছে পিছন দিকে। খিড়কি দরজা। সেটা খুললেই আর একটি পুকুর। চারধারে সুপুরি গাছের বাহার। সে পুকুর বাসবদের নয়, মজুমদারদের। কাকচক্ষু জল। প্রত্যেক মাসে শ্যাওলা পরিষ্কার করা হয়। ঝাঁঝি তোলা আর আগাছা ওপড়ানোও হয়।

সেই পুকুরেই বাসবরা স্নান করা, কাপড় কাচা সব করত। খাবার জলও ভরত সেখান থেকে। সেই ঘাটের চাতালে বসে কতদিন বউটি গভীর রাত পর্যন্ত কেঁদেছে। গুমরে গুমরে কান্না। সে কান্না শোনার জন্য কেউ জেগে থাকেনি। কারও ব্যগ্র হাত ছুটে আসেনি, বউটিকে বাড়ির মধ্যে নিয়ে যাবার জন্য।

নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করেছে। একবার নয়, বহুবার।

একী সত্যি, তার স্বামী আবার একজনকে অঙ্কশায়িনী করবে। মন্ত্র পড়ে, এতদিন একসঙ্গে বাস করে, আদর যত্ন কিংবা তার ভালো করে যাকে কাছে কাছে রেখেছিল, যে তার দ্বিতীয় সত্ত্বার মতন, তাকে এক মুহূর্তে সরিয়ে দেবে একপাশে। অবহেলার আর্বজনায়।

আর একজনকে বসাবে তার জায়গায়, একই বাড়িতে দুজনে থাকবে। হয়তো পাশাপাশি নতুন মিলনের খিলখিল হাসি কান পেতে শুনতে হবে। চুরি করে দেখবে দুজনের মদির কটাক্ষ বিনিময়। বউটির প্রথম বিবাহিত জীবনের দৃশ্যগুলো আবার পুনরাভিনীত হবে, অবশ্য কেবল নতুন নায়িকা নিয়ে।

অথচ বউটির কী দোষ? এতটা শাস্তি পাবার মতন কোন অপরাধ সে করেছে?

বাসব বেশ গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। নেহাত দায়সারা গোছের উত্তর। তাও দু-একটা কথায়। মনে হল, বাসব কী-একটা যেন ভাবছে। নতুনভাবে, নতুন মানুষ নিয়ে কেমন করে জীবন শুরু করবে, সেই কথাই কি?

একটা সবুজ ফড়িং অনেকক্ষণ ধরে কচুপাতার ওপর বসবার চেষ্টা করছিল, কিন্তু কী ভেবে বসতে গিয়েও বসছিল না। এলোমেলো হাওয়ায় কচুপাতাগুলো দুলছে, সেইজন্যই বুঝি ফড়িংটা ভয় পাচ্ছে। সেদিনও বউটি এমনই ভয় পেয়েছিল। সমস্ত সংসারটা যেন দুলছিল। মানুষগুলোও অস্থির চিত্ত। কারুর ওপর নির্ভর করা যায় না। অবলম্বন করা যায় না কাউকে। সবাই চাইছে, পুরোনো মানুষ সরে গিয়ে নতুন মুখ আসুক। এক অপূর্ব কলকাকলীতে ভরে উঠুক সংসার। ছোটো দুটি মুঠির বাঁধনে গোটা সংসারটা বাঁধুক। একদিন বউটি লুকিয়ে লুকিয়ে ভাজকে একটা চিঠি লিখেছিল। বাপের বাড়ির দিকে ফিরে চাইবার মতন তার কেউ ছিল না। বাপকে ভালো করে তার মনেই পড়ে না। অস্পষ্ট একটা ছবি দেখে আবছা একটা রূপ কল্পনা করে নেয়।

মাকে দেখেছে। জীর্ণ, রোগক্লিষ্ট চেহারা। দু-পা চলতে গেলে হাঁপায়। মাসের মধ্যে অর্ধেক দিন খাওয়াদাওয়া বন্ধ। ঘরের কোণে ছেঁড়া কম্বল জড়িয়ে শুয়ে থাকত।

সংসার করার সাধ তার মিটে গিয়েছিল। সুস্থ থাকলে কেবল ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাত, মেয়েটিকে কোনোরকমে পার করে দাও ঠাকুর। আর কিছু চাই না। বেশি কিছু চাইবার মতন বরাতও করে আসেনি। দু-বেলা দু-মুঠো খেতে পায় আর পরনের কাপড় জোটে তা হলেই হবে।

বউটির মা বুঝি একটা কথা প্রার্থনায় জানাতে ভুলে গিয়েছিল। ভাত কাপড়ই শেষ কথা নয়, শান্তি—শান্তি যেন পায় মেয়েটা। একবেলা খাবার জুটুক ক্ষতি নেই, পরনের বসন শতচ্ছিন্ন হলেও ক্ষোভের কিছু নেই, কিন্তু যদি সুখ না থাকে, মনে আনন্দ না থাকে, তাহলে জীবনের হাজার সম্পদ বরবাদ হয়ে যায়।

মা যেন বিয়েটা দেখার জন্যই বেঁচেছিল। বিয়ে হয়েছিল মাঘ মাসে, মা গেল বৈশাখে। শেষ সময়ে মেয়ে মাকে একবার চোখের দেখাও দেখতে পায়নি।

সূচীপত্রে যান

ভাই বদলি হয়েছিল জামালপুরে। মা ছেলের কাছে দেহ রেখেছিল। এখন ভাই জামালপুরে নয়, পাটনায়। বউটি সেখানেই চিঠি দিল।

চিঠিটা ভাজকে উদ্দেশ করেই লিখল, কিন্তু আসল লক্ষ্য দাদা। দাদা যেন পড়ে এবং একটা বিহিত করে। নাহলে বউটিই বা যাবে কোথায়! কার দিকে চাইবে?

এদের, মানে এবাড়ির হালচাল যেন ভালো লাগছে না। কেমন একটা থমথমে ভাব। ভালো করে কেউ কথা বলে না। কেবল এধারে-ওধারে ফিসফিস পরামর্শ। বউটি গেলেই সব থেমে যায়। ওরা কথা বলার ভান করে।

আসল কথাটার আভাসও তার মানে?

মানে, তুমি যদি প্রশ্ন করো, 'আজ রাতে আকাশের নক্ষত্রের সংখ্যা কত?'

'বলতে পারব না। কারণ সংখ্যাটা আমারই জানা নেই।'

'চালাকি রাখো। দেবে তো উত্তর?'

'প্রশ্নটা করেই দেখো না।'

বউটি বাসবের গা ঘেঁষে শুতে শুতে বলেছিল, 'তুমি নাকি আবার বিয়ে করবে? পাত্রীও নাকি ঠিক হয়ে আছে?'

কয়েক মিনিটের নিস্তব্ধতা। বাসব চুপচাপ রইল। তারপর পাশ ফিরতে ফিরতে বলল, 'মাঝে মাঝে তোমার মাথায় বুঝি ভূত চাপে?'

'আজই শুনে এলাম।'

'কার কাছে?'

'চাটুজ্জেদের ন-বউ এসেছিল আমার কাছে।' একটুও না-থেমে বউটি বলেছিল।

'তোমার চাটুজ্জেদের ন-বউ ঘটকগিরি করছে বুঝি?'

'না, তবে যিনি করেছেন, তাঁর কাছ থেকেই শুনেছে।'

বাসব এবার উঠে বসল। অন্ধকারে বউটির মুখ ঠিক দেখা গেল না, কাজেই সে মুখের লিপি পড়া সম্ভব হল না। আস্তে আস্তে বলল, 'ঘটক চূড়ামণিটি কে?'

'পূর্বপাড়ার দামোদর চক্রবর্তী।' সঙ্গে সঙ্গে বউটিও উঠে বসেছিল। উত্তেজনায় কণ্ঠস্বর কাঁপছে। বাসবের মনে হল, ইতিমধ্যে দু-এক ফোঁটা জলও বোধ হয় পড়েছে চোখ থেকে।

বাসব নিজেকে সামলে নিয়েছিল। খুব গম্ভীর গলায় বলেছিল, 'মাঝরাত্রিতে রসিকতা শোনার মতন সময় আমার নেই। ভোরে অফিস আছে। আমায় ঘুমুতে হবে।'

বাসব পাশ ফিরে শুয়ে ঘুমোবার ভান করেছিল।

বউটি আর কথা বাড়ায়নি। এটুকু বুঝতে পেরেছিল, আর একটা কথা বললেই বিরক্ত হবার ছুতো করে বাসব হয় মেঝের ওপর কিংবা বারান্দায় গিয়ে শোবে।

কিছুক্ষণ পরে বাসব সত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছিল। কিন্তু বউটি ঘুমোয়নি। চুপচাপ শুয়ে শুয়ে বাইরের তারা-ভরা আকাশের দিকে চেয়েছিল।

এরা কেউ কিছু বলেনি, কেউ কিছু বলবেও না, কিন্তু বউটি ঠিক বুঝতে পেরেছে। বিরাট একটা বাদুড় কালো ডানা প্রসারিত করে এগিয়ে আসছে। অন্ধকারকে আরও সূচিভেদ্য করে। তমিস্রার গাঢ় স্রোতে বউটি নিঃশেষে মুছে যাবে সে সম্ভাবনা দূরে নয়।

শাশুড়িকেও কথাটা জিজ্ঞেস করেছিল দুপুর বেলা। শাশুড়ির পা দুটো কোলে নিয়ে বউটি বসেছিল। বাঁজা মেয়েকে নিয়ে ঘর করতে স্বামী রাজি নয়। সম্ভবত আর একবার বিয়ে করার চেষ্টা করছে। তাই যদি হয়, স্বামীপ্রেমের শরিক যদি আসে, তাহলে বউটি কী করে বাঁচবে? সবচেয়ে কাছের লোকটা যদি সবচেয়ে দূরে সরে যায় তাহলে সংসারের আকর্ষণটুকুই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

সূচীপত্রে যান

উত্তর এসেছিল। এমন সময়ে এসেছিল, বউটি উত্তরের সব আশা ছেড়ে দিয়েছিল।

এর মধ্যে এ সংসারে আরও ঢেউ উঠেছে। সে ঢেউ বউটিকে অতলে তলিয়ে নিয়ে যাবার রুক্ষ্ম আক্রোশে আছড়ে পড়েছে তার চারদিকে।

দামোদর চক্রবর্তী, এ গাঁয়ের পূর্বপাড়ার বাসিন্দা। মাতব্বর লোক। যাগ-যজ্ঞে, শোকে-তাপে, আনন্দে-প্রমোদে গাঁয়ের লোকদের পক্ষে অপরিহার্য। আড়ালে পাঁচজনে পাঁচ কথা বলে, কিন্তু ওই আড়ালেই। সামনে বলার সাহস কারও নেই। কোনো এক বিধবা বউদির সম্পত্তি ফাঁকি দিয়ে নিজে গুছিয়ে নিয়েছেন এমন একটা প্রতিশ্রুতি গাঁয়ে প্রচলিত আছে, কিন্তু তা নিয়ে আজ আর কেউ মাথা ঘামায় না। দামোদর চক্রবর্তীর প্রখর ব্যক্তিত্বের দাপটে ছোটোখাটো ত্রুটিবিচ্যুতি মুছে গিয়েছে।

সেই দামোদর চক্রবর্তী একদিন সদরে এসে বসলেন।

ছুটির দিন। অফিস যাবার তাড়া নেই। সারা দিনটাই ঢিমে ছন্দে বাঁধা। রান্না করার ফাঁকে ফাঁকে বউটি দরজার কপাটের ফাঁকে চোখ রেখেছিল। সব কথা কানে আসেনি, যা দু-একটি এসেছিল তাতেই তার মুখের সবটুকু রক্ত নিঃশেষে শুকিয়ে গিয়েছিল।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ বাবাজি, এর জন্য আর চিন্তার কী আছে! শাস্ত্রে তে বিধানই রয়েছে।' একেবারে অফিসের পীতাম্বর মুখুটির প্রতিধ্বনি।

দামোদর চক্রবর্তী আরও এক ধাপ এগিয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে গোটা পাঁচেক পাত্রীর ফিরিস্তিও দিয়েছিলেন।

ভেজানো কপাটের ফাঁক দিয়ে বউটি স্বামীর মুখটা দেখবার চেষ্টা করেছিল। পারেনি, দেখতে চেয়েছিল সে মুখে কীসের চিহ্ন! বেদনার না প্রচ্ছন্ন উল্লাসের।

দু-হাতে নিজের বুক চেপে বউটি সরে গিয়েছিল।

ভাজ লিখেছিল, ও সব বাজে কথা। ঠাকুরজামাই ঠাট্টা করেছেন তোমার সঙ্গে। আজকাল আবার এই কারণে দ্বিতীয় বার কেউ বিয়ে করে? তা ছাড়া এমন কিছু বয়স হয়নি তোমার। এর মধ্যে হতাশ হবার মতন কী হয়েছে?

ভাই কিন্তু অন্য কথা লিখেছিল। যদি বাসব অন্য পত্নীই গ্রহণ করে, সংসারের প্রয়োজনে, বংশরক্ষার প্রয়োজনে, হয়তো তার একাজ করা ছাড়া পথ নেই, তাহলে সমস্ত ব্যাপারটা বউটির সহজভাবে গ্রহণ করা উচিত। নিজের ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ-আনন্দ-পুলক সবকিছু সংসারের প্রয়োজনে বলি দেওয়া কর্তব্য। সাধ্বী স্ত্রীলোকদের এই রীতি।

আরও দু-পাতা ছিল সাধ্বীদের অন্যান্য কর্তব্য সম্বন্ধে। সবটা পাড়ার ধৈর্য বউটির ছিল না।

চিঠিটা টুকরো টুকরো করে পিছনের আগাছার জঙ্গলের মধ্যে ফেলে দিয়েছিল। মনকে প্রস্তুত করার চেষ্টা করেছিল অমোঘকে বরণ করে নেবার জন্য, কিন্তু পারেনি, সবকিছুর অন্তরালে গোপন কাঁটা বুকের মাঝখানে গিয়ে বিঁধেছিল। নড়তে চড়তে গেলেই অব্যক্ত একটা বেদনা, নীরবে রক্তক্ষরণ।

মাঝে মাঝে সোজাসুজি বাসবকে প্রশ্নও করেছিল।

শুতে যাবার আগে মশারি ফেলতে ফেলতে বউটি বলেছিল, 'কিগো ঘুমুলে নাকি?' বাসব ঘুমোয়নি। চিৎ হয়ে শুয়ে পান চিবোচ্ছিল। বউটির কথায় উত্তর দিয়েছিল, 'উঁহু!'

'একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?'

'করো।'

'সত্যি উত্তর দেবে তো?'

'উত্তর যদি জানা থাকে তো, দেব।'

প্রশ্নটি সে করেছিল, কিন্তু যে উত্তর বউটি আশা করেছিল, তা পায়নি।

পা টিপতে টিপতে শাশুড়িকেও বলেছিল, 'একটা কথা জিজ্ঞাসা করব মা?'

শাশুড়ি বিরক্ত হয়েছিলেন, 'বলো বাছা কী বলবে? একটু ঘুম এলেই তোমার যত কথা!'

সূচীপত্রে যান

বউটি ভয়ে কিছুক্ষণ চুপ করেছিল।

একটু পরে শাশুড়িই মনে করিয়ে দিয়েছিলেন, 'কই কী বলবে বাছা, বলো?'

মাথা নীচু করে খুব মৃদু গলায় বউটি জিজ্ঞাসা করেছিল, 'আপনার ছেলের নাকি আবার বিয়ে দেবার চেষ্টা করছেন?'

শাশুড়ি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়েছিলেন, 'তা আর কী করব বাছা! তুমি তো পারলে না সংসারে শান্তি আনতে। এত বছর বিয়ে হল, কোলে একটা কিছু এল না। আর যে আনবে এমন সম্ভাবনাও কম। কাজেই, বংশরক্ষার কথা তো ভাবতেই হবে।'

বহু কষ্টে চোখের জল ঠেলে বউটি উঠে পড়েছিল। শোবার ঘরে ঢুকে আর পারেনি নিজেকে সংযত করতে। কান্নায় ভেঙে পড়েছিল। চোখের জল মোছেনি। শাশুড়ি কান্নার শব্দে ঘরের চৌকাঠে এসে দাঁড়াতে পারেন, সে কথা একবারও ভাবেনি। এত সব ভাববার অবকাশ ছিল না। পায়ের তলা থেকে আচমকা মাটি সরে গেলে যেমন নিরালম্ব অবস্থা হয়, বউটির অবস্থা ঠিক তেমনই হয়েছিল।

এতদিন যে কথাটি বউটির আড়ালে ফল্গুস্রোতের রূপ নিয়েছিল, আন্দাজে শুধু স্বরূপ বুঝতে হয়েছিল বউটিকে, সেই কথাটা গোপনতার বোরখা খুলে একেবারে মুখোমুখি দাঁড়াল।

তার মানে এ সংসারে আর কেউ বউটিকে চায় না। সংসার ভালোবাসে, ছায়া দেয়, পরিবর্তে প্রতিদান চায়। পুরুষ অর্থ দিয়ে তাকে পরিপূর্ণ করবে। নারী দেবে নিজের হৃদয়ের অংশ। নিজের মমতা আর পুরুষের পৌরুষ মিশিয়ে নতুন যে সত্ত্বার আবির্ভাব হবে তাকে পৃথিবীতে আনার দায়িত্ব নারীর।

এ প্রতিদান বউটি দিতে পারেনি, তাই সংসারের বিরাট চাকার তলায় তার পিষ্ট হওয়া ছাড়া অন্য গতি নেই।

শিবানী এবারে হন হন করে বেশ কিছুটা এগিয়ে এল। পায়ে চলা পথটার কাছাকাছি।

ঠিক দরজার ওপারে তুলসী মঞ্চ। রোজ সন্ধ্যায় তার তলায় প্রদীপ রেখে আঁচল জড়িয়ে বউটি প্রণাম করত। বিয়ের পর স্বামীর মঙ্গল কামনা করত। সংসারের উন্নতি, তারপর রোজ সন্ধ্যায় শুধু এক প্রার্থনা।

সে সন্তানবতী হতে চাইত; তার সামর্থ স্বল্প, বিত্ত প্রায় শূন্য, তবু তার যা আছে, যতটুকু আছে, দেবতাকে অর্পণ করবে, শুধু পরিবর্তে একটি প্রার্থনা। তরু ফলবতী হোক।

বউটি বুক চিরে রক্ত দেবে, হাতের ক্ষয়ে যাওয়া চুড়ি দুটো বাঁধা দিয়ে, বেচে ঠাকুরের পুজো দেবে। নতুন অতিথির কলঝংকারে শুধু এ সংসার মুখরিত হোক।

বন্ধ্যা নারীর প্রার্থনাও বন্ধ্যা হল।

আরও কঠোর হল সংসার। সংসারের লোকগুলো মুখের ওপর নিস্পৃহতার মুখোশ টেনে দিল।

প্রত্যেক শনিবারেই বাসবের অফিস থেকে ফিরতে দেরি হত। কোনো একদিন রবিবার বিকালেও বেরিয়ে যেত। ফিরে এসে ঘরের দরজা বন্ধ করে মা-বেটায় চাপা গলায় ফিসফিস কথাবার্তা।

বন্ধ দরজায় কান পেতে বউটি শোনবার চেষ্টা করত। কিছু শুনতে পেত, বেশিরভাগই পেত না। যেটুকু পেত না, সেটুকু কল্পনার রূপ মিশিয়ে উজ্জ্বল করে তোলার চেষ্টা করত।

ভাবী সংসারের ছবি যত উজ্জ্বল হয়ে উঠত, বউটির মনের ছবি সেই পরিমাণে বিবর্ণ।

অবশেষে কাল রাত্রি এল।

খাওয়াদাওয়ার পর বউটি ঘরে ঢুকেই দেখেছিল, বাসব জানলার ধারে দাঁড়িয়ে আছে। হাতের জ্বলন্ত সিগারেট থেকে ক্ষীণ ধোঁয়া উঠছে কুণ্ডলী পাকিয়ে।

বউটি ঘরে ঢুকতেই বাসব ঘুরে দাঁড়াল।

'বসো, তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

'আমার সঙ্গে?' ভয়ার্ত, ক্ষীণ কণ্ঠে বউটি অন্ধকার বিছানার এক কোণে বসেছিল। পা দুটি ঝুলিয়ে।

সূচীপত্রে যান

একটামাত্র চেয়ার, যে চেয়ারটাকে টেনে তক্তপোশের কাছাকাছি বাসব নিয়ে গিয়েছিল। হাতের সিগারেটটা ছুড়ে বাইরে ফেলে দিতে দিতে বলেছিল, 'লুকোচুরি করে আর লাভ কী! কথাটা তোমার জানাই দরকার।'

বউটির মনে হয়েছিল, আস্তে আস্তে সব দুলছে। তক্তপোশ, ঝোলানো বাতি, চেয়ার, চেয়ারে বসা মানুষটা পর্যন্ত। ক্লান্ত দুটি দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইল। না, বাসবের দিকে নয়— জানলার বাইরে জমে-থাকা গাঢ় তমিস্রার দিকে। যে তমিস্রা ওর ভবিষ্যৎ জীবনের প্রতীক।

'অনেক ভেবে দেখলাম, এ ছাড়া আমার আর পথ নেই। গোটা সংসারটা তো আর নষ্ট করা যায় না এইভাবে। মারও খুব ইচ্ছা নাতির মুখ দেখেন, আর আমিও—'

'তুমি, তুমি কী ভাবো? একটা নিরাপরাধ দুঃখিনী মেয়ের জীবনে এইভাবে অশান্তির দাবানল জ্বালাবে!'

এত কথা শুধু বউটির মনেই এসেছিল, ঠোঁট দুটো থর থর করে কেঁপে উঠেছিল। একটি কথাও সে বলতে পারেনি।

বাসবই বলেছিল, 'তোমার আর কী অসুবিধা! দুজনে থাকবে দুই বোনের মতো। আগেকার দিনে তো এমন হত। তোমাকে তো আর কেউ অযত্ন অবহেলা করছে না।'

না, তা কেউ করবে না। কেবল রাত হলেই শাশুড়ির সঙ্গে শুতে হবে এক বিছানায়। সারাটা রাত নিদ্রাহীন শরশয্যায় বিছানা করতে হবে। নতুন বউটিকে স্বামীর কাছে এগিয়ে দিয়ে, নিজেকে সরে দাঁড়াতে হবে।

তারপর, তারপর, ক্ষণেকের জন্য বউটির দুটি চোখ জ্বলে উঠেছিল, যদি কোলে সন্তান আসে নতুন বউটির, তাহলে এ সংসারের জীর্ণ আবর্জনার সমগোত্র হয়ে বউটি সারাজীবন একপাশে পড়ে থাকবে।

কোনো অসুবিধা নেই। দু-বেলা দু-মুঠো অন্ন, আর পরনের বাস, এটুকু দিতে এ সংসার কখনো হয়তো কার্পণ্য করবে না। তা হলে আর কীসের দুঃখ বউটির?

সে রাতে অনেকক্ষণ পর্যন্ত বাসব অনেক কিছু বউটিকে বুঝিয়েছিল, কথাবার্তার ফাঁকে একবার তার গায়েও হাত রেখেছিল, কিন্তু শীতল স্পন্দনহীন একটা দেহের ওপর বেশিক্ষণ হাতটা রাখতে পারেনি।

চোখে আঁচল চাপা দিয়ে বউটি সারাক্ষণ শুধু ভেবেছে, এ সংসারে তার ভূমিকা শেষ, এবার সে কোথায় যাবে? এ কালামুখ লুকাবে কোন অন্ধকারে?

শিবানী দরজা পার হয়ে উঠানে এসে দাঁড়াল। অনেক দিন পর সে এ বাড়িতে ঢুকেছে। কিন্তু কিছুই নতুন বলে মনে হচ্ছে না। পাঁচিলের গায়ে ঘুঁটের সার। উঠানের কোণ ঘেঁষে আগাছার ঝোপ। সিঁড়ির তলায় কাঠকুটোর স্তূপ। ভাঙা চেয়ার থেকে শুরু করে টেবিলের পায়া, ঝুড়ি, চুবড়ি, চেরাকাঠের জঞ্জাল।

আর একবার ওপরের দিকে শিবানী চেয়ে দেখল। আলো জ্বলছে। মিটমিটে আলো, তারই ম্লান ছায়া জামরুল গাছের পাতাগুলোর ওপর পড়েছে।

সেদিন এই উঠানটাই সাজানো হয়েছিল, পাড়ার পুরুষেরা এসে জড়ো হয়েছিল। মেয়ের দল এসেছিল শাঁখ ঘণ্টা হাতে। বাসবের অন্তরঙ্গ যারা, তারা এগিয়ে গিয়েছিল স্টেশন পর্যন্ত। বর বধূকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবে।

সে রাতে বউটির বিশেষ খোঁজ পড়েনি। সে যে আনন্দমুখর এই জনতার মধ্যে থাকবেই না, এটুকু সকলের জানা ছিল। বেচারি হয়তো অন্ধকারের মধ্যে কোথাও চুপচাপ বসে আছে, কিংবা মুখ ঢাকা দিয়ে বিছানায় পড়ে আছে।

মোট কথা, বউটি কোথায় সেদিকে কারোর বিশেষ আগ্রহ ছিল না। সবাই উঁকি দিচ্ছিল স্টেশনের রাস্তার দিকে। কখন আমবাগানের ফাঁকে অনেকগুলো আলো দেখা যাবে। অনেকগুলো কণ্ঠের সম্মিলিত কলরব।

বউটির সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল অনেক পরে।

এঁটো বাসনের স্তূপ নিয়ে কামিনী ডোবার কাছ বরাবর গিয়েই চিৎকার করে উঠেছিল, পথের ওপরে বাঁশে একটা হ্যারিকেন ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। আলো হয়তো খুব জোর নয়, কিন্তু সেই আলোতেই বেশ দেখা

সূচীপত্রে যান

গেল।

'ওগো মাগো!' কামিনীর চিৎকার, সঙ্গে সঙ্গে বাসনের ঝনাৎকার।

খুব ঘটার বিয়ে না হলেও, বড়িতে বাড়তি লোক কিছু ছিলই। তারা ছুটে এসে দাঁড়াল। একবার উঁকি দিয়ে পুরুষরা সরে গেল। মেয়েরা পালটা চেঁচামেচি শুরু করল।

লোকের পিছনে বাসবও এসে দাঁড়িয়েছিল, দুটো চোখ বিস্ফারিত করে সেও দৃশ্যটা দেখেছিল।

এতটা কিন্তু কেউ আশা করেনি। ছেলেও নয়, ছেলের মাও না।

বউটি অসুখী, এমন একটা ব্যাপারে সেটাই স্বাভাবিক। স্ত্রীলোক সব দিতে পারে, সবকিছুর ভাগ, কেবল স্বামীর ভাগ ছাড়া। কিন্তু তা বলে মাদার গাছের নীচু ডালে পরনের শাড়ি বেঁধে এভাবে নিজেকে শেষ করবে — এ কথা কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি!

এমন নির্লজ্জ কী করে হতে পারল বউটি! নাকি, নিজের যৌবনপুষ্পিত দেহ সকলের সামনে উন্মোচিত করে প্রমাণ করতে চেয়েছিল, এ বন্ধ্যাত্ব তার দোষ নয়। পীন পয়োধর, ক্ষীণ কটি, গুরু ঊরু, নারীর সমস্ত ঐশ্বর্যের সে অধিকারিণী। সংসার তাকে বঞ্চনা করেছে, সংসারের মানুষ প্রতারিত করেছে তাকে। অকারণে তাকে সংসারচ্যুত করেছে বিনা দোষে।

সবচেয়ে বেশি আঘাত পেয়েছিল নতুন বউ সুরমা। উন্মুক্ত অবারিত নারীদেহের দিকে বেশিক্ষণ চেয়ে থাকতে পারেনি, কিন্তু যখন বউটির দেহ নামিয়ে, পুলিশের ঝামেলা মিটিয়ে লালপাড় শাড়ি পরিয়ে, সীমন্তে সিঁদুর পায়ে আলতা দিয়ে বাঁশের শয্যায় শোয়ানো হয়েছিল, তখন সুরমা নিষ্পলক নেত্রে চেয়ে চেয়ে দেখেছে। অন্য সব স্ত্রীলোকের সঙ্গে হুমড়ি খেয়ে পড়ে পায়ের ধুলো নিয়েছে। স্বীকার করেছে, আজকের উৎসব সুরমাকে কেন্দ্র করে হবার কথা, কিন্তু ওই নিষ্প্রাণ চন্দনচর্চিত বিয়ের সাজে সজ্জিতা মহিলাটি উৎসবের সবটুকু আনন্দ অপহরণ করে নিয়ে যাচ্ছে। আজ সে নিজেকে নিঃশেষ করেও বিজয়িনী।

তর তর করে সিঁড়ি বেয়ে শিবানী ওপরে উঠে এল। কেউ কোথাও নেই। তাতে তার কোনো অসুবিধা নেই। সিঁড়ির প্রত্যেকটি ধাপ তার চেনা, বাড়িঘরের প্রতিটি জানলা, দরজা।

তারস্বরে শিশুটি চেঁচিয়ে চলেছে। ধারে-কাছে কেউ নেই। শাশুড়ি ভিনগাঁয়ে বোনের বাড়ি আজ সকালে গেছেন গোরুর গাড়ি করে। ইদানীং ছানি কাটিয়ে অনেকটা সমর্থ হয়েছেন। এদিক-ওদিক যাওয়া-আসা করেন।

বাসব এখনও ফেরেনি। আজকাল তার ফিরতে বেশ রাত হয়, এটা শিবানী লক্ষ করেছে। অফিসের পরেও একটা টিউশনি করে। শুধু মাইনের হাওয়ায় সংসার তরণী অচল। পালে বাড়তি হাওয়ার জন্য বাড়তি রোজগারের প্রয়োজন। ছোট্ট একটা বাড়তি প্রাণী হলে হবে কী! তার ঝঞ্ঝাট অনেক। সুরমার বুকে দুধ নেই, কাজেই নানা ধরনের ফুডের প্রয়োজন। প্রসবের পর থেকেই আনুষঙ্গিক নানা ব্যাধিতে শরীর দুর্বল। দেহে রক্ত নেই, কালি পড়েছে দু-চোখের কোণে। একটু চলতেই বুক চেপে হাঁপাতে থাকে। একটা বউ গেছে দুর্বার স্বাস্থ্য নিয়ে, আধিব্যাধির বালাই তার ছিল না। কিন্তু এ বউয়ের দাম অনেক বেশি। এর কল্যাণে বংশরক্ষা হয়েছে। সোনার চাঁদ এসেছে। এ বউয়ের প্রাণের মূল্য অনেক। তাই ডাক্তার আসছে, কবিরাজ আসছে। অফিস ফেরত বাসব দু-হাতে রোজ ওষুধের পোঁটলা বয়ে আনছে।

ওপরে উঠে শিবানী চৌকাঠের কাছে দাঁড়াল। ঘরের এককোণে ছেলেটি শুয়ে চেঁচাচ্ছে। নকশা-কাটা কাঁথা, লাল রং-এর দুটো বালিশ। চুলগুলো ঝুঁটি করে বাঁধা লাল ফিতে দিয়ে। কপালের এককোণে কাজলের ফোঁটা। এর অর্থ শিবানী অজানা নয়। কুনজর যেন না পড়ে, খারাপ বাতাস না লাগে— কোনো অমঙ্গল না হয় শিশুর।

সুরমা নেই। সুরমা কোথায় গেছে! শিবানী জানে। পিছনের পুকুরে গা ধুতে গেছে। যাবার সময় ছেলেটাকে হয়তো ঘুম পাড়িয়েই গিয়েছিল। হঠাৎ জেগে উঠেছে। ধারে-কাছে কাউকে না-পেয়ে চিৎকার শুরু করেছে।

সূচীপত্রে যান

এ কান্না সুরমার কানে যাবার কথা নয়। বাড়ির দরজা জানলা সব বন্ধ। বৃষ্টির জন্য সুরমা সম্ভবত বন্ধ করে দিয়েছে।

কিন্তু শিবানীর কানে ঠিক গেছে। দেড় বছর ধরে এমনই এক সুযোগের প্রতীক্ষায় সে ছিল। ধারে-কাছে কেউ থাকবে না। অসহায় শিশু শুধু থাকবে অরক্ষিত অবস্থায়। ছোট্ট একটা মাংসপিণ্ড। ক্রন্দন সম্বল, নিস্তেজ, কিন্তু তবু শক্তি কম নয়! একটা নারীর জীবনের গতি ঘুরিয়ে দিল। একজনের অস্তাচলের রং নিয়ে আর একজনের উদয়াচল রাঙাল।

এ শত্রুকে পরমায়ু ভিক্ষা শিবানী দেবে না।

আস্তে আস্তে এগিয়ে শিবানী একেবারে শিশুর গায়ের কাছে দাঁড়াল। একটা পা তুলল। শিশুর ক্রন্দন এখনই থেমে যাবে। এই মুহূর্তে। একেবারের চিরদিনের মতন।

পা দিয়ে শিশুর গলাটা চাপতে গিয়েই শিবানী থেমে গেল। চোখে পড়ল দেয়ালের ফোটোটার ওপর।

শিবানীর ফোটো। সীমন্তে সিঁদুর, সিঁদুর পায়ের কাছে। ফোটোতে টাটকা ফুলের মালা। বোধ হয় বিকালেই দেওয়া হয়েছে। শিবানী চমকে উঠল।

তারই ফোটোর সামনে সুরমা এভাবে শিশুটিকে শুইয়ে রেখেছে? শিবানী ভেবেছিল এ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই সে মুছে গেছে। ওই বাড়ির বাসিন্দাদের মনে তার স্মৃতির ছায়া মাত্রও নেই। পরাজিত, নিষ্পাপ সত্ত্বাকে কেউ মনে রাখে না।

কিন্তু সুরমা আজও তাকে স্মরণ করে। কে জানে বাসবও কোনোদিন এ ছবির সামনে এসে দাঁড়ায় কিনা!

নতুন জীবন উপভোগ করতে করতে পুরোনো কোনো কথা, কোনো চিন্তা সামান্য ঢেউ তোলে কিনা মনের সায়রে।

সবচেয়ে বড়ো কথা, যে স্বাদ সংসারে থাকতে শিবানী পায়নি, তার ক্ষোভ, তার তৃষ্ণা মেটাবার জন্যই বুঝি রক্তমাংসের এই ঢেলাটাকে দুজনে মিলে তার প্রকৃতির সামনে রেখে দিয়েছে। তার ভালোবাসা, তার ঘৃণাকে রক্ষা করবে এই সম্ভাবনায়।

শিবানী পা তুলে নিল। দ্রুতপায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে উঠোনে এসে দাঁড়াল।

আশ্চর্য, পরিপূর্ণ এই সংসার থেকে চলে যেতে শিবানীর মন যেন উঠছে না, কিন্তু তবু যেতে হবে।

অনেক দূরে। এই শিশুর অসহায় কান্না যেখানে পৌঁছাবে না। তৃপ্তির সমুদ্রে প্রতিহিংসার নীল ফসফরাস আর তাকে কোনোদিন চঞ্চল করবে না।

শিবানী সদর দরজা পার হয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

সূচীপত্রে যান

রূপে সে কুরূপা

পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে যাঁদের বয়স পঞ্চাশের কাছে, তাঁদের ঘটনাটা নিশ্চয় মনে আছে। একটি কুমারী নিজের শরীরে কেরোসিন ঢেলে আগুন জ্বেলে দিয়েছিল।

এ ধরনের ঘটনা কলকাতা শহরে তখন প্রথম। নানা জনে নানা কথা বলেছিল। কেউ বলেছিল, হতাশ প্রেমের ব্যাপার, কেউ বলেছিল, বাপ পণের টাকা জোগাতে অক্ষম তাই নিজেকে নিঃশেষ করে মেয়েটি বাপকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল। আবার দু-একজন রসিক লোক মেয়েটি গর্ভিণী, পেটের লজ্জা লুকোতে এমন কাজ করেছে, এও বলেছে।

আসল ব্যাপারটা আমার জানা।

মেয়েটির নাম বেলা। ছা-পোষা বাপের তৃতীয় সন্তান। ভদ্রলোকের চারটি মেয়ে। বহু কষ্টে ধার-ধোর করে প্রথম দুটিকে পার করে ছিলেন, কিন্তু তিন নম্বরে এসে মোক্ষম ঠকে গেছেন, কারণ মেয়েটি কালো। সাধারণত এদেশে কালো মেয়েকে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ বলে চালাবার একটা রেওয়াজ আছে, কিন্তু এ মেয়ে সত্যি সত্যিই কালো। তবে কালো হলেও, অপূর্ব লাবণ্যময়ী, মুখশ্রী তুলনাহীন।

আমি বেলার প্রতিবেশী। সে আমাকে কাকা বলেই ডাকে। পথেঘাটে দেখা হলে বেলার বাবা আমার দুটো হাত জাপটে ধরে অনুরোধ করেন, বেলার জন্য যেন একটি পাত্রের সন্ধান করি। আমি অবশ্য তাঁকে নিরাশ করিনা।

হঠাৎ এক সুযোগ জুটে গেল। অরবিন্দ আমার বন্ধুর ভাই। তার সেজদা আমাদের কলেজের সতীর্থ। শুনলাম অরবিন্দর বিয়ের চেষ্টা হচ্ছে। যোগাযোগ করলাম। অরবিন্দর রং কালো। কাজেই ভাবলাম, কালো মেয়েতে হয়তো তার আপত্তি হবে না। ছেলেটি মার্চেন্ট অফিসের কেরানি। মাইনে ছাড়াও বাড়তি রোজগার আছে।

অরবিন্দের সঙ্গে একটি বন্ধু এল। আর আমি তো বরের ঘরের পিসি আর কনের ঘরের মাসি হিসেবে সঙ্গে রইলামই। লক্ষ করলাম, বেলা এসে সামনে বসার সঙ্গে সঙ্গে অরবিন্দর মুখ অপ্রসন্ন হয়ে উঠল।

তারপর অরবিন্দ স্পষ্ট বলেই ফেলল বেলার বাপের দিকে মুখ ফিরিয়ে, 'আমি ভেবেছিলাম আপনার মেয়ের রং সামান্য ময়লা। কিন্তু এ যে দেখছি একেবারে বার্নিশ করা। আমাকে মাপ করবেন!'

মেয়ের বাপকে অনেক অপমানই সহ্য করতে হয়, তাই বেলার বাপ এসব গায়ে মাখলেন না। বললেন, 'আপনারা সবাই যদি একথা বলবেন, তাহলে এদেশের কালো মেয়েরা যাবে কোথায়? যাঁদের রং একটু কালো। তারা কালো মেয়ে নেবেন না, যাঁরা ফর্সা, তাঁদের ওই এক কথা। তাহলে কি কালো মেয়েদের হাত-পা বেঁধে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দেব?'

অরবিন্দ কোনো উত্তর না-দিয়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর সামনে রাখা খাবারের থালা স্পর্শ না-করে বন্ধুকে নিয়ে হন হন করে বেরিয়ে গেল।

বেলা সেই যে এসে মাথা হেঁট করে বসেছিল, তার দিকে যখন চোখ ফেরালাম, দেখলাম মাথাটা প্রায় মেঝের সঙ্গে ঠেকে যাচ্ছে। সমস্ত শরীর রুদ্ধ আবেগে কেঁপে কেঁপে উঠছে। বলবার কিছু ছিল না। কিছুক্ষণ বসে থেকে আস্তে আস্তে উঠে এলাম।

ঘুম ভাঙল মাঝরাতে। নারীকণ্ঠের আর্ত চীৎকারে।

বাঁচাও, বাঁচাও, জ্বলে মলুম! উঃ, বড়ো কষ্ট, বড়ো কষ্ট!....

সূচীপত্রে যান

তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম। নিশীথে শব্দ ঠিক কোনদিক থেকে আসছে বোঝা মুশকিল। কিছুক্ষণ পরে বুঝলাম আওয়াজটা বেলাদের বাড়ি থেকেই আসছে। ছুটে চলে এলাম। তখন কিছু করবার ছিল না। রান্নাঘরে শিকল তুলে দিয়ে বেলা নিজের শরীরে বোতল বোতল কেরোসিন ঢেলে দিয়ে দেশলাই জ্বেলেছে।

দরজা ভেঙে যখন রান্নাঘরে ঢোকা হল, তখন বেলার কালো রং আর নেই। পুড়ে সর্বাঙ্গ লাল হয়ে গেছে। বেলার মা আর বাবা আছড়ে পড়লেন মেয়ের দেহের কাছে।

বাপ চেঁচিয়ে উঠলেন, 'এবার মাকে সাজিয়ে দেখাবার চেষ্টা করো! আর কেউ কালো বলবে না। কুরূপা সেই অভিমানে মা আমার চলে গেল।'

যেমন হয়, এই নিয়ে পাড়ায় বেশ কিছুদিন জটলা চলল। নানারকম মন্তব্য।

খবরের কাগজে ফলাও করে লিখল পণপ্রথার বিষময় ফল সম্বন্ধে আধ পাতা জুড়ে সম্পাদকীয়। তারপর একসময়ে সব ঠান্ডা হয়ে গেল। মাস ছয়েকের মধ্যে অরবিন্দ বিয়ে করল। নিমন্ত্রণ পেয়েছিলাম, কিন্তু যেতে মন সরেনি। কেবল, বেলার মুখটা মনে পড়েছিল। বেলার বাপ এখানকার বাসা উঠিয়ে চলে গেলেন। কোথায় খবর রাখি না।

বিয়েতে যাইনি, কিন্তু অরবিন্দর বউ দেখা অদৃষ্টে ছিল।

একদিন একটা কাজে ব্যান্ডেল যাব বলে হাওড়া স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎ একেবারে সামনে অরবিন্দ। আমাকে দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, 'আরে অজয়দা, আপনি?'

বললাম, 'একটা কাজে ব্যান্ডেল যাব।'

'ব্যান্ডেল? আবার বিয়ের সম্বন্ধ নাকি?'

কথাটার মধ্যে ব্যঙ্গের হুল ছিল, তাই উত্তর দিলাম না। বললাম, 'তুমি কোথায়?'

'আমি দিন পনেরো ছুটি নিয়ে সস্ত্রীক পুরী চলেছি। আপনি তো আমার বিয়েতে রাগ করে গেলেনই না।'

'রাগ করে? রাগ করে কেন?'

'তা ছাড়া আর কী! আপনার পাড়ার মেয়ে বিয়ে করিনি বলে। আপনি তো জয়াকে দেখেননি। দাঁড়ান আলাপ করিয়ে দিই।'

অরবিন্দ চলে গেল। লক্ষ করলাম, টিকিট ঘরের সামনে একটি তরুণী। তার পায়ের কাছে বিছানা, সুটকেস, ছোটোখাটো মোটঘাট। অরবিন্দ তার কাছে গিয়ে থামল, আমাকে দেখিয়ে কী বলল তারপর একটা কুলিকে মালপত্র দেখতে বলে দুজনে এগিয়ে এল। একেবারে কাছে আসতে অরবিন্দ বলল, 'জয়া, ইনি অজয়দা, সেজদার বন্ধু।'

জয়া হেঁট হয়ে পা ছুঁয়ে প্রণাম করল।

ভালো করে দেখলাম। গৌরাঙ্গী, তবে নাক মোটেই ভালো নয়। মঙ্গোলিয়ান ধাঁচের। পুরু ঠোঁট, দুটি চোখও খুব আয়ত নয়, গাল বেশ ফোলা ফোলা। গড়ন স্থূলতার দিকে। স্বভাবতই বেলার কথা মনে পড়ে গেল। তার রং কালো ছিল, কিন্তু মুখ-চোখ অনেক সুন্দর।

অরবিন্দ আমার কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বলল, 'জয়ার বাপের বড়োবাজারে লোহার কারবার। বেশ মালদার লোক। দুটি মাত্র মেয়ে। এটি বড়ো।'

বুঝলাম অরবিন্দ রূপ নয়— রূপোই খুঁজেছে। আমার ট্রেন এসে গিয়েছিল, তাই বললাম, 'চলি অরবিন্দ। পরে দেখা হবে। বউমাকে নিয়ে একদিন যেও আমাদের বাড়ি।'

জয়া এবার দু-হাত তুলে নমস্কার করল। তারপর আমরা ভিড়ে হারিয়ে গেলাম।

দিন তিনেক পর। কী এক ছুটির দিন। বারান্দায় বসে বসে খবরের কাগজ পড়ছিলাম। হঠাৎ চোখে পড়ল একটা খবর

পুরী প্যাসেঞ্জারে রহস্যজনক মৃত্যু!

সূচীপত্রে যান

মাঝরাতে প্রথম শ্রেণির কামরায় একটি যাত্রীকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। সংবাদে প্রকাশ, এই কামরায় নব বিবাহিত দম্পতি ভ্রমণ করিতেছিল। স্ত্রী চেন টানিলে মধ্যপথে ট্রেন থামিয়া যায়।

গার্ড দেখিতে পায়, কামরায় মেঝের উপর ভদ্রলোক অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া আছেন। তাঁহার দুটি চোখ বিস্ফারিত। কণ্ঠনালিতে দশ আঙুলের ছাপ। মনে হয় তাঁহাকে শ্বাসরুদ্ধ করিয়া হত্যা করা হইয়াছে। আশ্চর্যের বিষয়, ভদ্রলোকের ঘড়ি, আংটি, মানিব্যাগ কিছুই অপহৃত হয় নাই। স্ত্রীর দেহে অনেক টাকা মূল্যের অলংকারেও কেহ স্পর্শ করে নাই। নিহত ভদ্রলোকের নাম অরবিন্দ চৌধুরি।

খবরের কাগজটা সামনে রেখে চুপচাপ বসে রইলাম। জয়ার মুখটা স্মৃতিপটে ভেসে এল। একটু পরেই গৃহিণী বাজার যাবার তাগাদা দিতে এসে থেমে গেল, 'কী হল? ওভাবে বসে আছ? শরীর খারাপ নাকি?'

কোনো উত্তর না-দিয়ে কাগজটা তার দিকে ঠেলে দিলাম। বললাম, 'এই জায়গাটা পড়ো।'

'তাই তো মনে হচ্ছে। সব মিলে যাচ্ছে।'

'বললাম না, অরবিন্দ বউ নিয়ে পুরী গেল।'

'বাবা, দেশে কী অরাজকতা হল! ট্রেনের কামরায় ডাকাতি!'

'ডাকাতি আর কোথায়? কোনোকিছু তো চুরি যায়নি।'

'সে হয়তো সময় পায়নি। বউটা চেঁচামেচি করে ওঠাতে নেমে গেছে। কিংবা এমনও হতে পারে, ট্রেন সম্ভবত স্টেশনের কাছে এসে পড়েছিল।'

'সবই হয়তো সম্ভব। এতদূর থেকে কিছুই বলা যায় না।'

'আহা, বউটার কথা ভাবছি। এই সেদিন বিয়ে হয়েছিল।'

উঠে পড়লাম, আলনা থেকে জামাটা টেনে নিয়ে গায়ে দিতে দিতে বললাম, 'আজ চাকরকে বাজারে পাঠাও। আমি বেরোচ্ছি।'

'কোথায় যাচ্ছ?'

'একবার অরবিন্দর বাড়ি যাব। যাওয়া দরকার। খবরটা যখন জানতে পারলাম। সবাই নিশ্চয় শোকে মুষড়ে পড়েছে।'

আমি যে প্রান্তে থাকি, অরবিন্দর বাড়ি তার অপর প্রান্তে।

বাসে প্রায় ঘণ্টা খানেক। বাসে যেতে যেতে জীবনের অসারতার কথা ভাবতে লাগলাম। কত ক্ষণস্থায়ী পরমায়ু আমাদের? পরের মুহূর্তে কী হবে বলা যায় না।

পুরোনো ধরনের বাড়ি। অরবিন্দ ঠাকুরদার আমলের। এর মধ্যে খুব যে সংস্কার হয়েছে এমন মনে হয় না। বাড়ির সামনে দাঁড়ালেই মনে হয় বাড়িটা ঘিরে শোকের বলয়। কেমন থমথমে ভাব।

আস্তে আস্তে কড়া নাড়লাম। কাজ হল না। জোরে শব্দ করতে সংকোচ হল, কিন্তু উপায় নেই, জোরে কড়া নাড়লাম।

একজন ভৃত্য এসে দরজা খুলতে জিজ্ঞাসা করলাম, 'সুরজিৎ আছে?' সুরজিৎ অরবিন্দের সেজো ভাই। আমার একদার সহপাঠী।

'আছেন। বসুন।'

বাইরের ঘরে চেয়ারে বসলাম। কিছুক্ষণ পরে সুরজিৎ ঘরে ঢুকল। কোঁচার খুঁট গায়ে জড়ানো। বিষণ্ণ, নিষ্প্রভ চেহারা।

বললাম, 'আজ সকালে কাগজে দেখে সব জানতে পারলাম।'

সুরজিৎ আমার পাশের চেয়ারে বসল।

আস্তে আস্তে বলল, 'আশ্চর্য কাণ্ড! টাকাপয়সা কিছু নেয়নি, শুধু প্রাণটার ওপরই যেন লোভ ছিল। পুলিশও কিছু কিনারা করতে পারছে না।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'অরবিন্দের স্ত্রী জয়া কী বলে? সে পুলিশের কাছে লোকটার বর্ণনা দিতে পারছে না?'

সূচীপত্রে যান

কিছুক্ষণ সুরজিৎ কোনো কথা বলল না। চুপ করে রইল। একটু পরে নিজের মনেই যেন বলতে লাগল, 'জয়ার মাথার গোলমাল হয়েছে।'

'মাথায় গোলমাল?'

'আশ্চর্য কী! জানিস তো আমাদের বাড়ির ব্যাপার। যত সেকেলে ধারণা। পুরোনো মত। বুড়ো-বুড়িরা সবাই বলছে, জয়া নাকি খুব অপয়া। তা না-হলে বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে স্বামী যায়। জয়া খাওয়াদাওয়া প্রায় বন্ধ করে দিন-রাত কান্নাকাটি করছে। কত করে বললাম, বাপের বাড়ি ঘুরে এসো, বাপ নিতে এল, তবু গেল না।'

হাওড়া স্টেশনে দেখা জয়ার চেহারাটা মনে পড়ল।

হঠাৎ সুরজিৎ জিজ্ঞাসা করল, 'তোর সঙ্গে জয়ার দেখা হয়েছে? জয়া তোর কথা আমার কাছে জিজ্ঞাসা করেছিল।'

'হ্যাঁ, হাওড়া স্টেশনে পুরী যাবার সময়ে একবার দেখা হয়েছিল। কিন্তু জয়া আমার কথা কী জিজ্ঞাসা করছিল?'

'বলছিল, তোকে একবার খবর দিতে।'

'আমাকে?' আমি রীতিমতো বিস্মিত হলাম। 'আমাকে কেন?'

'কী জানি! এসেছিস যখন, একবার দেখা করে আয় না।'

'দেখা করব?' একটু দ্বিধাবোধ করলাম।

সুরজিৎ উঠে দাঁড়িয়ে চেঁচাল, 'হারু, হারু!'

ছোকরা চাকর এসে দাঁড়াল।

সুরজিৎ বলল, 'এই বাবুকে ছোটো বউদিমণির ঘরে নিয়ে যাতো।'

'আসুন বাবু।'

হারুর পিছন পিছন সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠলাম। কোণের দরজার সামনে মেরুন রং-এর ভারী পর্দা। দরজা ভেজানো।

খুব আস্তে দরজায় ঠুক ঠুক করলাম। অনেক পরে ভিতর থেকে ক্লান্ত কণ্ঠে উত্তর এল—

'কে?'

নাম বললাম। দরজা খুলে গেল।

'আসুন।'

পরনে কালো পাড় শাড়ি, অবিন্যস্ত চুল, হাতে একটি করে চুড়ি। এত দ্রুত যে একটা মানুষের চেহারা এত বদলে যেতে পারে তা আমার ধারণার বাইরে ছিল।

মাঝখানে গোল টেবিল। তার ওপর অরবিন্দর একটা ফোটো।

জয়া ঘাটের একপাশে বসল।

আমি চেয়ারে বসে প্রশ্ন করলাম, 'তুমি নাকি আমাকে খুঁজছিলে?'

'হ্যাঁ দাদা।'

'কেন?'

'ওঁর একবার বেলা বলে কোনো মেয়ের সঙ্গে বিয়ের কথা হয়েছিল?'

'সে তো অবিবাহিত ছেলে আর কুমারী মেয়ে থাকলে কত হয়?'

'মেয়েটি দেখতে কালো।'

'হ্যাঁ।'

'মনের দুঃখে মেয়েটি কি আগুনে পুড়ে মারা গিয়েছিল?'

'কে বলল? অরবিন্দ?'

সূচীপত্রে যান

'না, আমি কাগজে পড়েছি। উনি বলেছিলেন, সে অন্য মেয়ে, তখন আমি তাই বিশ্বাস করেছিলাম, কিন্তু এখন আমি ঠিক জানি এ সেই মেয়ে।'

'কেন একথা বলছ কেন?'

'এ বাড়িতে আমি বলেছি, কেউ আমার কথা বিশ্বাস করেনি। আপনাকে বলি শুনুন—

রাত তখন এগারোটা। আপনার ভাই ঘুমোচ্ছে। আমি বাথরুমে যাব বলে উঠতে গিয়েই চমকে উঠলাম। সামনের বেঞ্চে ঘোমটা দেওয়া একটি বউ। এ কী করে সম্ভব! দুটো দরজাই লক করা। বউটি কী করে উঠল! 'কে? কে তুমি? এ কামরায় উঠলে কী করে?' আমার চিৎকারে আপনার ভাই উঠে পড়ল।

''কী, কী হল?'' ঘুম জড়ানো কণ্ঠে আপনার ভাই জিজ্ঞেস করল। আমি বললাম, ''এই দ্যাখো না ওই বেঞ্চে কে বসে আছে!''

''যাও, নিকালো!''— আপনার ভাই তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে বউটি ঘোমটা ফেলে দিল। মুখটা দেখলে মনে হয় আগুনে পোড়া। মাংস পুড়ে আঙুরের গুচ্ছের মতন হয়ে আছে। চোখ দুটো চক চক করে উঠল। শাড়ির মধ্য থেকে দুটি কঙ্কাল হাত বেরিয়ে আপনার ভাইয়ের গলা সজোরে টিপে ধরল। বিকট একটা হাসি। মনে হল কামরার দরজা জানলাগুলো থর থর করে কেঁপে উঠল। আমি জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলাম। যখন জ্ঞান ফিরে এল দেখলাম, আপনার ভাই মেঝেয় পড়ে।

বউটা কোথাও নেই। চেন টেনে ট্রেন থামালাম। তারপর ঘটনাটা গার্ডের কাছে, পুলিশের কাছে, বাড়ির লোকের কাছে বলেছি। কেউ বিশ্বাস করেনি। সকলের ধারণা শোকে আমার মাথা খারাপ হয়েছে।

আপনি তো বেলার পাশের বাড়িতে থাকতেন, সবকিছু আপনার জানা। বলুন, বেলা ছাড়া কে আমার এ সর্বনাশ করবে! মৃত্যুর পরেও কে আসবে প্রতিহিংসা নিতে বলুন?'

কী বলব! বলবার মতন কোনো উত্তর সেদিন খুঁজে পাইনি। আজও পাই না।

Click Here For
More Books>>

সূচীপত্রে যান